# ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী

আব্দুল হক খন্দকার
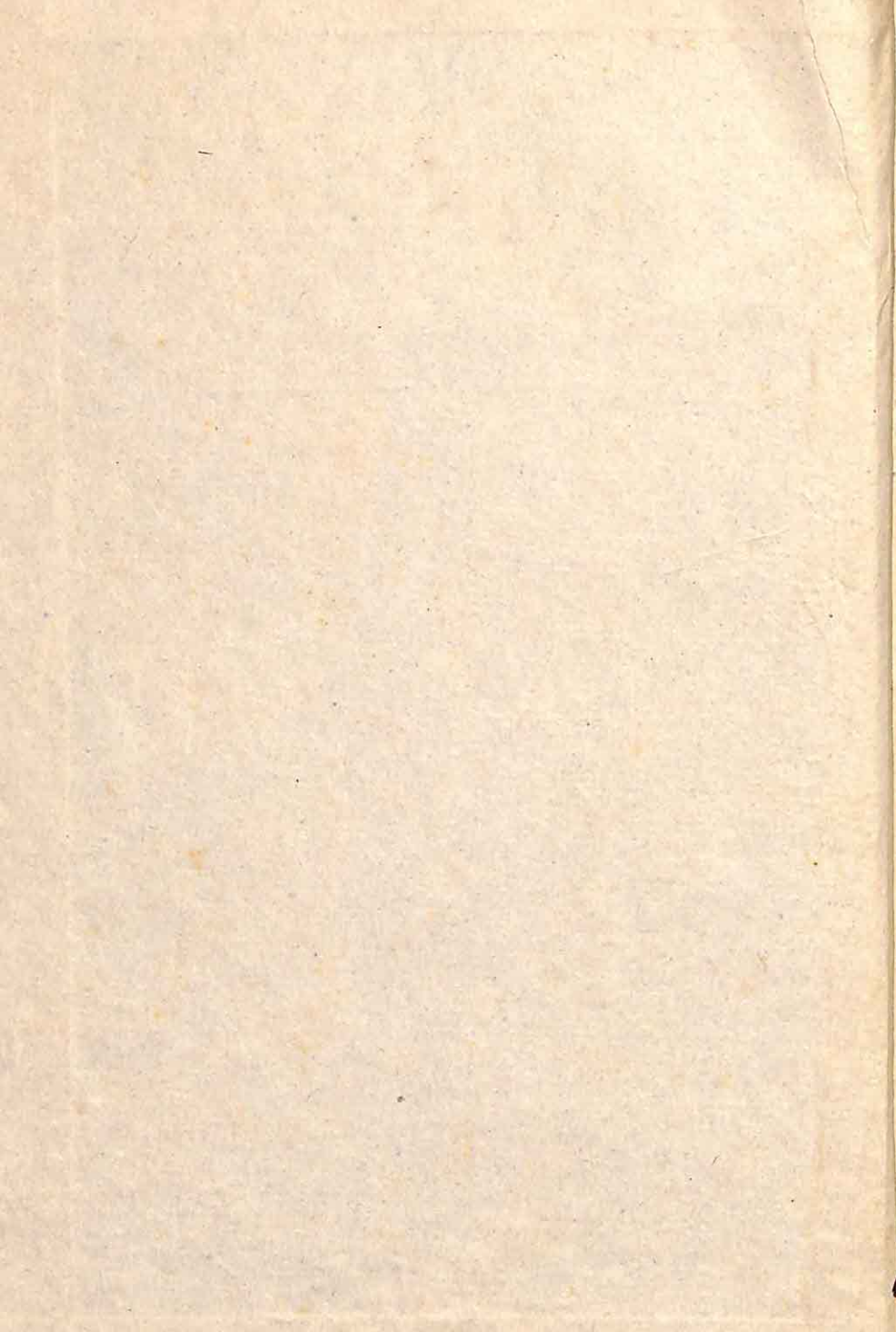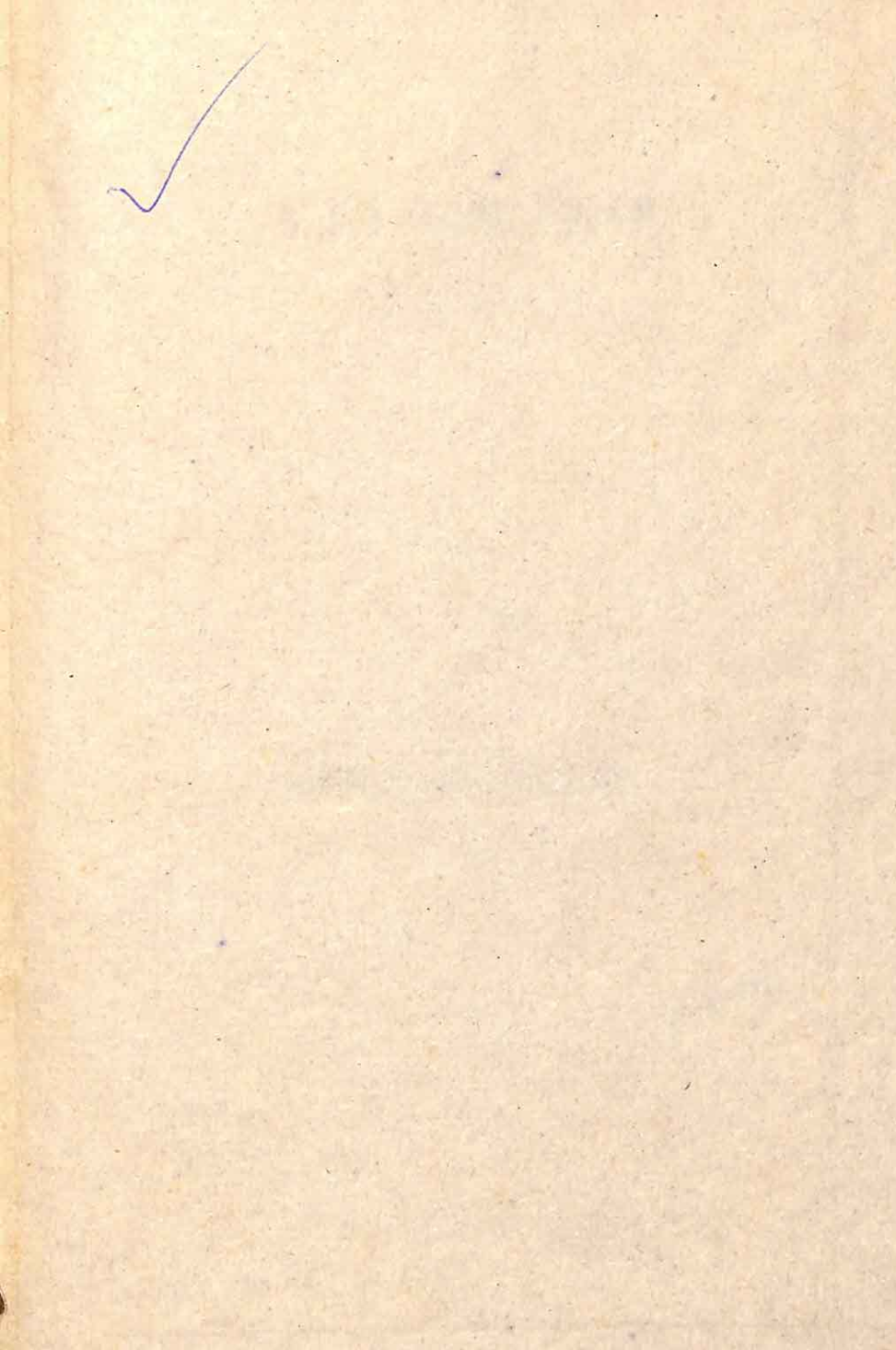
# ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী

প্রথম খণ্ড

আব্দুল হক খন্দকার

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-এর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ৯৮৩

প্রকাশক :

চিত্তরঞ্জন সাহা

মুক্তধারা

[ স্বঃ পুথিঘর লিঃ ]

৭৪ ফরাশগঞ্জ

ঢাকা-১, বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৮৫

প্রচ্ছদ-শিল্পী : সিরাজুল হক

ভেতরের ছবি : সিরাজুল হক ও কাজী মোজাম্মেল হোসেন

মুদ্রাকর :

প্রভাংশুরঞ্জন সাহা

ঢাকা প্রেস

৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১

বাংলাদেশ



মূল্য : সাদা : ৪৮·০০ টাকা

লেখক কাগজ : ৩৬·০০ টাকা

BYADHIR BIRUDDHE BIJNANI

[ Scientists Against Disease ]

By Abdul Haque Khondker

First Edition : November 1985

Cover Design : Sirajul Haque

[ Illustrations : Sirajul Haque and Kazi Mojammel Hossain ]

Publisher : C. R. Saha

MUKTADHARA

[ Prop. Puthighar Ltd. ]

74 Farashganj, Dhaka-1

Bangladesh

Price : Whiteprint : Taka 48·00

Lekhakprint : Taka 36·00

## উৎসর্গ

আমার জীবনে ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের মূলে রয়েছে যেমন বিজ্ঞানীদের অমূল্য অবদান, তেমনি রয়েছে রোগশয্যায় আমার স্নেহময়ী মাতা ও পত্নীর অকুণ্ঠ সেবা, যত্ন ও শুশ্রূষা। তাই এ বইটি ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে গিয়ে আমার জান্নাতবাসী মাতা শ্রদ্ধেয়া হালিমা খাতুন ও আমার প্রিয়তমা পত্নী রুবি খন্দকার-এর নামও সেই সঙ্গে সংযুক্ত করলাম।

গ্রন্থকার

**লেখকের অন্যান্য বই**

জীবজগতের জন্মকথা (৩য় সং)
বিজ্ঞানের মজার খেলা—১ম (২য় সং) ও ২য় খণ্ড (২য় সং)
বিচিত্র যত পদার্থ—১ম খণ্ড (২য় সং)
উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন

## পুস্তক প্রসঙ্গে

এই পুস্তকের কয়েকটি প্রবন্ধ, যেগুলো এখানে ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯ এবং ১০ নম্বর অধ্যায় হিসাবে সংকলিত করা হলো—সেগুলোর মধ্যে কিছু ঢাকার 'মাহে নও' ও কিছু কলকাতার "জ্ঞান ও বিজ্ঞান" মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাকিগুলো সাম্প্রতিককালে লেখা এবং ৭ এবং ১০ নং "বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকা"-য় প্রকাশিত হয়েছে আর বাকীগুলি এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি। অবশ্য প্রকাশিত প্রবন্ধগুলোকে পুস্তকে স্থান দিতে গিয়ে তাদের যথেষ্ট সংস্কার সাধন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে—এমনকি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সংস্কার ও পরিবর্ধনের কাজ এতটাই করা হয়েছে যে, তাদের আগের স্বরূপটির আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে! যাহোক, প্রবন্ধগুলোতে কয়েক জন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর সংগ্রামী জীবন ও তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজগুলোকে বিশেষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমাদের দেশের তরুণ বিজ্ঞানীরা এঁদের কর্মময় জীবন থেকে প্রেরণা লাভ করে যদি নতুন কিছু আবিষ্কারের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেন তবে আমার উদ্দেশ্য ও পরিশ্রম সার্থক মনে করবো।

প্রবন্ধগুলো লেখার কাজে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে আমার পুত্র ডাঃ মানজারে শামীম এবং অবিরাম অনুপ্রাণিত করেছেন আমার পত্নী রুবি খন্দকার। কয়েকটি প্রবন্ধ তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করে যাঁরা আমাকে উৎসাহিত করেছেন তাঁরা হলেন স্নেহাস্পদ কবি ও গবেষক আবদুস সাত্তার, বাবু তপন চক্রবর্তী এবং 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান'-এর প্রাক্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ৺গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। এঁদের সকলের সাহায্য, প্রেরণা ও উৎসাহ না পেলে অনেকটা গবেষণামূলক এ সকল প্রবন্ধ লেখার কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে কখনও সম্ভব হতো না। গ্রন্থাকারে প্রবন্ধগুলো প্রকাশের প্রাক্কালে এঁদের কাছে আমার অপরিসীম ঋণের কথা তাই গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহাশয় পুস্তকটি আগ্রহভরে প্রকাশের ভার নেয়ায় তাঁকেও জানাই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

৩৭০ আউটার সারকুলার রোড
রাজারবাগ, ঢাকা—১৭

আব্দুল হক খন্দকার
১৫-১১-৮৪
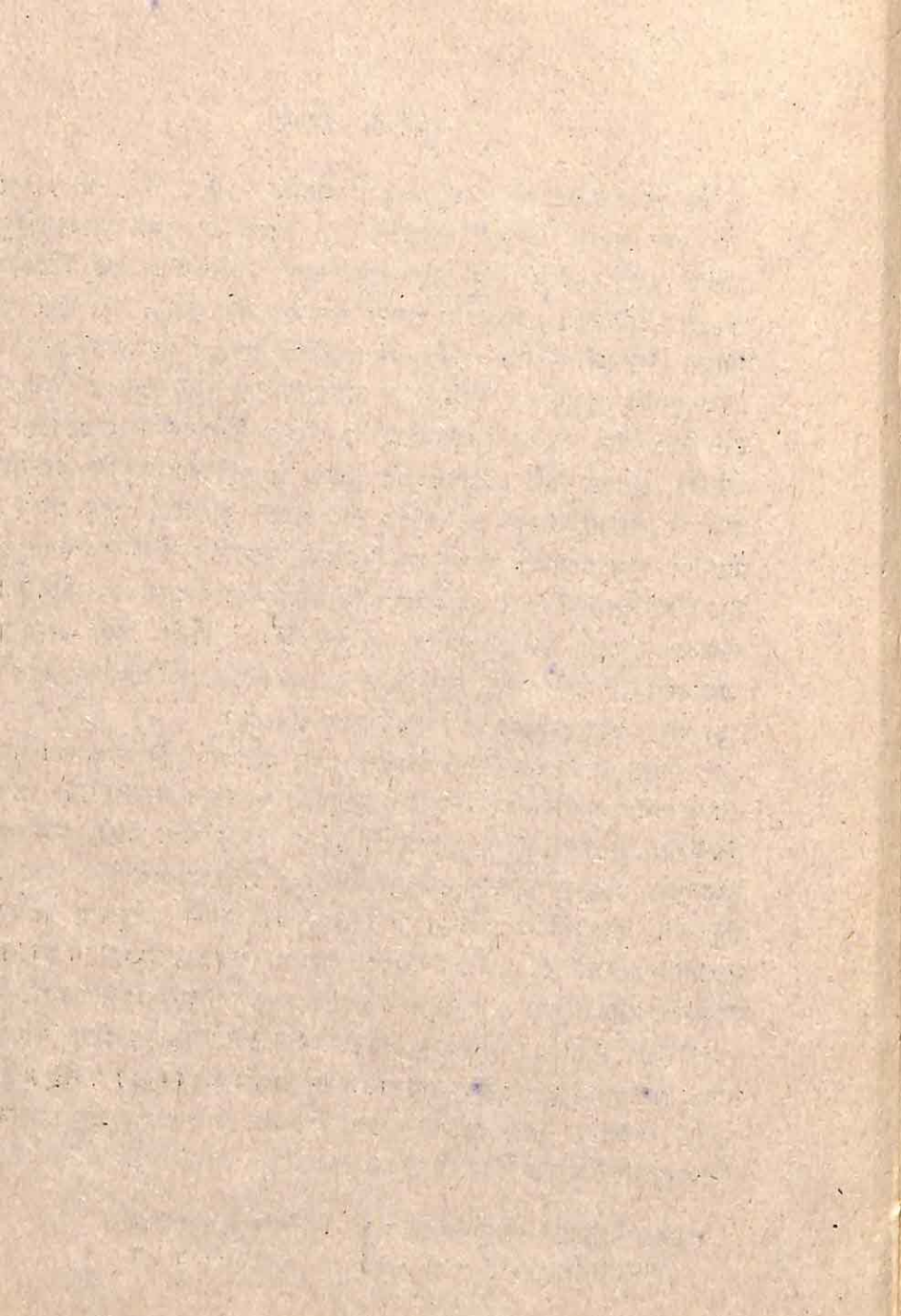
# সূচীপত্র


অনুবন্ধ ৯
জেনার ও বসন্তের টিকা ২৬
সূতিকা জ্বর ও সেমেলভিস ৪২
পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কার ৫২
রবার্ট ককের আবিষ্কার ৭৩
ডিপথেরিয়ার জীবাণু ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কার
(লোয়েফলার, এমিল রু ও এমিল বেরিং) ৯৫
ডায়াবেটিস ও ডাঃ ব্যান্টিং ১১৩
আধুনিক কেমোথেরাপির জনক আরলিক ১৪৬
ডোমাথ ও সালফা ঔষধ ১৬২
পেনিসিলিন ও তার আবিষ্কার
( ডাঃ ফ্লেমিং, ডাঃ ফ্লোরি ও ডঃ চেইন) ১৬৮
স্ট্রেপটোমাইসিন ও তার আবিষ্কার
(ডঃ দ্যুবোস ও ডঃ ওয়াকস্‌ম্যান) ২০৫
গ্রন্থপঞ্জি ২২৭
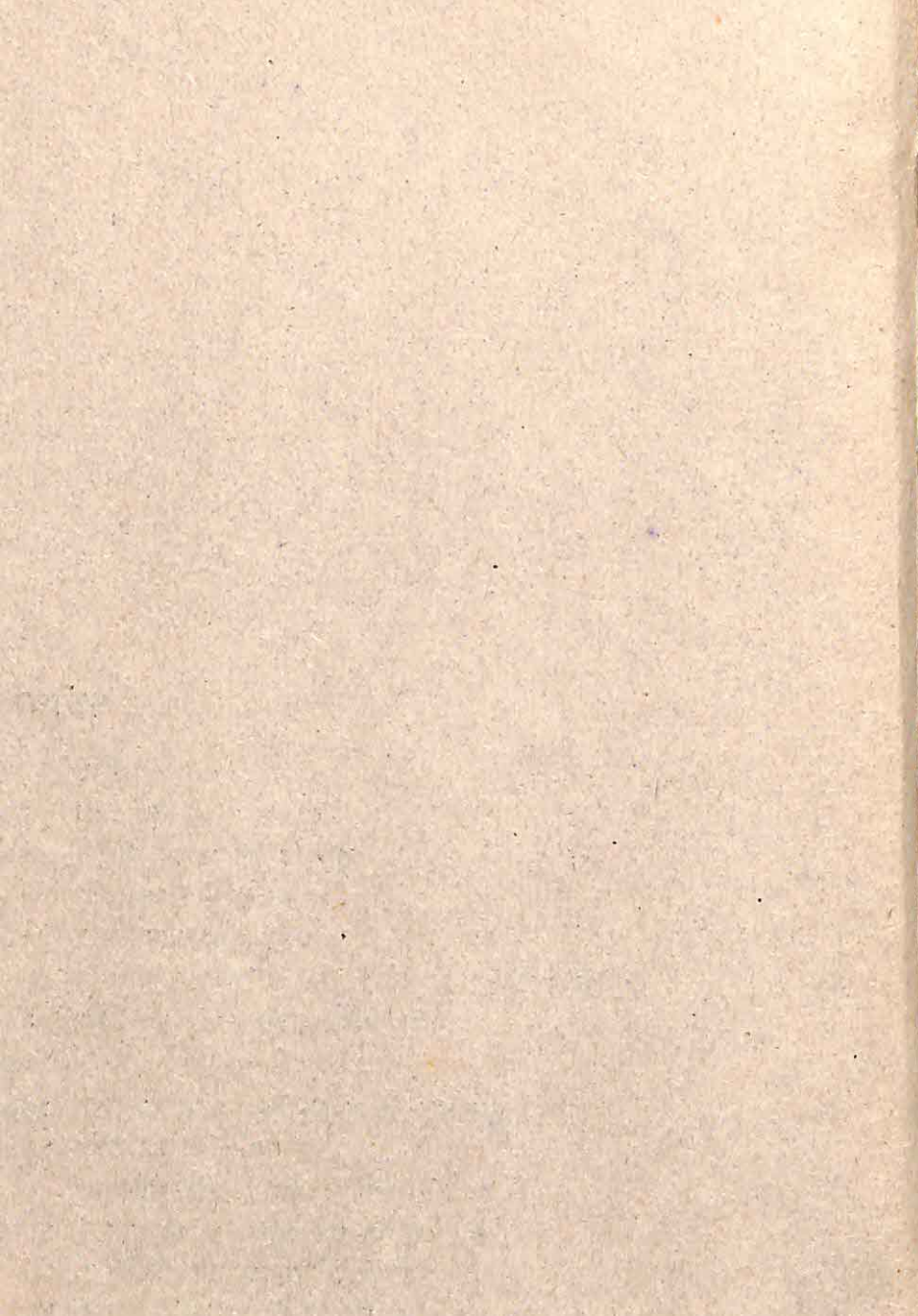
## অনুবন্ধ

পৃথিবী সৃষ্টির আদি থেকে পৃথিবীর, আর সেই পৃথিবীতে বসবাসকারী নানা প্রাণীর নানা পরিবর্তন ঘটেছে; কিন্তু জীবনের এক অবধারিত পরিণতি যে মৃত্যু, তার যেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি,—তেমনি কোনো জীব, এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ—আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানের স্বর্ণশিখরে পৌঁছেও মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি। "জন্মিলে মরিতে হবে/অমর কে কোথা কবে?"—অমর এক কবির বাণী আজও আমাদের জীবনে ধ্রুব সত্য। কিন্তু সকল জীবের এই চরম পরিণতিকে সত্য জেনেও মানুষই একমাত্র প্রাণী যে তার বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে এই মৃত্যুকে প্রতিহত করার সক্রিয় প্রচেষ্টা চিরকাল চালিয়ে এসেছে। "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে"—অমর আর এক বাঙালী কবির বাসনা তথা মানুষের চির আরাধ্য সেই কামনা পোষণ করে ব্যাধির বিরুদ্ধে সে চিরকাল সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। কেননা, ব্যাধি যেমন মানুষের চিরশত্রু, তার মৃত্যুর অন্যতম এবং প্রধান কারণ তেমনি তার সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের এক প্রবল অন্তরায়। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যদিও এ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি,তবু অনেক ব্যাধিকেই মানুষ আজ পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছে,—অকাল মৃত্যু, মহামারী প্রতিরোধ, এমনকি কোনো কোনো ব্যাধিকে কতক এলাকা থেকে একেবারে নির্মূল করতেও সমর্থ হয়েছে। ফলে আগের তুলনায় মানুষের জীবন-পরিসীমাও আজ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

অবশ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের এই সংগ্রাম, তার কবল থেকে মুক্তি লাভের এই প্রচেষ্টা, নিঃসন্দেহে অতি পুরাতন। কিন্তু কখন এবং কোথায় রোগ চিকিৎসার সর্বপ্রথম সূচনা, আদি চিকিৎসকই বা কে ছিলেন তা

যায় না, জানবার উপায়ও নেই। শুধু নিশ্চিত ভাবে এটুকুই বলা চলে যে, আঘাত পেয়ে বা রোগাক্রান্ত হয়ে প্রথম যেদিন মানুষ কাতর হয়, সেদিন থেকেই চিকিৎসা বিদ্যার শুরু—আর সেই চিকিৎসা বিদ্যার জনক সত্যিকারের কোনো চিকিৎসক ছিলেন না—ছিলেন যাদুকর। কেননা, প্রাচীনকালে, সকল দেশে, ব্যাধির কারণ কোনো অশরীরী কিছুর উপদ্রব বলে বিবেচিত বা পরিগণিত হতো। দেবতা কুপিত হলে, কিংবা কোনো দুষ্ট প্রকৃতির দানা, দৈত্য বা প্রেতাত্মা দেহে আশ্রয় নিলে মানুষ রোগাক্রান্ত হয়,—এই ছিল প্রাচীন কালের মানুষের বদ্ধমূল ধারণা বা বিশ্বাস। আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, দেব-দানব বা ভূত-প্রেতের প্রকোপ শান্ত করে ব্যাধির কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা নানা যাদুবিদ্যা, যাগ-যজ্ঞ, মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ-কবজের সাহায্য গ্রহণ করতো। মহামারী দেখা দিলে পশুবলি, এমনকি নরবলিরও আয়োজন করতো। রোগ নিরাময়ের জন্য এরূপ আদিম বিধি বা বিশ্বাস এখনও যে সর্বত্র নির্মূল হয়েছে—তা নয়—অনুন্নত সমাজে অনেক পরিমাণে এসকল আদিম ব্যবস্থা আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে।

কিন্তু এই ধরনের আদিম বিধিব্যবস্থা বা প্রচেষ্টা কখনও কোনো সুনিশ্চিত সুফল প্রদান করেনি। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলি বিফল হয়ে ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের অসহায় অবস্থা, তার ব্যর্থতাকে বারংবার প্রকট করে তুলেছে। তাই এমনি অন্ধ বিশ্বাস এবং কুসংস্কারপূর্ণ পরিবেশেও কোনো কোনো চিন্তাশীল, সত্যান্বেষী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা প্রচলিত বিশ্বাসে বিশ্বাস স্থাপন, এরূপ অনিশ্চিত ব্যবস্থায় আস্থাশীল থাকতে পারেননি। রোগের লক্ষণ তাঁরা লক্ষ্য করতে, চিনতে চেষ্টা করেছেন, মানবদেহ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন, রোগ নিরাময়ের জন্য নানা প্রকার খনিজ ও উদ্ভিজ্জ পদার্থের কার্যকারিতা পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং যুগে যুগে এমনি অনুসন্ধিৎসু, সত্যান্বেষী ব্যক্তি-বিশেষের আবির্ভাব ঘটেছে বলেই চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ এমন এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, মাত্র একশো বছর আগের কোনো চিকিৎসকের কাছেও তা মনে হতো অলৌকিক!

কিন্তু চিকিৎসা বিজ্ঞান আজ এমন উন্নত পর্যায়ে এসে পৌঁছলেও, তার অগ্রগতি মানুষের একান্ত প্রয়োজনে যতটা দ্রুত সম্পন্ন হওয়া

হিপোক্রেটিস

প্রত্যাশিত বা বাঞ্ছনীয় ছিল, একাধিক কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। মানুষের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন, ব্যক্তি

লিউয়েন হুক

বিশেষ বা কোনো বিশেষ মতবাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি একদিকে যেমন অচলায়তনের সৃষ্টি করেছে তেমনি বিজ্ঞানের অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গী জড়িত থাকায় তাদের উন্নতির প্রেক্ষিতে তার অগ্রগতি নির্ভরশীল ছিল। তাই দু'হাজার বছরেরও আগে হিপোক্রেটিস (Hippocrates ; 460 – 370 B. C.)-এর সূত্রে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যে সূত্রপাত ঘটে তার যথার্থ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয় মাত্র উনিশ শতকের দিকে। বস্তুতঃ লিউয়েন হুক (Leeuwenhoek)-এর অণুবীক্ষণ এবং

রন্টগেন

রন্টগেন ( Roentgen )-এর 'এক্স-রে' আবিষ্কার চিকিৎসা বিজ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির পক্ষে যেমন সহায়ক হয় তেমনি তাদের সহায়তায় প্রাচীন কালের বহু প্রচলিত ধারণা বা বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠিত অনেক মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করা সম্ভব হয়। অণুবীক্ষণ আবিষ্কৃত না হলে অদৃশ্য প্রাণী জগৎ এবং এই অদৃশ্য প্রাণী জগতের কোনো কোনো বাসিন্দাই যে বহু রোগের কারণ তা যেমন জানা যেত না, তেমনি প্রাণী দেহের সূক্ষ্ম গঠন ও দেহে রক্ত চলাচল সম্পর্কে বিশদভাবে

কোনো কিছুই জানা সম্ভব হতো না। অন্যদিকে এক্স-রে আবিষ্কৃত না হলে জীবন্ত জীবদেহের অভ্যন্তরীণ অনেক ক্রিয়া কলাপ সম্পর্কে অনেক কিছুই আমাদের অজ্ঞাত থাকতো।

তাই দেখা যায়, মানবদেহ ও রোগ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করে, বাহ্যিক উপায়ে রোগীর চিকিৎসা বিধি যেমন অনেক পরের ঘটনা, তেমনি ব্যাধি যে কোন দেব-দানব, অপদেবতা বা প্রেতাত্মার হস্তক্ষেপের কারণে নয়—প্রাকৃতিক কারণেই রোগের উৎপত্তি—এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে যাদু-মন্ত্রের মায়াজাল থেকে মুক্ত করে চিকিৎসা বিদ্যাকে প্রকৃত বিজ্ঞানের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করেন যে আদর্শ চিকিৎসক ও চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস, তিনিও রোগের কারণ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী ছিলেন। কারণ, শারীরবৃত্ত ( physiology ) ও রসায়নশাস্ত্র তখনও তাদের শৈশববস্থা পেরিয়ে আসতে পারেনি। সেকালে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ—এই চারটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে পরিগণিত ছিল এবং তাদের বিভিন্ন সংযোগে ও সংমিশ্রণে বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি, এই মতবাদ প্রচলিত ছিল বলে তিনি ধারণা করেছিলেন যে, মানব দেহ এই চারটি মূল উপাদান বা শারীরিক রস (humour)-এর সমন্বয়ে গঠিত এবং দেহে যদি এই চারটি রসের ভারসাম্য বজায় থাকে, তবে সকল প্রকার ব্যাধির আক্রমণ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে মানুষ সুস্থ থাকে। কিন্তু কোনো কারণে দেহে যদি এই ভারসাম্য ব্যাহত হয়—তবে ব্যাধির আক্রমণ ঘটে—দেহ রোগগ্রস্ত হয়। চিকিসৎকের তাই প্রধান করণীয় হলো, দেহে এই ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠায় প্রকৃতিকে সাহায্য করা।

ভ্রান্তিপূর্ণ এই ধারণার বশবর্তী হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে হিপোক্রেটিস এবং তাঁর শিষ্যদের অবদান অনন্য। অপ্রমাণিত বিশ্বাসের পরিবর্তে পর্যবেক্ষিত তথ্যের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, কুসংস্কারের পরিবর্তে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার পথ প্রদর্শন করেছিল। হিপোক্রেটিসের কৃতিত্ব হলো—তিনি কোন্ রোগে কি লক্ষণ, কি উপসর্গ দেখা দেয় তা দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করে লিপিবদ্ধ

কিন্তু অধ্যাপকের কথায় সেমেলভিস সন্তুষ্ট হতে পারতেন না। আবার প্রশ্ন করতেন, "তা হলে সব প্রসূতিদের দেহে এই বিষ প্রবেশ করে না কেন? কেনই-বা সবার মৃত্যু হয় না এই জ্বরে?" অধ্যাপক জবাব দিতেন, "সকলের শরীরের ধাত এক নয়। কারো রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি বেশী থাকে—কারো তা থাকে না।" কিন্তু এ সকল জবাবে সেমেলভিসের মন শান্ত হতো না। বারবার এই ভাবনাটাই তাঁর মনে ভেসে উঠতো, পাশেইতো রয়েছে দু'নম্বর ওয়ার্ড—কই, সেখানেতো এত বেশী প্রসূতি মরে না?

এক নম্বর ওয়ার্ড সম্পর্কে প্রসূতিদের তাই আতঙ্কের অন্ত ছিল না। তারা ধরেই নিতো এক নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি হলে তাদের মৃত্যু অবধারিত।

শনি, রবি ও মঙ্গলবার ছিল এক নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তির দিন। পারতপক্ষে প্রসূতিরা এই দিনগুলিকে এড়িয়ে চলতো। এমনকি, কারো প্রসব বেদনা শুরু হলেও কষ্টে তা চেপে রাখতো। হিসেবে ভুল করে কেউ যদি দেখতো এক নম্বরে তার স্থান হয়েছে, তখন তাকে ছেড়ে দিতে কিংবা দু'নম্বরে তাকে বদলি করার জন্য কান্নাকাটি করতো, হাতে পায়ে ধরতো সেমেলভিসের। কিন্তু কোনো সাহায্যই তিনি করতে পারতেন না। নিয়ম ভঙ্গ করার সাধ্য ছিল না তাঁর।

সেমেলভিস লক্ষ্য করতেন, প্রসবের পর দু'তিন দিন প্রসূতিরা বেশ ভাল থাকে। বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে আদর করে। মাতৃত্বের গর্বে ও আনন্দে বুক তাদের ভরে ওঠে—গালে দেখা দেয় লাল আভা। কিন্তু দিনান্তের রক্তিম আভার মতই তা যেন ক্ষণস্থায়ী! অচিরেই সকল আনন্দ নিস্প্রভ হয়ে আসে। প্রথমে দেখা দেয় জ্বর, তারপর পেটে ব্যথা শুরু হয়। শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাই তারা বলে, "আমার কি হবে ডাক্তার?"

সেমেলভিস জানেন কি হবে! তবুও তিনি তাদেরকে সান্ত্বনা দেন, ভরসা দেন। জিভ তাদের কেবলই শুকিয়ে আসে, বারবার পানি খেয়েও পিপাসা তাদের মেটে না। দিন চারেক পরে তারা

বলে, "ব্যথা যেন কিছুটা কমেছে ডাক্তার—একটু ভাল বোধ হচ্ছে।" কিন্তু পরক্ষণেই "ডাক্তার' একটু পানি" বলে হাঁপাতে থাকে। আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই, সেমেলভিস বুঝতে পারেন এদেরকে আর বাঁচানো যাবে না। মৃত্যুদূত শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছে। এবার সব কষ্টের শেষ হবে। মুখ ফিরিয়ে তাই তিনি সেখান থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন।

অথচ হাসপাতালে যখন তারা আসে তখন তারা সুস্থ ও সবল থাকে। কিন্তু আশ্চর্য, সন্তান প্রসবের পর দু'দিনের মধ্যেই কি যে এমন অঘটন ঘটে যার জন্য এদের জ্বর হয়, আর সেই সর্বনাশা জ্বরে একেবারে তারা শেষ হয়ে যায়! অসহায়ভাবে দিনের পর দিন সেমেলভিস কেবল এই করুণ দৃশ্যের অবতারণা হতে দেখেন, কিন্তু প্রতিকারের কোনো উপায়ই খুঁজে পান না তিনি।

প্রতিদিন সকালে প্রথমে তিনি যমঘরে (পোস্টমরটেম রুমে) গত-রাতে পাঁচদিনের হতভাগ্য শিশুটিকে রেখে যে মায়ের মৃত্যু হয়েছে, তার শব ব্যবচ্ছেদ করতেন। এ কাজে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে সাহায্য করতো এবং এই ছাত্রদেরকে নিয়েই পরে তিনি এক নম্বর ওয়ার্ডে যেতেন। কার প্রসবকাল কত আসন্ন তা পরীক্ষা করতেন। তাঁর পোশাকে, হাতের আঙ্গুলে শবদেহের গন্ধ লেগে থাকতো।

দু বছর ধরে তিনি এমনি ভাবে কাজ চালিয়ে গেলেন কিন্তু শীঘ্রই দেখা দিলো বিপত্তি। এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুর হার বেড়ে গেলো। শঙ্কিত হয়ে উঠলেন সেমেলভিস। চারদিকে এ নিয়ে শুরু হলো কোলাহল। কারণ অনুসন্ধানের জন্য বসলো কমিশন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক নিয়ে গঠিত এই কমিশন যে রায় দিলেন তার সারমর্ম হলো: এক নম্বর ওয়ার্ডে প্রসূতিদের ভিড় খুব বেশী, পুরুষ ডাক্তার ও ছাত্ররা প্রসূতিদের পরীক্ষা ও প্রসব করায় বলে নারীসুলভ কোমলতা তাদের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না। তাই দু'নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে ধাত্রীরা একাজ করেন, সেখানে মৃত্যুর হার স্বভাবতই কম।

রিপোর্ট পড়ে সেমেলভিস কৌতুক বোধ করলেন। ভেবে তাঁর হাসি পেল, ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগে শিশুরা মাকে যে কষ্ট দেয়, তার তুলনায় ডাক্তারেরা প্রসূতিকে কী এমন কষ্ট দেয়?

এক নম্বর ওয়ার্ডে কোনো রোগী আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন হলে পুরোহিত ঘণ্টা ধ্বনির সাথে এই ওয়ার্ডে প্রবেশ করতেন। এক রাতে সেমেলভিস তাঁর ঘরে বসে চার-চারবার এই ঘণ্টা ধ্বনি শুনতে পেলেন। এই ঘণ্টা ধ্বনির সাথে সেমেলভিস ও তাঁর রোগিনীরা ছিলেন বিশেষ পরিচিত। তাই বুঝতে কারো আর বাকি রইলো না যে, আজ চারজন হতভাগিনী মায়ের মৃত্যু হলো। এই ঘণ্টাধ্বনি যেন মৃত্যুর অগ্রদূত। সহসা সেমেলভিসের মনে হলো, তবে কি এই ঘণ্টা ধ্বনির আতঙ্ক থেকেই প্রসূতিরা মরণ-জ্বরে আক্রান্ত হয়? দুই নম্বর ওয়ার্ডে এই বিধি পালিত হতো না। পুরোহিতরা নিঃশব্দে ভিন্ন দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করতেন। তবে কী এই কারণেই এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুর সংখ্যা এত বেশী? সেমেলভিস পুরোহিতকে অনুরোধ করে সেদিন থেকে ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করলেন। কিন্তু এতে সুফল কিছু ফললো না—মৃত্যুর হার আগের মতই রয়ে গেলো।

এ সময়ে হঠাৎ করে সেমেলভিসের চাকরি চলে গেলো যাঁর জায়গায় তাঁকে নেয়া হয়েছিল তিনি ফিরে আসার জন্য। অধ্যাপক ক্লাইন তাঁর পুরোনো সহকারীকেই কাজে বহাল করে সেমেলভিসকে বিদায় দিলেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে পুনরায় তাঁর চাকরিটি জুটে গেলো। পুরোনো সেই সহ-কারী এক অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে চলে গেলেন।

কিন্তু চাকরিতে পুনরায় বহাল হওয়ার পরপরই সেমেলভিসের জীবনে ঘটলো এক শোকাবহ ঘটনা। প্রিয় বন্ধু কেলেটস্কার, যাঁর সঙ্গে তিনি শব ব্যবচ্ছেদের কাজ করতেন, তাঁর মৃত্যু হলো। ছাত্রদেরকে শেখানোর উদ্দেশ্যে শব ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে কেলেটস্কারের একদিন আঙ্গুল কেটে যায়, তারপর জ্বর ও রক্ত দুষিত হয়ে শেষে তার মৃত্যু হয়। যমঘরে যখন কেলেটস্কারের শব ব্যবচ্ছেদের বন্দোবস্ত হলো তখন শোকাতুর সেমেলভিস বন্ধুর মৃত দেহের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিদারুণ দুঃখশোকের মধ্যেও তিনি আশ্চর্য হয়ে

লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর বন্ধুর আঙুলের যে স্থানটি কেটে গিয়েছিল সেখান থেকে সম্পূর্ণ হাতটি ফুলে গেছে—মাংসের মধ্যে স্তরে স্তরে জমেছে রক্ত; আর এই দূষিত রক্ত অন্ত্র পর্যন্ত প্রবেশ করেছে। যে লক্ষণগুলি তিনি দু'বছর ধরে সূতিকা জ্বরে মৃত প্রসূতিদের দেহে দেখে আসছেন, অবিকল সেগুলিই তিনি কেলেটস্কারের মৃত দেহেও দেখতে পেলেন। কেলেটস্কারের কাটা আঙ্গুলে শবদেহ থেকেই তাহলে বিষ প্রবেশ করেছে। তবে কি মৃতদেহের প্রসবজনিত ক্ষতের মধ্য দিয়েই শবদেহের এই সাংঘাতিক বিষ প্রসূতি দেহে প্রবেশ করে? এই কথা ভাবতেই তিনি শিউরে উঠলেন। সমস্ত শরীর তাঁর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। কি করে, শবদেহ থেকে মাতৃদেহে এই বিষ সংক্রামিত হয় বুঝতে তাঁর আর বাকি রইলো না। নিঃসন্দেহ যে এই বিষ বহন করে নিয়ে যান তিনি নিজে এবং তাঁর ছাত্ররা। এতদিনের শত শত প্রসূতিদের মৃত্যুর জন্য দায়ী তবে তাঁরাই! এই নির্মম সত্য, তাঁদের সীমাহীন অপরাধের কথা স্মরণ করে সেমেলভিস তাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মনে পড়লো, এতদিন তিনি নিজ হাতে শব ব্যবচ্ছেদ করে ছাত্রদেরকে শিখিয়েছেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলে, তাঁর পোশাকে এই সব শবদেহের গন্ধ মিশে থাকতো। এই হাত দিয়েই তিনি প্রসূতিদেরকে পরীক্ষা করেছেন—তাদের প্রসব করিয়েছেন। যে হতভাগ্য প্রসূতির প্রসব কাল যত দীর্ঘ হয়, তাকে তত বেশী বারই পরীক্ষা করতে হয়। আর এ ভাবে তার দেহে তত বেশী বিষ সংক্রমণের সুযোগ ঘটে। সেই ভাগ্যবতীই শুধু বেঁচে যায় যার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই সন্তান প্রসব হয়—হাত দিয়ে পরীক্ষা করার তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

এতদিনে সেমেলভিস বুঝতে পারলেন কেন দু'নম্বর ওয়ার্ডে প্রসূতিরা কম মারা যায়। সেখানে ধাত্রীরা প্রসব করায়। তারা কেউ শব ব্যবচ্ছেদ করে না। কাজেই হাতে তাদের শবদেহের কোনো বিষ থাকে না। নিদারুণ অনুশোচনায় সেমেলভিস তাই দগ্ধ হতে লাগলেন। তাঁরই ভুলে কত না প্রসূতিকে তিনি নিজ হাতে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। শুধু এটুকুই সান্ত্বনা, তাঁর অজান্তেই তিনি তা করেছেন। তখনই তিনি

সংকল্প করলেন, আর নয়। যা হবার তা হয়েছে, এখন থেকে তিনি এর প্রতিবিধান করবেনই।

তারপর তিনি যে কাণ্ড শুরু করলেন তাতে ছাত্ররা অবাক হলো! নানা মহলে নানা গুঞ্জন উঠলো—এমনকি তাঁর মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগলো। প্রতিদিন শব ব্যবচ্ছেদের পর তিনি সাবান দিয়ে ভাল করে হাত ধুতেন—দু'একবার নয় বহুবার। এক একবার হাত ধুয়ে তিনি শুঁকে দেখতেন হাতে কোনো গন্ধ আছে কি না। যখন গন্ধ নেই বলে নিঃসন্দেহ হতেন, তখন সেই হাত আবার এক লোশনে বেশ কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখতেন—আবার শুঁকে দেখতেন, কোনো গন্ধ পান কিনা। শুধু নিজে নন, প্রত্যেক ছাত্রকে তিনি এমনি-ভাবে হাত পরিষ্কার করতে বাধ্য করতেন। এভাবে হাত ধোয়ার কাজ শেষ করে তবে তিনি ছাত্রদেরকে নিয়ে প্রসূতিদের পরীক্ষা করতে যেতেন। ছাত্ররা এমনি বাধ্যবাধকতায় বিরক্ত হতো, ঠাট্টা বিদ্রূপও করতো তাঁকে, কিন্তু সেমেলভিস সেদিক ভ্রূক্ষেপও করতেন না—অবিচল থাকতেন তার সংকল্পে।

অবশ্য এই কঠিন বিধি পালন করে শীঘ্রই সুফল ফললো। আগের মাসে যেখানে শতকরা ১৮ জন প্রসূতি মারা গিয়েছিল, পরবর্তী দু'মাসে মৃত্যুর সংখ্যা সেখানে কমে শতকরা মাত্র দু'জনে এসে দাঁড়ালো। অনেকের কাছে এখন এক নম্বর ওয়ার্ড দু'নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ে বেশী নিরাপদ মনে হতে লাগলো। কিন্তু রোগীর এই নিরাপদ আপদ হয়ে উঠলো সেমেলভিসের পক্ষে।

আজকের দিনে, সেমেলভিসের এমনি কৃতিত্বে সারা পৃথিবীতে যেখানে তাঁর জয় জয়কার পড়ে যেত, সেখানে তেমন কিছুতো দূরের কথা, এ ব্যাপারে তিনি বেশ বিপদে পড়লেন। ধাত্রীবিদ্যা বিশারদেরা সেমেলভিসের এই পদ্ধতি প্রয়োগে সূতিকা জ্বর প্রতিরোধ করার বিষয়ে বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বললেন, এক নম্বর ওয়ার্ডে মৃত্যুর হার কমে যাওয়া সেমেলভিসের পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য নয়, হয়ত প্রসূতিদের ভিড় তখন বেশী ছিল না, কিংবা বাতাসে এ সময়ে বিষ কম ছিল—এমনি ব্যাখ্যা প্রদান করে

সেমেলভিসের কৃতিত্বকে তাঁরা স্বীকার করতে চাইলেন না। অধিকন্তু সবাই তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হলেন। আর সবচেয়ে রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত হলেন ওয়ার্ড দু'টির বড়কর্তা অধ্যাপক ক্লাইন। তাঁর কাছে মনে হলো, ছোকরা ডাক্তার যেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি করছে। তাঁর আরও বেশী ঈর্ষা ও বিরক্তির কারণ হলো, কয়েকজন নামকরা অধ্যাপক, যদিও তাঁরা ধাত্রী-বিদ্যা বিশারদ নন, সেমেলভিসের এই কাজের খুব সুখ্যাতি করে বেড়াচ্ছেন, পত্র পত্রিকায় তাঁর পদ্ধতির সাফল্য সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখছেন—এমনকি এ সকল প্রবন্ধে তাঁরা সেমেলভিসকে বসন্তের টিকা আবিষ্কারক জেনারের সমপর্যায়ে তুলে ধরছেন। ঈর্ষাকাতর ক্লাইন কী করে এত সব সহ্য করেন? তাই ছোকরা ডাক্তারকে কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি সুযোগ খুঁজতে লাগলেন।

এমনি সময়ে একদিন এক নম্বর ওয়ার্ডে হঠাৎ করেই এক সঙ্গে ১১জন প্রসূতির সূতিকা জ্বরে মৃত্যু হলো। কেন যে এমন অঘটন ঘটলো সেমেলভিস তা ভেবে পেলেন না। সব কিছুইতো আগের মতই চলছে। প্রসূতিদেরকে পরীক্ষা করার আগে তিনি নিজে যেমন হাত পরিষ্কার করছেন তেমনি ছাত্রদের ক্ষেত্রেও তা বলবৎ রেখেছেন, তবু কেন ঘটলো এই অঘটন? কিছুই ভেবে পেলেন না সেমেলভিস। আর এদিকে খুব খুশী হলেন অধ্যাপক ক্লাইন। ভাবলেন, ছোকরা এবার বেশ জব্দ হবে —সহজে তাঁকে তাড়ানো যাবে।

সেমেলভিসের মনে তখন কেবলই এক চিন্তা—কেন এমন হল? শেষে মনে পড়লো, শব ব্যবচ্ছেদ করে তিনি ও তাঁর ছাত্ররা নিয়মিত হাত পরিষ্কার করে সর্বপ্রথম যে প্রসূতিকে পরীক্ষা করেছিলেন তার ছিল ক্যান্সার এবং সেই সাথে দুষ্ট স্রাব। তারপর ঐদিন পরপর যে দশজন প্রসূতিকে তাঁরা পরীক্ষা করেন তারাও মারা যায়। একথা মনে করতে গিয়ে সেমেলভিস স্পষ্টই বুঝতে পারলেন; প্রথম প্রসূতি থেকেই রোগের বিষ বাকি দশজনের দেহে সংক্রমিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক নূতন তথ্যের সন্ধানও তিনি পেলেন। জীবন্ত মানুষের দুষ্ট ক্ষত থেকেও এই ব্যাধির সংক্রমণ ঘটে।

এরপর সেমেলভিস তাই আবার এক নতুন নিয়মের প্রবর্তন করলেন —শুধু শব ব্যবচ্ছেদের পরে নয় প্রত্যেক প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে, আগের নিয়ম মাফিক হাত পরিষ্কার করতে হবে।

এই ব্যবস্থায় তাঁর ওয়ার্ডে মৃত্যুর হার আবার কমে গেল। বৃদ্ধ অধ্যাপক ক্লাইনের দুরভিসন্ধি যদিও এবারের মত ব্যর্থ হলো, কিন্তু শীঘ্রই আর এক সুযোগ তাঁর হাতে এলো। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সাথে সেমেলভিসকে জড়িত করে তিনি সহকারীর পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দিলেন এবং শব ব্যবচ্ছেদের বদলে শুধু পুতুল দিয়ে ধাত্রীবিদ্যা শেখানোর জন্য তাঁকে নির্দেশ দিলেন। ক্লাইনের এরূপ হীন মনোভাব ও অপমান সেমেলভিস সহ্য করতে পারলেন না। তিনি চাকরি ছেড়ে দিলেন। কিছুদিন বুদাপেস্টের এক হাসপাতালে বিনা বেতনে কাজ করে ১৮৫৫ সালে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন। এখান থেকেই ১৮৬১ সালে তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ পুস্তক 'সূতিকা জ্বরের কারণ ও তার প্রতিকার' প্রকাশিত হলো এবং ঐ বছরেই 'হরেক রকম ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপকদের কাছে খোলা চিঠি' নামে এক ব্যঙ্গ রচনাও তিনি প্রকাশ করলেন।

সেমেলভিস আগেও যেমন লক্ষ্য করেছিলেন তেমনি এখানেও দেখলেন, সামান্য একটু পরিষ্কার থাকা এবং প্রসূতিকে পরীক্ষা করার আগে ভাল করে হাত ধোয়া প্রসূতিদের সূতিকা জ্বরের প্রবণতাকে কতটাই না কমিয়ে আনে। এখানকার হাসপাতালে এই প্রথার প্রবর্তন করে তিনি যেখানে বিরাট সাফল্য লাভ করেছেন সেখানে এই সব পণ্ডিত-মূর্খ, বড় বড় ধাত্রী বিশারদেরা শুধু নিজেদের অহমিকা ও অজ্ঞতার জন্য প্রতিদিন কত প্রসূতিকেই-না মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন? তাঁরা কী সত্যই বিশারদ না মাতৃহন্তা? যতই তিনি একথা ভাবেন ততই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন, আর বিশেষজ্ঞদের উদ্দেশ্যে কঠিন ভাষায় খোলা চিঠি লেখেন। কিন্তু তাঁর প্রবর্তিত পদ্ধতির মত এ সকল খোলা চিঠিও উপেক্ষিত হলো। বিশেষজ্ঞরা নিশ্চুপ রইলেন। কোনো জবাবই তাঁরা দিলেন না। এতে সেমেলভিস আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এক বিজ্ঞান সাময়িকীতে তিনি

চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে লাগলেন—সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকেও এই সব ডাক্তার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে উপদেশ দিলেন। প্রসব করানোর আগে ডাক্তার কিংবা ধাত্রীরা ব্লিচিং পাউডারের মিশ্রণে বেশ কিছুক্ষণ হাত ডুবিয়ে নিয়েছেন কিনা সেদিকে জনসাধারণকে সজাগ করার জন্য তিনি লিখিত প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় প্রচার অভিযান শুরু করলেন। এমন কি পথে কোনো তরুণ দম্পতির সাথে সাক্ষাৎ ঘটলে সেখানেই দাঁড় করিয়ে ব্লিচিং পাউডারের কথা তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতেন। এরূপ আচরণ যে কতটা অশোভন—কেউ যে কোনো কিছু ভাবতে পারে এজন্য, তা তাঁর খেয়ালে কখনও আসতো না।

যাহোক, এমনি উপদেশ বিতরণ বেশীদিন আর চললো না। যে অন্যায়, অবিচার তাঁর প্রতি একদিন করা হয়েছিল—তাঁর সাফল্যজনক পদ্ধতির প্রকৃত গুরুত্ব না দিয়ে বিশেষজ্ঞরা তাঁকে যে মানসিক যাতনায় নির্যাতিত করেছিলেন তাঁদের সেই নির্মমতা তাঁর কর্মশক্তি ও উদ্দীপনাকে অচিরেই নিস্তেজ করে আনলো এবং যেটুকুও-বা ছিল তাও প্রচার কার্যের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে নিঃশেষিত হয়ে গেলো। বিশ্রামের জন্য ভিয়েনাতে বেড়াতে গিয়ে তিনি পাগল হয়ে গেলেন এবং এক পাগলা গারদে ঘটলো তাঁর অপমৃত্যু। ভিয়েনায় আসার আগে এক অস্ত্রোপচার করতে গিয়ে তাঁর হাতের আঙ্গুল কেটে যায় এবং বন্ধু কেলেটস্কারের মত সেই ক্ষত থেকে রক্ত দূষিত হয়ে মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

সূতিকা জ্বরের সঠিক কারণ নির্ণয় করতে না পারলেও তার প্রতিকারের জন্য যে পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন তার ফলে এককালে যেমন শত শত প্রসূতির জীবন রক্ষা পেয়েছিল তেমনি তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি সূতিকা জ্বরের ভয়াবহতা থেকে আজ হাসপাতালগুলিকে মুক্ত করতে পেরেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, যে ব্যাধির বিরুদ্ধে সেমেলভিস সারাজীবন সংগ্রাম করেছিলেন নিয়তির এমনি নির্মম পরিহাস যে, সেই রক্ত-দুষ্টির করাল গ্রাসেই তিনি পতিত হয়েছিলেন—আর অকালে হারিয়েছিলেন তাঁর প্রিয়তম বন্ধু কেলেটস্কারকে!

# পাস্তুর ও তাঁর আবিষ্কার

মানুষ যে সকল রোগে আক্রান্ত হয় তাদের মধ্যে এমন কতকগুলি রোগ আছে যেগুলি একজনের হলে নিকটস্থ লোকের দেহে সংক্রামিত হয়, ক্রমে তা বহুজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং কখনও-বা মহামারীর আকার ধারণ করে বহু লোকের অকালে প্রাণ হরণ করে। এ সকল রোগ কখনও কোথাও শুরু হলে মানুষ ভীত বিহ্বল হয়ে পড়ে, কিন্তু কেন এই রোগ হয়, কেমন করে তা বহু লোকের মধ্যে স্বল্প সময়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে-রহস্য বহুদিন মানুষের জানা ছিল না। এ সমস্ত রোগের কারণ যে অদৃশ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবাণু তা সর্বপ্রথম যিনি আবিষ্কার করেন এবং কতকগুলি রোগের প্রতিরোধের পন্থা উদ্ভাবন করেন—মজার কথা হলো—তিনি ডাক্তার ছিলেন না—ছিলেন স্বনামধন্য রসায়নবিদ, লুই পাস্তুর (**Louis Pasteur**)।

১৮২২ সালে ২৭শে ডিসেম্বর ফ্রান্সের দোলে নামক শহরে পাস্তুর জন্মগ্রহণ করেন। পাস্তুরের পিতা নেপোলিয়ানের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করেন। সৈনিক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি 'ক্রশ অফ দি লিজিয়ন অফ অনার' এর সম্মান লাভ করেন। পিতার সৈনিক জীবনের সাহসিকতা পুত্রের মধ্যেও প্রকাশিত হতে দেখা যায়। তাই পাস্তুর নিজের বিপদ সম্পর্কে সারা জীবন যেমন উদাসীন ছিলেন, তেমনি শত্রুদের বিরুদ্ধ সমালোচনাও তাঁকে কোনদিন কর্তব্যচ্যুত করতে পারেনি। তিনি তাঁর জন্মভূমিকে এত গভীরভাবে ভালবাসতেন যে, তার জীবনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল আপন জন্মভূমির লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনা।

যুদ্ধ শেষে পাস্তুরের পিতা দেশে ফিরে তাঁর পরিবারের জাত ব্যবসা কাঁচা চামড়া পাকা করার কাজ শুরু করেন। সে সময়ে ফ্রান্সে চাষা-

ভূষাদের মধ্যে লেখা পড়ার প্রচলন ছিল না। কিন্তু পাস্তুরের পিতা পাস্তুরকে লেখা পড়া শেখালেন। অবশ্য পাস্তুরকে লেখাপড়া শেখানোর পেছনে তাঁর তেমন কোনো উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না।

ছাত্র হিসাবে পাস্তুর তেমন কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। এমন কি যে রসায়ন শাস্ত্রে পরে তিনি অধ্যাপনা ও গবেষণা করে খ্যাতি অর্জন করেন, বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করার সময় তাঁর শিক্ষক সেই রসায়ন শাস্ত্রে তাঁকে মাঝারি ধরনের ছাত্র বলে মন্তব্য করেছিলেন।

পাস্তুরের জীবনে তাই দেখা যায় যে, মেধাবী ছাত্র হওয়াই কেবল সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। জীবনে বড় হওয়া, সাফল্য লাভ করা নির্ভর করে কঠিন অধ্যবসায়ের সঙ্গে অবিশ্রান্ত কাজ করে যাওয়ার ওপর। জীবনের শেষদিনগুলির সময়ে কোনো পুরোনো ছাত্র তাঁর কাছে যদি দেখা করতে আসতো তবে তাকেও তিনি বারবার এই উপদেশই দিতেন, "কাজ করো, কাজে বিমুখ হয়োনা কোনদিন।"

শুধু বৃদ্ধ বয়সে কেন, কঠোর পরিশ্রম যে সাফল্যের চাবিকাঠি তা তিনি যুবক বয়সেই উপলব্ধি করেছিলেন। এ সময়ে তাঁর এক ভগ্নীকে তিনি লিখে-ছিলেন, "বোন, ইচ্ছাটাই সব, তুমি যদি সত্যি কিছু পেতে চাও—তোমাকে পরিশ্রম করতে হবে, কঠোর পরিশ্রম—যা তোমাকে এনে দেবে সাফল্য। প্রবল ইচ্ছা সফলতার দরজায় এনে দেয়, পরিশ্রম সেই দরজা পার করে তোমাকে সাফল্যের প্রাঙ্গণে পৌঁছে দেবে।"

পাস্তুর তাঁর কর্মময় জীবনে এই কথারই সত্যতা প্রমাণ করেছিলেন।

যাহোক, ছেলেবেলায় তিনি ভাল ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করতে না পারলেও, মাছ ধরতে যেমন তিনি ছিলেন ওস্তাদ তেমনি ছবি আঁকতেও ছিলেন পারদর্শী। ছেলেবেলায় তাঁর আঁকা ছবিগুলি আজও প্যারীর পাস্তুর গবেষণাগারে সংরক্ষিত রয়েছে। মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি তাঁর বাবা মার যে প্রতিকৃতি এঁকেছিলেন তা দেখে বহু বিখ্যাত চিত্রশিল্পী মন্তব্য করেছেন যে, তিনি যদি বিজ্ঞানে আত্মনিয়োগ না করে ছবি আঁকার দিকে মনোযোগী হতেন, তবে একদিন নাম করা চিত্রশিল্পী হতে পারতেন।

গ্রামে কিছুদিন লেখাপড়া শেখার পর ১৬ বছর বয়সে প্যারীর এক স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হলো। কিন্তু বাড়ির জন্য মন তার কেবলি কাতর হয়ে পড়তো এবং এমনি ভাবে নিঃসঙ্গ থাকতে থাকতে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্রায়ই বলতেন, "যদি কোনোভাবে আমার বাড়ির ট্যানারীর গন্ধ শুঁকতে পেতাম তবে নিশ্চয়ই আমি ভাল হতাম।" শেষে তিনি সত্যই একদিন বাড়ি চলে এলেন। কিন্তু শিক্ষা লাভের প্রেরণা তাঁকে পুনরায় শহরে টেনে আনলো এবং ১৮৪০ সালে সাহিত্যে এবং ১৮৪৭ সালে বিজ্ঞানে তিনি গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করলেন। বিজ্ঞান শিক্ষাকালে তিনি আঁদ্রে ডুমার অধ্যাপনায় গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ডুমা তখন
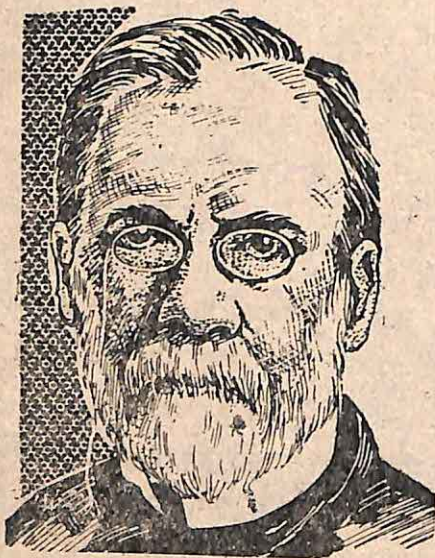
লুই পাস্তুর

জৈব রসায়ন নিয়ে খুবই মত্ত এবং বিশ্বজোড়া তাঁর খ্যাতি। পাস্তুর রসায়নের দিকেই তাই ঝুঁকে পড়লেন এবং বিজ্ঞানী বালার্দের কাছে স্ফটিক সম্পর্কে গবেষণা করার অভিপ্রায় জানালেন। বালার্দ তখন ব্রোমিন নামে একটি মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করে যশস্বী হয়েছিলেন।

মাঝে মাঝে তিনি স্ফটিকের উপর বক্তৃতা দিতেন। পাস্তর ইতিমধ্যে স্ফটিক সম্পর্কে প্রচুর পড়াশুনা করেছিলেন এবং বালার্দের এ সকল বক্তৃতা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। কাজেই বালার্দের সাথে তাঁর কিছু পরিচয় ছিল। বালার্দ যখন জানতে পারলেন যে পাস্তর তাঁর অধীনে স্ফটিক সম্পর্কে গবেষণা করতে উৎসুক, তখন সানন্দে তাঁকে তিনি সহকারী হিসাবে গ্রহণ করলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই পাস্তরের মৌলিক চিন্তাধারা বালার্দকে বিস্মিত করলো এবং তিনি এমন এক বিষয়ে তাঁকে গবেষণা করতে অনুরোধ করলেন যার রহস্য উদঘাটন তখনকার বড় বড় বিজ্ঞানীরাও করতে পারছিলেন না। পাস্তর শীঘ্রই এ সম্পর্কে এক প্রবন্ধ রচনা করে বালার্দের কাছে পেশ করলেন। বালার্দ পাস্তরের প্রবন্ধ পড়ে চমৎকৃত হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর গবেষণার কথা বিখ্যাত বিজ্ঞানী বায়টের গোচরে আনলেন। বায়ট এক তরুণ বিজ্ঞানীর এমন বিস্ময়কর আবিষ্কারের কথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। তিনি পাস্তরকে তাঁর সামনে তা পুনরায় পরীক্ষা করে দেখাতে ডেকে পাঠালেন। পাস্তর যখন তাঁর সামনে সত্য সত্যই তা প্রমাণ করে দেখালেন, তখন বায়ট আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পাস্তরের হাত ধরে বলেছিলেন, "বৎস, আমি সারা জীবন বিজ্ঞানকে এমনই ভালবেসেছি যে, এ ব্যাপারে আমার মন সত্যই আনন্দে নেচে উঠছে।" সেই থেকে তিনি পাস্তরকে আপন ছেলের মতই স্নেহ করতেন।

এই আবিষ্কার পাস্তরকে একজন প্রকৃত রসায়নবিদ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলো এবং তিনি স্টাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। সাফল্য তাঁর শুধু এদিকেই এলো না। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের একমাত্র কন্যা মেরী লরেতের হৃদয়টিও জয় করে ফেললেন এবং ১৮৪৯ সালে ২৭ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে করলেন। পিতার মত তিনিও যে সাহসী ছিলেন তার এক প্রমাণ তিনি এই বিয়ের ব্যাপারেও দিয়েছিলেন। বিয়েতে মেরী লরেতের পিতার অনুমতি চেয়ে তিনি যে পত্রটি লেখেন তা যেমন তাঁর সাহসি-

কতার পরিচায়ক, তেমনি কৌতুকপূর্ণ। পত্রটির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন "আমি আপনার কন্যাকে বিয়ে করতে চাই। যদিও আমার আর্থিক সঙ্গতি বলতে কিছুই নাই—তবু আছে আমার সুস্বাস্থ্য, সাহস ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিটুকু। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বলতে পারি যে, আমি নিজেকে রসায়নের গবেষণায় উৎসর্গ করবো ··· আপনার সম্মতি পেলে আমার পিতা আপনার কাছে এই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবেন।"

যাহোক, এই বিয়ে খুব সফল ও সুখের হয়েছিল। মেরী প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, গবেষণা যাঁর প্রাণ, তাঁকে দৈনন্দিনের তুচ্ছতার মধ্যে টেনে আনা অন্যায়। তাই তিনি তাঁর স্বামীকে সংসারের কাজ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে তাঁকে গবেষণায় সম্পূর্ণ নিয়োজিত থাকার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ল্যাবরেটেরির নানা কাজেও তিনি স্বেচ্ছায় সাহায্য করতেন।

যুবক বয়সেই গবেষণার কাজে পাস্তর এতটাই মগ্ন ও তন্ময় হয়ে যেতেন যে, শোনা যায় তাঁর বিয়ের লগ্ন উত্তীর্ণ হওয়ার উপক্রম হলে তাঁর বন্ধু বান্ধবরা অনেক খোঁজাখুঁজি করে শেষ পর্যন্ত তাঁকে ল্যাবরেটরি থেকে উদ্ধার করে গির্জায় নিয়ে হাজির করেছিলেন।

যাহোক, মেরীকে বিয়ে করে গবেষণার কাজে পাস্তরের এতটাই উৎসাহ বেড়ে গেল এবং রসায়নবিদ হিসাবে তিনি এতটাই সুনাম অর্জন করলেন যে মাত্র ৬ বছরের মধ্যেই তিনি লিলের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের ডীনের পদমর্যাদা লাভ করলেন।

এ সময়ে পাস্তর প্রাণের উৎস সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। অবশ্য ল্যাবরেটরিতে তিনি তখন প্রাণের উৎস সন্ধানের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন না। তবে এই ল্যাবরেটরিতেই তাঁর গবেষণার ধারা শেষ পর্যন্ত তাঁকে 'ফার্মেনটেশন' ( fermentation ) বা খমিরন পদ্ধতির কারণ খুঁজতে অনুপ্রাণিত করে, যার ফলে তিনি একদিন প্রাণের উৎস কি, সে-রহস্য উদ্ঘাটন করেন।

খমিরন প্রক্রিয়ার সাথে মানুষ বহুদিন থেকেই বিশেষ পরিচিত ছিল। আদিকাল থেকেই লোকে ফলের রস, বিশেষ করে আঙ্গুরের

রস, মণ্ট, বার্লি, চাল ও অন্যান্য খাদ্যশস্য থেকে বিভিন্ন ধরনের মদ তৈরি করে আসছে। এই মদ আবার খমিরিত হয়ে ভিনেগার বা সির্কা তৈরি হয়। খমিরণ প্রক্রিয়ায় দুধ থেকে তৈরি হয় দই। স্বাভাবিকভাবে এ সকল খমিরণ প্রক্রিয়া আমাদের কাজে লাগে। অবশ্য কোনো কোনো খমিরণ প্রক্রিয়া আমাদের অসুবিধার সৃষ্টি করে, যেমন মাংস বা ডিম পচে গিয়ে নষ্ট হয়। কিন্তু এই খমিরণ প্রক্রিয়ার কারণ পূর্বে জানা ছিল না। পাস্তুরের পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, এই খমিরণ একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। কিন্তু পাস্তুরই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে খমিরণ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সংঘঠিত হয়। এই সকল ক্ষুদ্র জীব বা জীবাণু সাধারণভাবে দেখা যায় না। কেবল মাত্র অণুবীক্ষণ দ্বারা এগুলি দৃষ্টিগোচর হয়। পাস্তুর প্রমাণ করেন যে মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজ পদার্থের পচনও এক ধরনের খমিরণ প্রক্রিয়া এবং এই পচনের মূলে রয়েছে জীবাণু। বিভিন্ন জাতের জীবাণু বিভিন্ন পদার্থকে কিংবা একই পদার্থকে বিভিন্ন দ্রব্যে পরিণত করে। শুধু তাই নয়, অনেক রোগের কারণও এই জীবাণু।

সুরা যে জীবাণুরই সৃষ্টি, পাস্তুর কিভাবে তা প্রমাণ করেন এখন সে কথাই বলি।

পাস্তুর যখন লিলের ফ্যাকালটি অফ সায়েন্সের ডীন এবং প্রাণের উৎস সম্পর্কে গবেষণায় মগ্ন তখন একদিন তিনি ভূমধ্যসাগরের উপকূলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। পাস্তুর এখানে এসেছেন শুনে বিগো নামে এক ভাটিখানার মালিক তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বলেন, "এখনকার ভাটিখানাতে ভাল সুরা আর তৈরি হচ্ছে না। আঙুরের রস কেন যেন টকে যাচ্ছে। আমারও ভাটিখানায় এমনি ব্যাপার ঘটছে। ফ্রান্সের সুরা শিল্প এখন ধ্বংসের পথে। আপনি যদি অনুগ্রহ করে একবার আমার ভাটিখানায় গিয়ে দেখেশুনে এর প্রতিকারের কোনো উপায় বাতলে দেন, তবে আমার যেমন উপকার হবে, তেমনি দেশেরও সুরাশিল্প বেঁচে যাবে।"

ফ্রান্স বহুদিন থেকেই নানা মূল্যবান সুরার জন্য বিখ্যাত ছিল। যুগ যুগ ধরে ফরাসীরা সুরা তৈরি করে এসেছে, খেয়েছে, স্ফুর্তি করেছে, বিদেশে রপ্তানি করে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়েছে।

গ্রাম্য লোকের সরল বিশ্বাস ছিল যে, সোমরসের দেবতার দ্বারা আঙ্গুরের রস সুরায় পরিণত হয়। আঙ্গুর পিষে তারা ভাটিতে রাখে। তারপর গ্রাম্যমেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে, বেণী দুলিয়ে, হাত ধরাধরি করে তার চারপাশে নাচে, গান গায়। দেবতারা খুশী হয় আর তাঁদের অনুগ্রহে ভাটিতে আঙ্গুরের রস খমিরিত হয়ে সুন্দর সুরায় পরিণত হয়। কিন্তু এখন দেবতাদের দয়া আর হয় না কেন? ঠিক আগের মত আঙ্গুর পিষে ভাটিতে দেয়া হচ্ছে, মেয়েদের নাচ-গান তেমনই চলছে, কিন্তু তবু সুরা কেন টকে যাচ্ছে,—দেবতারা কেনই বা তাদের উপর এমন বিরূপ হলেন?

বিগোর এক ছেলে তখন পাস্তুরের ছাত্র। মদের ব্যাপারে পাস্তুরের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও ছাত্রের পিতার এই অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। বিগোর ভাটিখানায় গিয়ে তিনি সবকিছু বেশ ভালভাবে দেখলেন এবং যে ভাটিতে সঠিক সুরা হয়েছে এবং যেটিতে সুরা নষ্ট হয়েছে এমনি দু'রকমের ভাটি থেকে তিনি নমুনা সংগ্রহ করে আনলেন। অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, টকে যাওয়া সুরাতে ভাল সুরার মত গোলাকৃতি কণা ছাড়াও রয়েছে লম্বা লম্বা ধরনের এক-প্রকার কণা। গোলাকৃতি কণাগুলিকে তিনি 'ঈস্ট' (খামি) বলে চিনতে পারলেন। কিন্তু এই লম্বা ধরনের কণাগুলি কি? এরাই কি সুরা নষ্ট করে? ঠিক তাই। পাস্তুর প্রমাণ করলেন যে, এই গোলাকার ঈষ্ট কণাগুলি আঙ্গুরের রসকে সুরায় পরিণত করে; কিন্তু এই একটু লম্বা কণাগুলি যারা ইস্টের চেয়ে আকারে ছোট, তারা ইস্টের মতই এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবাণু। এই ক্ষুদ্র জীবাণুগুলির সাথে বাতাসের জীবাণুর সাদৃশ্য রয়েছে। এই জীবাণুগুলিকে যদি ধ্বংস করা যায় তবে সুরা আর টকে যায় না। তিনি জীবাণুগুলিকে প্রথমে রাসায়নিক জীবাণু-নাশক দ্রব্য দিয়ে নষ্ট করতে চেষ্টা করলেন কিন্তু পরে দেখলেন যে,

তেমন দ্রব্য ব্যবহার না করেও রসকে শুধু মাত্র ৫৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় গরম করলেই এ সকল জীবাণু মরে যায় এবং সুরার স্বাদ ও গন্ধ ঠিক থাকে। ভাটিখানার মালিকদেরকে তিনি সুরাকে বোতল-জাত করার আগে সুরাকে এমনি তাপে গরম করার পরামর্শ দিলেন। পাস্তুরের এই পরামর্শে সত্যই কাজ হলো এবং দেশের সুরা শিল্প ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল।

পানীয় দ্রব্যকে এমনি গরম করে পরে ঈষৎ ঠাণ্ডা করে জীবাণু শূন্য করার পদ্ধতি 'পাস্তুরিজেশন' নামে পরিচিত এবং পৃথিবীর সর্বত্র আজ এই পদ্ধতিতে দুধকে জীবাণুমুক্ত করার প্রথা প্রচলিত।

বিগোর অনুরোধে পাস্তুর গবেষণা করে যেমন ফ্রান্সের সুরা শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন তেমনি তাঁর এক সময়ের শিক্ষক ডুমা-র অনুরোধে গুটিপোকার ওপর পরীক্ষা চালিয়ে ফ্রান্সের রেশম শিল্পকেও বাঁচিয়ে তোলেন।

খমিরণ প্রক্রিয়া যে জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়, পাস্তুর প্রমাণ করলেও বিরুদ্ধবাদীরা তা মানলেন না। এ সময়ে প্রাণের উদ্ভব নিয়ে অর্থাৎ জড়ের বুকে প্রাণের আবির্ভাব, প্রাণহীন জিনিসে অথবা উদ্ভিদে কি করে পচন ধরে—এ নিয়ে তুমুল বাদানুবাদ চলছিল।

পাস্তুর এই দ্বন্দ্বের অবসান ঘটানোর জন্য পরীক্ষা শুরু করলেন। তাঁর ধারণা হলো—উত্তাপে খাদ্যদ্রব্যের জীবাণু ধ্বংস হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে যখন জীবের উদ্ভব ঘটে (স্প্যালানজানি যা দেখেছিলেন) তখন এ সকল জীবের উৎস আর কিছু নয়—বাতাস। পাস্তুর একটি কাঁচের নলের একদিকে কিছু পরিষ্কার সাদা তুলো গুঁজে নলের অন্য দিকে মুখ দিয়ে বাতাস টেনে দেখলেন—সাদা তুলো বেশ কালো হয়েছে। প্রমাণ করলেন, ঘরের মধ্যেও পর্যাপ্ত পরিমাণে ধূলো থাকে। পাস্তুর ভাবলেন—ঘরের ভেতরের বাতাসে যদি এত ধূলো থাকে তবে জীবাণুই-বা থাকবে না কেন? আর সেই জীবাণুর পক্ষে ছিপির ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করে বোতলে রাখা খাদ্যদ্রব্যকে নষ্ট করার বাধা কোথায়?

পাস্তুর তাঁর গুরু বালার্দের পরামর্শে নতুন ধরনের এক ফ্লাস্ক তৈরি করলেন যার মুখের নলটি ছিল রাজ হাঁসের গলার মত অনেকটা আঁকাবাঁকা। বাঁকা নলটি দিয়ে ফ্লাস্কে বাতাস ঢুকবে কিন্তু বাতাসের ধূলিবালি ফ্লাস্কে
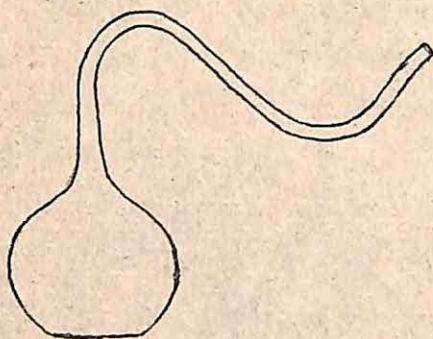
পাস্তুরের ব্যবহৃত বাঁকানো নলওয়ালা ফ্লাস্ক

রাখা জিনিস পর্যন্ত আর পৌছতে পারবে না। বাঁকের মুখে বারবার প্রতিহত হয়ে আটকা পড়বে। ফ্লাস্কে ঈস্টের সুপ নিয়ে তা ভাল করে ফুটিয়ে রাখা হলো। দেখা গেল এই সুপ পচে না, জীবাণু তাতে গজায় না। বারবার পরীক্ষায় একই ফল দাঁড়ালো। এর পর এক ফোঁটা জীবাণুশূন্য সুপ ফ্লাস্কের নলে ঢোকালেন। দেখলেন, সুপের ফোঁটাটি ঘোলা হলো। ফ্লাস্কটি ঝাঁকিয়ে ঘোলা সুপের ফোঁটাটি তিনি এবার ফ্লাস্কের সুপের সাথে মেশালেন। কিছুদিনের মধ্যে সে-সুপে পচন ধরলো, অণুবীক্ষণে দেখা গেল, তার মধ্যে লক্ষ লক্ষ জীবাণু।

ধূলো বালিতে যে জীবাণু থাকে তা এমনিভাবে প্রমাণিত হলো। পাস্তর জীবাণুর অস্তিত্ব শুধু এভাবেই প্রমাণ করে ক্ষান্ত হলেন না—অন্য উপায়ে তা প্রমাণ করার জন্য আল্পস পর্বতে আরোহণ করলেন—সঙ্গে নিলেন ফ্লাস্ক ভর্তি জীবাণু শূন্য ঈস্ট (yeast)-এর সুপ। কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখলেন বেশীর ভাগ সুপই পচন ধরলো না।

পাউসেট (**Pouchet**) ছিলেন তখনকার জামানার একজন বিখ্যাত জীব-বিদ্। প্রাণের স্বতঃজনন (spontaneous germination) তত্ত্বে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। পাস্তুরের কথায় তিনি বিশ্বাস করলেন না। আর এক

পাহাড়ে গিয়ে তিনি অনুরূপ পরীক্ষা চালালেন এবং দেখলেন যে তাঁর সবকটি ফ্লাস্কের সুপই পচে গেল। এই ব্যাপারে পাউসেটের ধারণা আরো দৃঢ় হলো এবং পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্বও তাই সকল মহলে স্বীকৃতি পেল না। পাস্তর কিন্তু তাঁর পরীক্ষা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তিনি পাউসেটকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বসলেন—যে-কোনো কমিশনের কাছে নিজ নিজ পরীক্ষা করে দেখানোর জন্য। পাউসেট শেষ পর্যন্ত এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করলেন না। অবশ্য পরে জানা যায় যে, পাস্তরই ছিলেন নির্ভুল। পাউসেট যে সুপ নিয়েছিলেন সেটি ছিল খড় থেকে তৈরি, আর এই খড়ে যে জীবাণুর বীজরেণু (spore) থাকে তা সহজে নষ্ট হয় না। কাজেই সুপ উত্তপ্ত করলেও এই অক্ষত বীজরেণুগুলিই পরে জীবাণুতে পরিণত হয়ে সুপ পচিয়ে ফেলে। যা হোক, বাতাসের ধূলিবালিতে যে জীবাণু থাকে তা টিণ্ডাল নামক এক বিজ্ঞানীর পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় এবং সেই থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জীবের সৃষ্টি, না জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি, বহুদিনের এই বাদানুবাদের চির অবসান ঘটে।

কাজেই পাস্তুরের গবেষণা একাধারে রসায়ন ও চিকিৎসা বিজ্ঞান এই দুই বিভাগে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। পাস্তুরের গবেষণায় তাই একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে তিনি ডাক্তার না হয়েও চিকিৎসাশাস্ত্রের এমন সব মৌলিক তথ্য আবিষ্কার করেন তা যেমন যুগান্তকারী, তেমনি হয়েছে মানুষের জন্য কল্যাণকর। অবশ্য নিজে ডাক্তার না হয়েও তিনি যে চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে মৌলিক গবেষণা করেছিলেন এজন্য চিকিৎসকেরা তাঁকে নাজেহাল ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতে ছাড়েন নি। কোনো আবিষ্কারের প্রামাণ্য তথ্যাদি হাজির করলেও চিকিৎসকেরা বলতেন, "আপনি কি ডাক্তার? কই আপনার সার্টিফিকেট দেখি?"

পাস্তর জীবজন্তুর যে রোগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম গবেষণা করেন সেটি হলো অ্যানথ্রাক্স (Anthrax)। অ্যানথ্রাক্স একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি। প্রাচীনকাল থেকে এই রোগে বহু গবাদি পশু বিনষ্ট হয়েছে। অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হলে মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দলে দলে গরু, ভেড়া মারা পড়ে। কোনো রাখাল যদি কাটা কিংবা ছড়ে যাওয়া হাতে সেই

পশু ছোঁয় তবে সেও সে রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই রোগে মৃত পশুর চামড়া নিয়ে যারা কারবার করে তারাও আক্রান্ত হয়। এমনি সাংঘাতিক রোগ এই অ্যানথ্রাক্স!

কিন্তু এ রোগের কারণ সম্পর্কে লোকের কোনো ধারণা তখন ছিল না। ফরাসী চিকিৎসক জোসেফ ডাভেইন অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত পশুর রক্তে সর্বপ্রথম ছোট ছোট কাঠির মত জিনিস দেখতে পান। এগুলি যে কি তা কেউ বলতে পারেননি। পাস্তুর ভাবলেন, এই ছোট ছোট কাঠির মত জিনিসগুলিই অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু এবং এরাই রোগের কারণ। প্রমাণের জন্য প্রথমে মৃত পশু কিংবা রোগাক্রান্ত পশুর সামান্য রক্ত নিয়ে তিনি জীবাণু চাষের মাধ্যমে সেই জীবাণুগুলিকে গজালেন এবং এই মাধ্যম থেকে সামান্য পরিমাণ দ্রব্য সুস্থ পশুর দেহে ঢুকিয়ে দেখলেন যে, এ সকল পশু অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যায় এবং এদের রক্তেও সেই ছোট ছোট কাঠির মত জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য এখানে প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে যে, কাঠির মত জিনিসগুলি নয়, রক্তে হয়ত এমন দ্রব্য ছিল যা এই রোগের সৃষ্টি করেছে। ১৮৭৭ সালে পাস্তুর নিরপেক্ষ প্রস্রাবের এক পুষ্টিকর মাধ্যম (Nutrient Medium of Neutral Urine) উদ্ভাবন করে দেখলেন যে, এই মাধ্যমটি এই জীবাণু চাষের খুবই উপযোগী। এক ফোঁটা জীবাণু-দুষ্ট রক্ত নিয়ে তিনি এই মাধ্যমে চাষ করলেন এবং এই গজানো জীবাণু নিয়ে নতুন নতুন মাধ্যমে ক্রমান্বয় তা চাষ করে চাষের মাধ্যমটি থেকে সামান্য পরিমাণ দ্রব্য নিয়ে সুস্থ পশুর দেহে ঢুকিয়ে দেখলেন যে, সে পশুও অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হল এবং মারা গেল। এখন এই শেষোক্ত মাধ্যমে কোনো রক্তের পরিমাণ না থাকাই সম্ভব, থাকলেও তার পরিমাণ এতই সামান্য হবে যে তার মধ্যকার অন্য কোনো দ্রব্য যে এই রোগ সৃষ্টি করবে তা কল্পনা করাও যায় না—তদুপরি মৃত পশুর রক্তে এই কাঠির মত জিনিসটিকেই দেখতে পাওয়া যায়। অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ যে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠির মত জীবাণু তা পাস্তুর এমনিভাবে প্রমাণ করলেন। তা ছাড়া একমাত্র জীবন্ত জীবাণুই যে কোনো এক রোগের কারণ হতে পারে, পাস্তুরের এ সকল পরীক্ষার সূত্রে সর্বপ্রথম তা প্রমাণিত হলো।

পাস্তুরের এই আবিষ্কারের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই বেশীর ভাগ সংক্রামক রোগের জীবাণু আবিষ্কৃত হলো। পাস্তুর নিজেও সূতিকা জ্বরের জীবাণু আবিষ্কার করলেন এবং ডাক্তারদের হাতের সূত্রে এক প্রসূতির দেহ থেকে আর এক প্রসূতির দেহে যে সূতিকা জ্বর সংক্রামিত হয়—সেমেলভিস ও অলিভার হলমসের এই মতবাদ যে নির্ভুল, তা পাস্তুরের দ্বারাই প্রমাণিত হলো।

এ ছাড়া পাস্তুর 'চিকেন কলেরা,' শূকরের চর্মপ্রদাহ রোগ এবং এক প্রকার রক্তদুষ্টির জীবাণু যদিও আবিষ্কার করেন, কিন্তু রোগের জীবাণু আবিষ্কারের দিকে তাঁর ততটা ঝোঁক ছিল না। সংক্রামক ব্যাধির কারণ যে জীবাণু এই মতবাদ যখন প্রতিষ্ঠিত হলো তখন সে সকল রোগকে কি করে প্রতিরোধ করা যায়—নির্মূল করা যায়—সেই দিকে তিনি মনোযোগ দিলেন! ১৮৭৯ সালের দিকে তিনি জীবাণু-শূন্য মুরগীর সুপে চিকেন কলেরার জীবাণু চাষ করে পরীক্ষা করছিলেন। কিছুদিন গ্রীষ্মের ছুটিতে বাইরে কাটিয়ে শরৎকালে আবার সেই কাজ শুরু করলেন। কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়েই তিনি বেশ বিরক্ত হলেন—কেননা, তিনি দেখলেন যে, ছুটির আগে যে জীবাণুগুলির চাষ তিনি করেছিলেন তা ম্রিয়মান হয়ে গেছে, এদেরকে বাচ্চা মুরগীর দেহে প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে আর কলেরা রোগের সৃষ্টি করা যাচ্ছে না। এরূপ জীবাণুর ইঞ্জেকশনে তারা সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে বটে কিন্তু শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠছে। অথচ যে সব মুরগীছানার দেহে তিনি নতুন চাষ করা জীবাণু প্রয়োগ করছেন তারা কলেরায় আক্রান্ত হচ্ছে—মরে যাচ্ছে।

যাহোক, পাস্তুরের কি খেয়াল হলো, একদিন তিনি এমন একটি মুরগীর ছানার দেহে সক্রিয় জীবাণু ঢুকিয়ে দিলেন যার দেহে ম্রিয়মান জীবাণু প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তা সুস্থ রয়েছে। কিন্তু কি আশ্চর্য! মুরগীর ছানাটি সুস্থই রইলো, কলেরা তার হলো না। পাস্তুর পর পর এমনি কয়েকটি ছানার দেহে সক্রিয় জীবাণু প্রয়োগ করলেন। ফল একই দেখা গেল। কোনো মুরগী ছানাই রোগাক্রান্ত হলো না—দিব্যি সুস্থ

রইলো। যে ব্যাপারে তিনি পূর্বে বিরক্ত রোধ করেছিলেন তাই যে তাঁকে এক আবিষ্কারের আনন্দ এনে দেবে তা কে জানতো? আর এভাবেই পাস্তুর চিকেন কলেরার প্রতিষেধক আবিষ্কার করলেন।

এই আবিষ্কারের সূত্রে জেনারের বসন্তের টিকার কথা পাস্তুরের মনে পড়লো। অনেকটা বসন্ত রোগের মত, কিন্তু তেমন মারাত্মক ও উগ্র নয় এমন গো-বসন্তের বীজ দিয়ে মারাত্মক বসন্ত রোগ প্রতিরোধ করার পন্থা জেনার আবিষ্কার করেছিলেন। জেনারের আবিষ্কারের সাথে পাস্তুর তাঁর এই আবিষ্কারের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন। পাস্তুর তাই এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, কোনো প্রাণী কোনো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে যদি তার দৈহিক বৈশিষ্ট্যের জন্য বা জীবাণু সক্রিয়তা হ্রাস পাওয়ার জন্য তা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও বেঁচে যায় তবে সেই প্রাণী, ঐ বিশেষ জীবাণু তথা সেই রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি লাভ করে অর্থাৎ অনাক্রম্যতা (Immunity) অর্জন করে। পাস্তুরের সময় জৈব রসায়ন তেমন উন্নতি লাভ করে নি। কাজেই প্রাণীর এই অনাক্রম্যতা অর্জনের কারণ তখন স্পষ্ট ছিল না। আজ অবশ্য আমরা জানি যে, প্রাণীর রক্তে এজন্য অ্যান্টিবডি (Antibody)-র সৃষ্টি হয়, যার ফলে প্রাণী রোগ প্রতিরোধ করার শক্তি অর্জন করে।

পাস্তুর লক্ষ্য করেন যে, মুরগী ছানার নির্যাসে জীবাণু চাষ করলে খুব শীঘ্রই তাদের বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু যে মাধ্যমে আগে একবার জীবাণু চাষ করা হয়েছে তাতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না। পাস্তুর তাই অনুমান করেন যে, জীবাণুরা এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করে যা জীবাণুদের সংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। তিনি আরও অনুমান করেন যে, জীবন্ত জীবাণুর বদলে এই রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত জীবাণু চাষের মাধ্যমটি ব্যবহার করে কার্যকরী 'ভ্যাকসিন' তৈরি করা যেতে পারে। জেনার তাঁর পদ্ধতির নাম দেন ভ্যাকসিনেশন এবং ভ্যাকসিনেশন দেওয়ার দ্রব্যের নাম দেন 'ভ্যাকসিন' (Vaccine)। কিন্তু পাস্তুর যে কোনো ম্রিয়মাণ জীবাণুযুক্ত দ্রব্যকে ভ্যাক্সিন নামে অভিহিত করেন। আজকালের 'অ্যান্টিটক্সিন' (antitoxin) চিকিৎসায়—বিশেষ করে ডিপ-

থেরিয়ার ক্ষেত্রে যা সুফল দিয়েছে তাতে পাস্তুরের অনুমান সত্য বলে মনে হয়। মৃত অথবা জীবন্ত জীবাণু পশুর মধ্যে, বিশেষ করে ঘোড়ায়, ইনজেকশন করলে তার রক্তের মধ্যে অ্যান্টিবডির সৃষ্টি হয়। এই রক্তের 'সিরাম' (serum) তখন মানুষের ভ্যাক্‌সিন হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

পাস্তুর যখন প্রাণীদেহে এই অনাক্রম্যতা সৃষ্টির ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন, তখন তিনি বিশেষ বিশেষ রোগের ভ্যাক্‌সিন তৈরির কাজে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু দেখা গেল সব জীবাণুকেই একই উপায়ে ম্রিয়-মান করা যায় না। চিকেন কলেরার জীবাণুর চাষ তিনদিন বাতাসে খোলা রাখলেই তার মধ্যকার জীবাণু ম্রিয়মান হয়ে পড়ে এবং তা নিরাপদ ভ্যাক্‌সিন হিসাবে ব্যবহার করা চলে। পাস্তুর এভাবে ভ্যাক্‌সিন তৈরি করে চিকেন কলেরা রোগ প্রতিরোধ করলেন। কিন্তু এভাবে অ্যান-থ্রাক্স রোগের ভ্যাক্‌সিন তৈরি করা গেল না। পাস্তুর দেখলেন যে, ছোট ছোট কাঠির মত জীবাণুগুলি তাদের দেহে গোলাকার গুটির সৃষ্টি করে, আর এমনিভাবে তারা প্রতিকূল অবস্থায় বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়। তাই এদেরকে সহজে নিস্তেজ করা যায় না বা তারা মরে না। কেন যে কোনো একটি জায়গায়, বিশেষ এক জমিতে এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়, বিশেষ করে যে সকল জমিতে ঐ রোগের মৃত পশুদের কবর দেয়া হয়—তা পাস্তুর এখন বেশ বুঝতে পারলেন। পাস্তুর মাটি খুঁড়ে কেঁচোর পেটে অ্যানথ্রাক্স রোগের গুটি দেখতে পেলেন। যেহেতু ঐ গুটি সহজে মরে না, তাই ঐ মাটিতে যে ঘাস জন্মে তাতেও ঐ গুটি আটকে থাকে এবং ঐ ঘাস খেয়ে পশুদের রোগ হয়। কাজেই এই রোগ থেকে গবাদি পশুকে বাঁচাতে হলে, মৃত পশুকে কবর দিলে কোনো কাজ হয় না, তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়।

পাস্তুর তানেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শেষ পর্যন্ত দেখলেন যে, অ্যান-থ্রাক্স জীবাণুকে যদি মূত্রের মধ্যে ( যে তাপে তাদের বংশ বৃদ্ধি হয় তার সামান্য নিম্নতাপে ) চাষ করা যায় তবে তাদের আর গুটি হয় না এবং এই জীবাণুর চাষ দু'এক সপ্তাহ খোলা অবস্থায় রেখে দিলে সে জীবাণু নিস্তেজ হয় অর্থাৎ অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাক্‌সিন তৈরি হয়।

পাস্তুর এভাবে অ্যানথ্রাক্সের ভ্যাক্সিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে তৈরি করে দশবারটি ভেড়ার উপর পরীক্ষা করে যখন সুফল পেলেন তখন তিনি ঘোষণা করলেন যে, যদি পঞ্চাশটা ভেড়াকে জীবন্ত অ্যানাথ্রাক্স জীবাণু দিয়ে ইনজেকশন দেয়া যায় তবে পঞ্চাশটা ভেড়াই এ রোগে মারা যাবে, কিন্তু ঐ ভেড়ার মধ্যে পঁচিশটাকে তার ভ্যাক্সিন দিয়ে যদি ইনজেকশন দেয়া যায় তবে ঐ পঁচিশটা ভেড়াই ঐ রোগ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে।

পাস্তুরের আগেকার এত ব্যাপারে সাফল্য দেখেও বিরুদ্ধবাদীরা কিন্তু নিশ্চুপ থাকলেন না। তারা বলাবলি করতে লাগলেন, "এবার দেখা যাবে, বৃদ্ধ বয়সেও বুড়োর ভিমরতি গেল না।" পাস্তুরের পতন এবার সুনিশ্চিত এই ভেবে তাঁরা উল্লসিত হলেন। পাস্তুরের ভক্তরাও এই ভেবে খুশী হলেন যে, পাস্তুর এবার একটা বিরাট প্রমাণ খাড়া করতে পারবেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে এত বড় ঝুঁকি নেয়াতে তাঁরা শঙ্কিতও হলেন।

যাহোক, এই ঘোষণার পর মিলুনের এক পশু চিকিৎসকের চেষ্টায় কাছাকাছি এক খামারে পরীক্ষার বন্দোবস্ত হলো। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, এই পশু চিকিৎসক ছিলেন পাস্তুরের সমালোচকদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ৫ই মে তারিখে ২৮টি ভেড়া, ৬টি গরু ও একটি ছাগলকে পাস্তুর অ্যানথ্রাক্সের কড়া ভ্যাক্সিন এবং ১৭ই মে তারিখে এদেরকে আবার কিছু কম উগ্র ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করলেন। ৩১শে মে তারিখে এদের সবাইকে এবং তুলনামূলক পরীক্ষার জন্য ২৫টি নতুন ভেড়াকে জীবন্ত অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেকশন দেয়া হলো।

পাস্তুর ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই নতুন ২৫ টি ভেড়া অ্যানথ্রাক্সে মারা যাবে আর বাকিগুলি জীবিত থাকবে।

এরপর ফলাফল জানবার জন্য কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে। প্রতীক্ষার দিনকটিতে সারা ফ্রান্সে গভীর উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করতে লাগলো। নানা ধরনের গুজব ছড়ালো, কেউ বললো একটা ভেড়া মরেছে —পাস্তুর এবার ডুবলো। আর তাই শুনে পাস্তুরের ভক্ত শিষ্যেরা ছুটাছুটি শুরু করেন। অন্যদিকে পাস্তুর উৎকণ্ঠায় সারারাত জেগে থাকেন।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত এই প্রতীক্ষার অবসান হলো, দলে দলে লোক খামারের দিকে ছুটলো। সবাই দেখলো, পাস্তুরের কথাই ঠিক। যে ২৫টি ভেড়ায় জীবন্ত অ্যানথ্রাক্স জীবাণু ইনজেকশন দেয়া হয়েছিল তারা সব মৃত আর যেগুলিকে ভ্যাক্‌সিন দেয়া হয়েছিল তারা সবাই রয়েছে জীবিত এবং সুস্থ।

লাঠিতে ভর দিয়ে পক্ষাঘাতে পঙ্গু পা টেনে টেনে পাস্তুর যখন ঐ খামারে আসলেন তখন জনতা বিপুল জয়ধ্বনি দিয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানালো। কিন্তু জনতার জয়ধ্বনি যেন পাস্তুরের কানে প্রবেশ করলো না, তিনি নির্বিকার; শুধু নিবিষ্ট নেত্রে তিনি চেয়ে রইলেন জীবন্ত, সুস্থ ভেড়াগুলির দিকে। হয়ত তিনি ভাবছিলেন অন্য কথা, রোগাক্রান্ত মানুষের কথা। এই ব্যাধির কবল থেকে তারা যেন মুক্তি পেয়েছে—ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের অভিযান যেন সফল হয়েছে। তারপর যেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো অমনি "তবে রে অবিশ্বাসীর দল"—বলে লাঠি হাতে জনতার দিকে তেড়ে আসলেন; কিন্তু এতে লোক আরও খুশী হলো —উল্লাসে ফেটে পড়ে তারা আরও জোরে জয়ধ্বনি দিল। জনসাধারণের অকুণ্ঠ প্রশংসা তিনি লাভ করলেন।

এরপর দু'বছরের মধ্যে ৮০ হাজার গবাদি পশুকে অ্যানথ্রাক্স ভ্যাক্‌সিন দেয়া হলো এবং এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা একটিতে নেমে আসলো।

কিন্তু যে ভ্যাক্‌সিন আবিষ্কার করে পাস্তুর সারাবিশ্বে সবচেয়ে বেশী খ্যাতি ও সম্মান লাভ করেন এবং যে ভ্যাক্‌সিনটি আজও ব্যবহৃত হয়, তা হলো জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাক্‌সিন। পাগলা শেয়াল, বা কুকুর কামড়ালে যে রোগ হয় তার নাম জলাতঙ্ক। এ রোগে রোগী পানি দেখে ভয় পায়, তাই এর নাম জলাতঙ্ক। তৃষ্ণায় রোগীর ছাতি ফেটে যায়, কিন্তু তবুও এক ফোঁটা পানি সে গিলতে পারে না। দেহের মাংসপেশী, বিশেষ করে গলনালী সংকুচিত হওয়ার ফলে পানি পান করতে গেলে বা চোখে আলো পড়লে, তার সমস্ত শরীর কুঁকড়ে গিয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হয়। তাই সে পানি দেখে ভয় পায়। পাগলা শেয়াল, কুকুরের মত সে ক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করে মারা যায়।

জলাতঙ্ক একটি দুরারোগ্য ও অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। কিন্তু পাস্তুরের ভ্যাক্‌সিন এই দুরারোগ্য ও মারাত্মক ব্যাধিকেও প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছে।

পাস্তুর পাগলা কুকুরের লালা সংগ্রহ করে তার মধ্যে জীবাণু খুঁজে পান। কিন্তু এই লালা সংগ্রহ করা ছিল সত্যই এক কঠিন কাজ। পাস্তুর এই বিষাক্ত লালা কুকুরের মাথায় ইন্‌জেকশন দিতেন। দু'সপ্তাহের মধ্যে কুকুর পাগলা হয়ে তারপর একদিন মারা যেত। এই মৃত কুকুরের মগজের যে অংশে জীবাণু বেশী ক্ষতি করেছে সেই অংশ বের করে পানিতে গুলে তাই দিয়ে কুকুরের মধ্যে অনাক্রম্যতা সৃষ্টির জন্য তিনি ইন্‌জেকশন দিতেন। এমনি করে ইন্‌জেকশন দিয়ে দিয়ে তিনি সত্য সত্যই একদিন কুকুরকে ঐ রোগ প্রতিরোধ করাতে সক্ষম হলেন।

কুকুরকেতো বাঁচানো গেল, কিন্তু মানুষকে কি এমনিভাবে বাঁচানো যাবে? পরীক্ষার জন্য এমন মানুষ তিনি খুঁজতে লাগলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত কোনো অপরাধীর উপর অবশ্য এই পরীক্ষা করা যেতে পারে, তাই তিনি বিভিন্ন দেশের সরকারকে অনুরোধ জানালেন এমনি লোকের জন্য। কিন্তু কেউ এতে রাজি হলো না।

শেষে সত্যই এক অযাচিত সুযোগ এলো। একদিন তাঁর দেশের এক মহিলা তাঁর নয় বছরের এক ছেলেকে নিয়ে তাঁর কাছে এলেন। জোসেফ মাইস্টার নামক এই ছেলেটিকে স্কুলে যাবার সময় এক পাগলা কুকুর তার দেহের চোদ্দ জায়গায় সাংঘাতিকভাবে কামড় দেয়। ভাগ্য ভাল যে, এক রাজমিস্ত্রি কোন রকমে বালকটিকে উদ্ধার করে, নতুবা সে হয়ত মরেই যেত।

মহিলার অনুরোধে এবং সঙ্গীদের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত পাস্তুর পাগলা কুকুরের মগজের অংশ নিয়ে ছেলেটিকে ইন্‌জেকশন দিয়ে চললেন। ইনজেকশনের তেজ ক্রমশ যতই বাড়ানো হলো, পাস্তুর ততই শঙ্কিত হয়ে ওঠেন এবং শেষে যখন এমন শক্তিশালী ইন্‌জেকশন দেয়া হলো যা সাতদিনের মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত করে, তখন পাস্তুর এতটা অস্থির হয়ে পড়েন যে সে-রাতে তিনি আর ঘুমোতে পারলেন না। জলাতঙ্ক রোগে আক্রান্ত হয়ে ছেলেটি পানি গিলতে পারছে

না, অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, এই ছবিই যেন বার বার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো। চিন্তাভাবনায় তিনি নিজেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই অসুস্থ শরীরে ছেলেটির মৃত্যু সংবাদ সহ্য করতে পারবেন না বলে ভোরের দিকে তাঁর মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তিনি গ্রামে পালিয়ে গেলেন। মাইস্টারের ভার দিলেন তাঁর এক শিষ্যের হাতে। কিন্তু সেখানেও তিনি শান্তি পেলেন না। চলে গেলেন অন্য এক জায়গায় তবু মনে শান্তি নেই, কখন হয়ত খবর আসে—মাইস্টার মারা গেছে! কিন্তু সকল উৎকণ্ঠার সমাপ্তি ঘটিয়ে মাইস্টার দিব্যি সুস্থ হয়ে উঠলো একমাস পরেও তার রোগের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ঐতিহাসিক এই পরীক্ষাটি শুরু করা হয় ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই জুলাই তারিখে—আর এটিই হলো মানুষের উপর জলাতঙ্ক ভ্যাক্‌সিনের সর্বপ্রথম সাফল্য। এর কয়েক মাস পরে জ্যাঁ ব্যাপটিসতে জুপিলে নামক চোদ্দ বছরের এক বালক বিরাট এক পাগলা কুকুরের হাত থেকে সঙ্গী-সাথীদের বাঁচাতে গিয়ে সেই কুকুরের ভীষণ কামড় খেল। কামড়ের ছয়দিন পর তাকে পাস্তুরের কাছে আনা হলো। পাস্তুর ভাবলেন, জোসেফ মাইস্টার কামড় খাওয়ার তিন দিন পর তাঁর কাছে এসেছিল কিন্তু এ ছেলেটি এসেছে ছ'দিন পর। এ ক্ষেত্রে তাঁর ভ্যাক্‌সিন কি কার্যকরী হবে? পাস্তুর দ্বিধাভরে তাই ইন্‌জেকশন দিলেন। তবু সুফল পাওয়া গেল—জুপিলে সুস্থ হয়ে উঠলো।

পাস্তুরের পূর্ববর্তী সাফল্য এবং এই দুটি ক্ষেত্রে তাঁর অধুনা আবিষ্কৃত ভ্যাক্‌সিনের সুস্পষ্ট কার্যকারিতা দেখেও ঈর্ষাকাতর তাঁর শত্রুরা কিন্তু শান্ত হল না। অ্যাকাডেমী অফ মেডিসিন পাস্তুরের এ কাজের তীব্র নিন্দা করলো। এ সংস্থা থেকে বলা হলো, পাস্তুর যে পাগলা কুকুরের বিষ এমনি এলোপাথারিভাবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করছেন, তা কি ঠিক হচ্ছে? কুকুরের দেহের বিষ মানুষের শরীরে শেষ পর্যন্ত কী অঘটন ঘটাবে, তা কে বলতে পারে? কাগজে কাগজে পাস্তুরের এ কাজ সম্পর্কে নানা আলোচনা, গাল-মন্দ, প্রতিবাদ বেরোতে লাগলো। কিন্তু প্রতিবাদ গালমন্দে ফল হল না কিছুই। ভুক্তভোগী যারা, তারা এই বিজ্ঞজনদের কথায় কর্ণপাত করবে কোন্‌ ভরসায়? তাঁরা তো পাণ্ডিত্যপূর্ণ

বুলিই শুধু আওড়াচ্ছেন, পাস্তুরের চেয়ে ভাল কিছু তো তাঁরা আর আবিষ্কার করতে পারছেন না? কাজেই দেশ বিদেশ থেকে, পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে রোগীরা পাস্তুরের কাছে আসতে লাগলো। রাশিয়া থেকে উনিশজন কৃষক এক পাগলা নেকড়ে বাঘের কামড় খেয়ে মৃত প্রায় অবস্থায় এসে তিনজন বাদে সবাই সুস্থ হয়ে, হাসিমুখে দেশে ফিরে গেলো। সুদূর আমেরিকা থেকে চারজন ছেলে এসে পাস্তুরের ইন্‌জেকশন নিয়ে ভাল হয়ে বাড়ি ফিরলো। দুরারোগ্য জলাতঙ্ক যে মাত্র কয়েকটি ইন্‌জেক্‌শনে ভাল হয়, তা দেখে তারা আশ্চর্য হয়ে বললো, "এরই জন্য এত দূরে আসা?" এত সহজে যে এ রোগ সারতে পারে তা তারা মোটেই ভাবতে পারে নি।

১৮৮৬ সালের মধ্যে দু'হাজারেরও বেশী লোককে এই ইন্‌জেকশন দেয়া হলো এবং এই রোগে মৃত্যুর হার শতকরা মাত্র ০·৫ ভাগে নেমে এলো। ফলে, দেশ বিদেশের চাঁদা দিয়ে ১৮৮৮ সালে পাস্তুর ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলো। রাশিয়ার জার হীরক খচিত এক স্মারক পাস্তুরকে উপহার এবং পাস্তুর ইনস্টিটিউটে মোটা চাঁদা দিলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে এক কমিটি জোসেফ লিস্টারকে সাথে নিয়ে পাস্তুরের কাজ দেখতে এলেন এবং অত্যন্ত খুশী হয়ে দেশে ফিরে গেলেন। লিস্টার পাস্তুরের জীবাণুতত্ত্বের-সূত্রে পচন-রোধী অস্ত্রোপচারের প্রবর্তন করে চিকিৎসা জগতে এক যুগান্তর আনেন। কিন্তু লিস্টারের এই সাফল্যের মূলে ছিল জীবাণু-তত্ত্ব বিষয়ে পাস্তুরের প্রবন্ধ এবং এই প্রবন্ধ পাঠ করেই লিস্টার পচনরোধী অস্ত্রোপচারের সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ঋণ স্বীকার করে পাস্তুরকে তিনি একবার চিঠি লিখেছিলেন। যখন পাস্তুরের বিরোধীরা তাঁর জীবাণুতত্ত্ব নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপে তাঁকে নাজেহাল করে তুলেছিলেন, তখন লিস্টার লিখেছিলেন, "আপনার চমৎকার গবেষণার জন্যই আমি বুঝেছি জীবাণুই ক্ষতে পচন ধরায়। তাই অস্ত্রোপচারে জীবাণু শূন্য করার পদ্ধতি আমি প্রয়োগ করেছি এবং এখানে তা এত বেশী সফল হয়েছে যে আপনি যদি কখনো এডিনবরায় আসেন, তবে দেখতে পাবেন কত শত দুঃস্থ মানুষ আপনার এ কাজের জন্য উপকৃত হয়েছে।"

লিস্টারের এ চিঠি পেয়ে পাস্তর যেন ছোটছেলের মতই আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিলেন। সামনে যাকে পেয়েছিলেন তাকেই এ চিঠি দেখিয়েছিলেন। কাগজে এবং 'বিয়ারে বীজাণু' নামক প্রবন্ধের মুখবন্ধ হিসাবে এই চিঠি তিনি ছাপিয়ে ছিলেন। যাহোক, বিদেশ থেকে যখন নানা জনে এসে পাস্তরের জলাতঙ্ক রোগের ভ্যাক্সিন নিয়ে যেতে লাগলো তখন নিজ দেশে তাঁকে সম্মান দেখানোর জন্য দেশবাসী উঠে পড়ে লাগলো। ১৮৯২ সালে ২৭শে ডিসেম্বর, মহাসমারোহে তাঁর সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালন করা হলো। তাঁর অগণিত ভক্ত ছাত্র, নানা দেশের সুধীবৃন্দ, দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও ভক্তবৃন্দেরা এই জন্মোৎসবে যোগদান করে তাঁর গুণ কীর্তন করলেন। ইংল্যাণ্ড থেকে লর্ড লিস্টার সস্ত্রীক এসে অভিনন্দন জানিয়ে প্রকাশ্য জনসভায় পাস্তরকে জড়িয়ে ধরলেন। যে পাস্তর শত্রুদের নির্মম সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেও কোনোদিন কখনও বিচলিত হন নি, তিনি তাঁর এই সম্মানে সর্বপ্রথম বিচলিত হলেন, অভিভূত হলেন।

বস্তুত জীবনে তিনি অনেক সম্মান পেয়েছেন, কিন্তু কোনোদিনও সেনিয়ে তার মনে কোনো গর্ব বা অহঙ্কার জন্মেনি। তাঁর মত নির্লোভীও খুব কম দেখা যায়। ইচ্ছা করলে তাঁর যে কোনো একটি আবিষ্কারকে পেটেণ্ট করে কোটি কোটি টাকা উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। তাঁর হৃদয় ছিল শিশুর মতই সরল এবং চিরদিন তিনি সরল ও সাধারণভাবে জীবন যাপন করে গেছেন। হয়ত তাঁর ছোটবেলার স্মৃতি, যখন তিনি তার জন্মস্থানের পরিচিত দৃশ্যগুলির ছবি আঁকতেন এবং জীবনে বড় শিল্পী হওয়ার বাসনা পোষণ করতেন, তা তাঁর পরবর্তী জীবনে একেবারে মুছে যায় নি। যদিও তিনি ষোল বছর বয়সেই রঙের তুলিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন এবং চিত্রশিল্পী নয়, বিজ্ঞানী হিসাবে অমর হয়েছেন, তবু একদিক থেকে তাঁকে বড় শিল্পীই বলা চলে। মহান শিল্পীর মত তিনি তাঁর সমস্ত মন ও শক্তিকে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এমনি শক্তি ক্ষয়ের জন্য তিনি শীঘ্রই পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন।

পাস্তুরের অপূর্ব সাফল্যের মূলে ছিল তার গভীর মনোনিবেশ ও কঠিন অধ্যবসায়। ঘন্টার পর ঘন্টা চিন্তায় মগ্ন থেকে কিংবা অণুবীক্ষণ চোখে রেখে অথবা রুগ্ন জীবজন্তুকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি কাটিয়ে দিতে পারতেন। এ সময়ে তিনি এতটা জ্ঞান-শূন্য হতেন যে লোকের উপস্থিতি তিনি অনুভব করতে পারতেন না। তার নিজের এবং তার সহকারী-দের পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে যদি তিনি বলতেন যে, "এটি নোট বইয়ে টোকা আছে"—তবে কোনো যুক্তিতর্কের আর অবকাশ থাকতো না। পরীক্ষার ব্যাপারে খুঁটিনাটি বিষয়ের প্রতি তার সূক্ষ্ম ও সাবধানী দৃষ্টি এতটা সজাগ থাকতো যে সেই ফলাফল সম্পর্কে কোনো সন্দেহ তাঁর মনে কখনও জাগতো না।

শারীরিক অবসাদের জন্য যখন তিনি আর কাজ করতে পারছিলেন না, অবসর জীবন যাপন করছিলেন, তখন সক্রিয়ভাবে কাজ করতে পারতেন না বলে গভীর দুঃখ প্রকাশ করতেন। এ সময়ে একদিন তিনি তার পূর্ব প্রকাশিত এক প্রবন্ধ পাঠ করে তার এক সহকারীকে বলেছিলেন, "কি সুন্দর, এই ভাবনাটাও কত মধুর যে, এ কাজগুলি আমি করেছিলাম—আর তা ভুলেও গিয়েছিলাম।" এমনিভাবে একদিন যে সমস্ত দুঃস্থ মানবের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম ও আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন, সে কথাও তিনি ভুলে গেলেন। তিনি ভুলে গেলেও ফ্রান্সের লোকেরা কিন্তু তাঁকে ভোলেনি। শ্রেষ্ঠ মানব বলে তাঁকে তাঁরা ঘোষণা করেছিলেন। ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে একবার ভোট গ্রহণ করা হয়েছিল। এতে দেখা গিয়েছিল পাস্তুর পেয়েছিলেন সর্বাধিক ভোট। যে নেপোলিয়ন ছিলেন ফরাসীদের কাছে দেবতার মত, শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে সেই নেপোলিয়নের স্থান ছিল দ্বিতীয়। জগতের কোনো বিজ্ঞানীকে এত বড় সম্মান কোনো-দিন দেখানো হয়নি। আর এমনি সেরা সম্মান নিয়ে ১৮৯৫ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

# রবার্ট ককের আবিষ্কার

জীবাণু যে অনেক রোগের কারণ, এই আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন রক্ষা করেছে এবং আজও করে চলেছে। যাঁদের অক্লান্ত সাধনায় এই আবিষ্কার সম্ভবপর হয়েছে—জীবাণুতত্ত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—বহু দুরারোগ্য ব্যাধিকে পরাভূত করতে সাহায্য করেছে, তাঁরা হলেন ফ্রান্সের লুই পাস্তুর ও জার্মানীর রবার্ট কক (Robert Koch)। পাস্তুর এবং কক দুজনেই জীবাণুকে চাষ করা বা গজানোর পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ককই সর্বপ্রথম রঙের সাহায্যে রঙিন করে তাদের সনাক্ত করার উপায় উদ্ভাবন করেন। পাস্তুরের পর ককই ছিলেন শ্রেষ্ঠ জীবাণু-সন্ধানী বিজ্ঞানী।

পূর্ব জার্মানীর হ্যানোভারের অন্তর্গত ক্লাউসথালে ১৮৪৩ সালে এক দরিদ্র পরিবারে ককের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে আর্থিক কারণে শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হন এবং জুতা সেলাই ও জুতা তৈরির কাজ করেন। কিন্তু পরে ভাগ্যক্রমে পরিবারের কিছুটা আর্থিক সচ্ছলতা এনে তিনি গোয়েটিংগন শহরের বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান এবং সেখান থেকে ১৮৬৬ সালে ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করেন। পড়াশুনায় যদিও তিনি ভাল ছিলেন, কিন্তু তার ইচ্ছা ছিল তিনি দেশ আবিষ্কারক হবেন, কিংবা সামরিক চিকিৎসক, নিদেন পক্ষে জাহাজের ডাক্তার হয়ে পৃথিবী পর্যটন করবেন। বিদঘুটে সব রোগের ও মানুষের হাড়ের নাম কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে তিনি বন জঙ্গলে বাঘ শিকারের স্বপ্ন দেখতেন, জাহাজের বাঁশীর সুরে যেন অজানা দেশের আহ্বান শুনতে পেয়ে উন্মনা হয়ে যেতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, বাস্তবে বাঘ মারার স্বপ্ন তাঁর সফল হলো না, তার পরিবর্তে মারলেন কিছু ইঁদুর এবং

খরগোশ। অজানা কোন দেশ আবিষ্কার করতে পারলেন না, পরিবর্তে তিনি আবিষ্কার করলেন আর এক অভিনব জগৎ—জীবাণু জগৎ। অজানা দেশ আবিষ্কারের চেয়ে সে জগৎকে জানা আরও রোমাঞ্চকর—আরও বিচিত্র এবং বিস্ময়কর!

ডাক্তারী পাশ করে আর্থিক অনটনের জন্যে তিনি এক পাগলা গারদে প্রথমে চাকুরি নিলেন, বিয়ে করলেন এমি ফ্রায়াজ নামক এক পুরোপুরি বাস্তববাদী মেয়েকে এবং তাঁরই প্ররোচনায় পাগলা গারদের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শেষে প্রোজেন প্রদেশের ভোলস্টাইন শহরে ডাক্তারী শুরু করলেন। দেশ বিদেশ পর্যটন করার বাতিক তাঁর ঘুচে গেলো। এমিকে নিয়ে এই শহরে ঘর বাঁধলেন, আর ঘোড়ায় চড়ে বাড়ী বাড়ী রোগী দেখে বেড়াতে লাগলেন। কক যত বেশী রোগী দেখেন, যত বেশী পয়সা রোজগার করেন, এমি তত বেশী খুশী হন।

কিন্তু ককের মনে শান্তি ছিল না। এ ডাক্তারী তাঁর ভাল লাগতো না। অনেক রোগের কারণ ও তার চিকিৎসা তখন জানা ছিল না—তবু সে সকল রোগের চিকিৎসা তাঁকে করতে হতো, ঔষধ দিতে হতো, পয়সাও নিতে হতো। তাই ককের কাছে সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অন্যায়, এক বিরাট ফাঁকি বলে মনে হতো।

যাহোক, এরপর যে ঘটনা ঘটলো তাতে ককের জীবনের মোড় ফিরে গেলো। তাঁর ২৮তম জন্মদিনে—এমি তাঁকে একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র উপহার দিলেন। এমি ভেবেছিলেন কক এটি পেয়ে খুশী হবেন, বালকের মত এই খেলনা নিয়ে মেতে থাকবেন, সারাক্ষণ আর গজর গজর করবেন না—ডাক্তারীতেও মন বসবে। কিন্তু ফল হলো উল্টো। ককের গজর গজর কমলো বটে, কিন্তু ডাক্তারী থেকে মন তাঁর আরও উঠে গেলো। বেশী রোগী তিনি দেখতেন না, সারাক্ষণ এই যন্ত্রটি নিয়ে মেতে থাকতেন। এমন কি ক্রমে ক্রমে এমিও যেন তাঁর জীবন থেকে দূরে সরে পড়তে লাগলো।

এ সময়ে ইউরোপের গ্রামে গ্রামে গরু ভেড়ার মড়ক দেখা দিয়েছে। পালে পালে গবাদি পশু মারাত্মক অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা পড়ছে—কৃষকদের ঘরে ঘরে ঘনিয়ে আসছে বিষাদের ছায়া।

একটি পশুর এই রোগ দেখা দিলে শীঘ্রই তা সমস্ত পালে ছড়িয়ে পড়তো, দলে দলে সেগুলি মারা পড়তো। শুধু তাই নয়, যারা এ সকল পশু বা পশুর চামড়ার সংস্পর্শে আসতো তাদেও নিস্তার ছিল না। সারা শরীরে তাদের দেখা দিত স্ফোটকের মত উদ্ভেদ কিংবা মারাত্মক নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিতে নিতে এক সময়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতো।

অনুবীক্ষণের আবিষ্কারক লিউয়েন হুক তাঁর তৈরী নতুন যন্ত্রটি দিয়ে সামনে যা পেতেন তাই যেমন একবার করে দেখতেন, ককও তেমনি সকল কিছুকে এমির দেয়া অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখতেন। তাই চারিদিকে যখন গরু ভেড়ার মড়ক শুরু হলো, তখন কক একদিন এক কৃষকের কাছ থেকে সদ্য মৃত এক ভেড়ীর রক্ত সংগ্রহ করে অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করলেন। দেখা গেলো, সেই রক্তে রয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট কাঠির মত কি সব জিনিস। তাই দেখে কক ভাবতে লাগলেন—এগুলি কি তবে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু—এদের জন্যই কি এই মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়?

রবার্ট কক

কক জানতেন ফ্রান্সের দাইভেন এবং বেয়ারও এই কাঠির মত জিনিস অ্যানথ্রাক্সে মৃত পশুর রক্তে লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন এরা

জীবন্ত, এরাই অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু—কিন্তু সে কথা প্রমাণ করতে তাঁরা পারেননি। একমাত্র পাস্তুর ছাড়া একথা কেউ বিশ্বাস করেননি। ককের তাই ভাবনা দাঁড়ালো, কি করে প্রমাণ করা যায় যে এরা জীবন্ত, এরাই অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু?

সুস্থ পশুর রক্ত নিয়ে কক পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। কসাইখানায়, মাংসের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি নীরোগ পশুর রক্ত সংগ্রহ করে তাঁর অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। এ সকল নীরোগ পশুর রক্তে তিনি কিন্তু ঐ ছোট ছোট কাঠির মত জিনিস দেখতে পেলেন না। অন্যদিকে যখনই অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত বা সেই রোগে মৃত পশুর রক্ত নিয়ে পরীক্ষা করেছেন, তখনই তিনি এই কাঠির মত জিনিস দেখতে পেয়েছেন। এতে অবশ্য এটুকু প্রমাণিত হলো যে, অ্যানথ্রাক্স রোগাক্রান্ত পশুর রক্তে এই ছোট ছোট কাঠির মত জিনিস থাকে। কিন্তু তাতে তো আর প্রমাণিত হয় না যে তারা জীবন্ত, প্রাণীর মত তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে। কি করে তা প্রমাণ করা যায়? এই ভাবনাতেই তাই ককের দিন কাটে। রোগীদের ব্যবস্থাপত্র লিখতে ভুলে যান, দাঁতের বেদনায় অস্থির রোগীকেও অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হয়, অনেককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়।

ভেবে ভেবে তিনি স্থির করলেন যে, এই দূষিত রক্ত—যার মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠির মত জিনিস রয়েছে তা যদি কোনো সুস্থ, সবল পশুর দেহে সংক্রামিত করা যায় এবং সেই পশুটি যদি অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়—আর তার রক্তেও যদি ঐ ক্ষুদ্র কাঠির মত জিনিস দেখতে পাওয়া যায়—তবেই প্রমাণিত হবে যে, ঐ জিনিসগুলি জীবন্ত এবং তারাই পশুর দেহে সংখ্যায় বৃদ্ধি পেয়ে রোগের সৃষ্টি করেছে।

কিন্তু পরীক্ষার জন্য কতকগুলি পশুর দরকার। গরু, ভেড়া কেনার মত তাঁর সঙ্গতি ছিল না, কাজেই সাদা ইঁদুর, যা দামে সস্তা, তার উপরই তিনি পরীক্ষা চালালেন। ডাক্তারখানার মধ্যেই বেড়া দিয়ে একদিকে একটি ছোট কুঠরি তিনি তৈরি করলেন—আর এটিই হলো তাঁর গবেষণাগার। যন্ত্রপাতির মধ্যে সেখানে থাকলো এমির দেয়া সেই অণুবীক্ষণটি, কিছু কাঁচের স্লাইড, একটি চুলো আর পরীক্ষণীয় প্রাণীর মধ্যে রইলো খাঁচা বদ্ধ কয়েকটি সাদা ইঁদুর।

পয়সার অভাবে একটি সিরিঞ্জ পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যে জুটলো না। কাঠ দিয়ে তিনি তৈরী করলেন ছুঁচালো কাঠি—সেই কাঠিকে চুলোর ওপর রেখে নির্বীজিত (sterilize) করে তাই দিয়ে তিনি অ্যানথ্রাক্সে মৃত পশুর একটু রক্ত তুলে নিয়ে একটি ইঁদুরের সামান্য লেজ কেটে সেখানে তা লাগিয়ে দিয়ে আলাদা খাঁচায় সেটিকে ভরে রাখলেন। পরের দিন দেখলেন ইঁদুরটি মরে পড়ে আছে। তার দেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখলেন ঠিক অ্যানথ্রাক্সে মৃত গরু ভেড়ার মত এই ইঁদুরের পিলেটিও বড় হয়েছে। পিলে থেকে কিছু কালো রক্ত নিয়ে তিনি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করলেন, দেখলেন তার মধ্যেও রয়েছে সেই ছোট ছোট কাঠির মত জিনিস। আবিষ্কারের আনন্দে তিনি এমির কাছে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন কিন্তু এমি তার স্বামীর এমন আবিষ্কারে চমৎকৃত ও উচ্ছ্বসিত হওয়া তো দূরের কথা উল্টো বলে বসলেন—"আ, ছি! ছি! রবার্ট তোমার গায়ে ইঁদুরের কি বিশ্রী গন্ধ!"

ককের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস এমনিভাবে রূঢ় বাস্তব মনের দ্বারে প্রতিহত হয়ে নির্জীব হয়ে পড়ে—কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র। কক আবার আপন জগতে ফিরে আসেন। কয়েকদিন ধরে সেই একই পরীক্ষা তিনি চালাতে থাকেন। কেননা, একবার দু'বারের পরীক্ষায় নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা চলে না। বারবার পরীক্ষা করে তাই তিনি নিশ্চিত হলেন, জানলেন, এই ছোট ছোট কাঠির মত জিনিসগুলিই অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু—তারাই অ্যানথ্রাক্স রোগের কারণ। এরা নিশ্চয়ই সজীব আর স্বল্প সময়ের মধ্যেই এরা জীব দেহে সংখ্যায় বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তা না হলে ঐ কাঠির ডগায় যে সামান্য সংখ্যক জীবাণু থাকে তা থেকেই ইঁদুরের দেহে এমন অসংখ্য জীবাণুর আবির্ভাব ঘটে কি করে?

কক এর আগে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু দেখেননি—তাই এরাই যে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু তা সনাক্ত করবেন কি করে? আর কি করেই বা এই সামান্য কয়েকটি জীবাণু জীবদেহে এত দ্রুত বৃদ্ধি পায়?

ককের তখন একমাত্র ভাবনা, ইঁদুরের দেহে নয়, কি করে জীবদেহের বাইরে কোনো কিছুতে এই জীবাণুর চাষ করা যায় বা গজানো যায়। কক তখন জানতেন না যে ফ্রান্সের লুই পাস্তুর ঈষ্ট কিংবা

মাংসের স্যুপে জীবাণু চাষের এক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কক তাই উদ্ভাবন করলেন আর এক পদ্ধতি। তিনি ভাবলেন গরু বা ভেড়ার রক্তে যখন এই জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তখন নিশ্চয়ই জীবদেহের রস এই জীবাণুগুলির খাদ্য। এই ভেবে তিনি তাঁর বাড়ীর কাছ থেকে সদ্য জবাই করা এক ষাঁড়ের চক্ষুরস সংগ্রহ করলেন এবং জীবাণুশূন্য স্লাইডের ওপর এক ফোঁটা সেই রস নিয়ে তার মধ্যে অ্যানথ্রাক্সে মৃত একটি ইঁদুরের পিলের সামান্য অংশ মিশিয়ে দিলেন। জীবদেহের সমান উত্তাপে সেটি যাতে থাকে সেজন্য একটি অভিনব ইনকুবেটর নিজেই তৈরী করে স্লাইডটিকে তার উপর রাখলেন। রাত্রে বার বার উঠে তিনি স্লাইডটিকে পরীক্ষা করেন, ইনকুবেটরের বাতির সলতে বাড়িয়ে দেন, ইনকুবেটরের পাত্রে পানি ঢালেন।

কিন্তু এত কিছু করেও ঈপ্সিত ফল তিনি পেলেন না। স্লাইডে অন্যান্য জীবাণু ঢুকে বার বার তাঁর আসল জীবাণুকে ছেয়ে ফেলতে লাগলো—ভালো করে তিনি আর তাদের দেখতে পান না। কাজেই এসব জীবাণু স্লাইডে যাতে না আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ভেবে ভেবে তিনি এক কৌশল বের করলেন যা ঝুলন্ত ফোঁটায় জীবাণু গজানোর পদ্ধতি বলে সুপরিচিত।

জীবাণু শূন্য করার জন্য একটি স্লাইড গরম করে তা ঠাণ্ডা হলে কক তাতে ষাঁড়ের এক ফোঁটা চক্ষুরস রাখলেন এবং ফোঁটাটির চারপাশে ভেসেলিন মাখলেন। অ্যানথ্রাক্সে মৃত একটি ইঁদুরের পিলে থেকে সামান্য অংশ কাঠি দিয়ে তুলে নিয়ে তিনি সেই ফোঁটাটিতে মেশালেন। ফোঁটাটির ওপর আর একটি এমন স্লাইড বসানো হলো যার মধ্যে রয়েছে একটি গর্ত, ফলে স্লাইডটি ফোঁটাটির ওপর আর চেপে বসলো না—সেটিকে ঢেকে রাখলো। ফোঁটার চারপাশে ভেসেলিন থাকায় স্লাইড দুটি বেশ আঁটা থাকলো—বাইরে থেকে জীবাণু এসে আর ফোঁটাতে মিশতে পারলো না। এখন এই জোড়া স্লাইডটিকে উলটিয়ে নিলে ফোঁটাটি ঝুলন্ত অবস্থায় থাকবে। এই অবস্থায় অণুবীক্ষণে এটিকে বসিয়ে কক তা পরীক্ষা করে দেখলেন। পিলেটির ছোট ছোট টুকরো এবং তার মধ্যে এদিকে ওদিকে দু'একটি ছোট ছোট কাঠি ছাড়া

আর কিছুই দেখা গেল না। মাঝে মাঝে চোখ জিরিয়ে নিয়ে দুঘণ্টা ধরে তিনি তা দেখলেন, তবে নতুন কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু এর পরেই দেখা গেল এক আজব কাণ্ড! অবাক হয়ে তিনি দেখলেন, একটি ছোট্ট কাঠি দুটি হলো, দুটো কাঠি হলো চারটি, তারপর আটটি, ষোলটি—আর গোণা যায় না, চোখের পলক ফেলতে ফেলতেই হাজার হাজার ছোট ছোট কাঠির মত জিনিসে ক্ষুদ্র ফোঁটাটি ভরে গেলো এবং এক সময় কাঠিগুলি সুতোর মত লম্বা হয়ে যেন এক মাকড়সার জাল তৈরি করলো।

এই ব্যাপারে ককের আর বুঝতে বাকি রইলো না, কেন এই ক্ষুদ্র জীবাণুর আক্রমণে বড় বড় পশুর মৃত্যু হয়। মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যেই যদি এত অগণিত জীবাণুর সৃষ্টি হয় তবে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে না জানি সৃষ্টি হয় কত কোটি কোটি জীবাণু। আর এই জীবাণু যখন পশুর দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, তখন তাদের দৌরাত্ম্যে জর্জরিত হয়ে এক সময়ে অমন বিরাট পশুকেও যে মৃত্যুবরণ করতে হবে তা আর বিচিত্র কি!

যাহোক, জোড়া স্লাইডটিকে অণুবীক্ষণ থেকে নামিয়ে এনে একটি স্লাইড সরিয়ে নিয়ে কক দেখলেন ফোঁটাটি যেন একটু ঘোলাটে হয়েছে। এই ঘোলাটে ফোঁটাটি থেকে কাঠি দিয়ে একটু রস নিয়ে তিনি আবার নতুন এক ফোঁটা ষাঁড়ের চক্ষুরসে মেশালেন এবং জোড়া স্লাইডটিকে ইনকুবেটরে রাখলেন। পরের দিন সেটিকে অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে দেখলেন যে ফোঁটাটি একটু ঘোলাটে হয়েছে এবং লক্ষ লক্ষ জীবাণুতে ভরে গেছে। এমনিভাবে পরপর আটদিন তিনি ষাঁড়ের নতুন নতুন চক্ষুরসে নতুন গজানো জীবাণু মেশালেন এবং প্রত্যেকটি ফোঁটাতেই তিনি লক্ষ্য করলেন লক্ষ লক্ষ জীবাণু।

এখন এই অষ্টম স্লাইডের জীবাণু হলো প্রথম স্লাইডের অষ্টম বংশধর। ইঁদুর থেকে নেয়া এই জীবাণু ইঁদুরের দেহের বাইরে ষাঁড়ের চক্ষুরসে জন্মেছে এবং পর পর আটটি জন্মান্তর পার হয়ে এসেছে। ঝুলন্ত ফোঁটায় এই জীবাণু চাষ করায় তার সাথে অন্য কোনো জীবাণু আর এতে সংমিশ্রিত হতে পারেনি। এই অষ্টম ফোঁটায় ইঁদুরের পিলের কোনো সূক্ষ্ম কণাও নেই। এই জীবাণু বিশুদ্ধ এবং এরা শুধু প্রথম ইঁদুর থেকে নেয়া জীবাণুর অষ্টম বংশধর। কাজেই এই জীবাণু যদি কোনো সুস্থ ইঁদুরের দেহে

অ্যানথ্রাক্স রোগের সৃষ্টি করতে পারে—তবে নিশ্চিত ভাবে বোঝা যাবে যে, অ্যানথ্রাক্সের কারণ এই জীবাণু।

কক এই অষ্টম স্লাইডের সামান্য রস কাঠিতে নিয়ে ইঁদুরের দেহে সংক্রামিত করলেন। পরদিন এই ইঁদুরটি আগেরগুলির মতই মারা গেলো। তার পিলে থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে সেগুলি ঐ আগের মত জীবাণুতে পূর্ণ।

এবারের পরীক্ষায় কক নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, এই জীবাণুই অ্যানথ্রাক্সের কারণ এবং এটাও নিঃসন্দেহে জানা গেল যে, কোনো এক জাতের জীবাণু জীবদেহে কোনো একটি বিশেষ রোগের সৃষ্টি করে।

এই যুগান্তকারী আবিষ্কার করেও কক কিন্তু তা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, এ জীবাণু সম্বন্ধে সব কিছুতো এখনও জানা শেষ হয়নি, আরও অনেক কিছু জানতে হবে—আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে।

এরপর থেকে এ জীবাণুর রহস্য সন্ধানে কক এতটাই মেতে উঠলেন যে, আহার নিদ্রা তিনি প্রায় ভুলে গেলেন, একের পর এক তিনি সুস্থ গিনিপিগ, খরগোশ, এমনকি শেষে সুস্থ ভেড়ার দেহেও ঐ জীবাণু ভরা চক্ষুরস নিয়ে পরীক্ষা করে তিনি একই ফল পেলেন। অ্যানথ্রাক্স রোগে সব পশুরই মৃত্যু হলো এবং সব রকমের সবগুলি পশুর পিলেতে তিনি ঐ একই জীবাণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন।

কিন্তু একটি বিষয় তখনও তাঁর অজানা রইলো। অনেকদিন থেকেই লোকে লক্ষ্য করতো যে, কোনো কোনো গোচারণের মাঠ ছিল সত্যই যেন অভিশপ্ত। ঐ মাঠগুলিতে গবাদি পশু চরলেই তাদের অ্যানথ্রাক্স রোগ হতো। কৃষকেরা তাঁর জীবাণুর কথা শুনে বলতো—"ডাক্তার সাহেব, আপনার ঐ ছোট ছোট জীবাণুই যে আমাদের গরু ভেড়ার মড়কের কারণ তা না হয় মানলাম, কিন্তু বলতে পারেন, কোনো মাঠে আমাদের গরু ভেড়া যখন চরে তখন তারা বেশ সুস্থ থাকে, অথচ সেই গরু ভেড়াকে অন্য এক মাঠে নিয়ে চরাতে গেলে কেন তারা মাছির মত মরে যায়?" কক এর কি উত্তর দেবেন? তিনি নিজেই তখন তা জানতেন না। এই রহস্যের বেড়াজাল তখনও তিনি যে ছিন্ন করতে পারেন নি। নিজেও তিনি এ

ব্যাপারটি জানতেন, অনেক চিন্তাও করেছেন এ নিয়ে। এই জীবাণু এই সকল অভিশপ্ত মাঠে কোথায় লুকিয়ে থাকে, দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, তারা কি করে বেঁচে থাকে? অথচ কক দেখেছেন, তাঁর স্লাইডে চক্ষুরস শুকিয়ে গেলেই সবগুলি জীবাণু মারা যায়। নতুন চক্ষুরস মিশ্রিত করলেও তারা আর জন্মায় না। কিন্তু কি করে তারা খোলা মাঠের নানা প্রতিকূল অবস্থাতেও এত দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে?

ভাগ্যক্রমে একদিন কক তাঁর অণুবীক্ষণ যন্ত্রের স্লাইডে এক অদ্ভুত কাণ্ড দেখতে পেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, জীবাণুগুলির ঘটছে এক অপরূপ রূপান্তর—আর তারই সূত্রে তাঁর প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পেলেন। উত্তর প্রুসিয়ার এক ক্ষুদ্র গবেষণাগারে বসে তিনি ফ্রান্সের যত অভিশপ্ত মাঠের এবং পাহাড়ের রহস্য উদঘাটন করলেন।

তাঁর উদ্ভাবিত ঝুলন্ত পদ্ধতিতে এক ফোঁটা চক্ষুরসে জীবাণু সংক্রামিত করে তিনি তা দেহের সমান উত্তাপে ২৪ ঘণ্টা ধরে ইনকুবেটরে রেখেছিলেন, ভেবেছিলেন ফোঁটার মধ্যে ভাল ভাবেই জীবাণু জন্মাবে আর লম্বা লম্বা সরু ফিতায় তা পরিণত হবে। অবশ্য এই স্লাইডে তিনি লম্বা সরু ফিতার মত জিনিস লক্ষ্য করেছিলেনও—কিন্তু তা অস্পষ্ট—কিন্তু যা তিনি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করলেন তা হলো—এই অস্পষ্ট ফিতা জুড়ে রয়েছে চকচকে কিসের যেন দানা, গোল গোল, ছোট ছোট মুক্তার মালার মত সেগুলি যেন গাঁথা রয়েছে সেই সরু ফিতায়। প্রথমে তিনি ভাবলেন হয়ত অন্য কোনো জীবাণু এই স্লাইডে প্রবেশ করেছে। কিন্তু ভালভাবে লক্ষ্য করে তিনি দেখতে পেলেন যে, এই উজ্জ্বল দানাগুলি রয়েছে ফিতার ভিতরে, যে জীবাণুগুলি ফিতা তৈরী করে তারাই পরিণত হয়েছে এমনি উজ্জ্বল দানায়।

কক এই স্লাইডের রস শুকিয়ে তা রেখে দিলেন। মাসখানেক পর তিনি স্লাইডটিকে নিয়ে দেখলেন সেই মুক্তার মত দানাগুলি ঠিক তেমনই আছে, তেমনি জ্বল জ্বল করছে। কক এবারে এক ফোঁটা তাজা চক্ষুরস দিয়ে স্লাইডের শুকনো জিনিসকে ভিজিয়ে নিলেন এবং অণুবীক্ষণে তা লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পর দেখলেন তাজা চক্ষুরসে সিক্ত হয়ে মুক্তার মত দানাগুলি ধীরে ধীরে সাধারণ জীবাণুতে এবং পরে তারা লম্বা ফিতায়

পরিণত হলো। কক এই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেলেন।

এতদিনে কক বুঝলেন—ঐ মুক্তার মত দানাগুলি আসলে অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণুর গুটি। সহনশীলতা এদের অনেক বেশী, তাই তারা অধিক শৈত্য, উত্তাপ কিংবা শুষ্কতা সহ্য করতে পারে এবং এই গুটির আকারে দীর্ঘকাল সুপ্ত থেকে অনুকূল পরিবেশে আবার তারা সজীব হয়ে ওঠে। এই ধারণার সত্যতা প্রমাণের জন্য কক অতি সাবধানে অ্যানথ্রাক্স রোগে মৃত ইঁদুরের পিলের জীবাণু ভর্তি কয়েকটি ছোট টুকরো গরম করা ছুরি ও চিমটার সাহায্যে আলাদা করে নিয়ে ইঁদুরের দেহের সমান তাপে ২৪ ঘণ্টা ধরে গরম অবস্থায় রেখে দেখলেন যে, টুকরোগুলির ভিতরের সব জীবাণুগুলিই মুক্তার মত দানায় পরিণত হয়েছে, গুটির সৃষ্টি করেছে। এই গুটিগুলিকে কয়েক মাস রেখে তিনি আরও দেখলেন যে সেই গুটিগুলিকে যদি তাজা চক্ষুরসে রাখা যায় বা ইঁদুরের লেজ কেটে সেখানে লাগানো যায় তবে তারা আবার মারাত্মক জীবন্ত অ্যানথ্রাক্স জীবাণুতে পরিণত হয়। বহু বারের পরীক্ষায় এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করে তাই তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, জীবাণু যখন কোনো জীবদেহে বাস করে তখন তাদের গুটি হয় না---এই গুটির সৃষ্টি হয় যখন তারা মরে যায়---আর সে সময়ে তাদের যদি অধিক উত্তাপে রাখা যায়। অধিক উত্তাপে যে রাখা প্রয়োজন তা তিনি প্রমাণ করলেন পিলের টুকরোগুলিকে ঠাণ্ডা কুঠরিতে রেখে। ঠাণ্ডা অবস্থায় কয়েকদিন রেখে যদি তা ইঁদুরের লেজ কেটে লাগানো যায় তবে ইঁদুরগুলি আর অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয় না, দিব্যি সুস্থ অবস্থায় তারা বেঁচে থাকে।

তখন ১৮৭৬ সাল, আর ককের বয়স তখন ৩৪ বছর। দীর্ঘদিন কঠোর সাধনায় লিপ্ত থেকে, সব বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কক এবার তার যুগান্তকারী আবিষ্কার, তাঁর দীর্ঘ দিনের গবেষণার ফল ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত হলেন।

প্রখ্যাত উদ্ভিদবিদ ফার্ডিনাণ্ড কঅন তখন জার্মানীর ব্রাসলাউ-এ থাকতেন। কক মাঝে মাঝে তাঁর গবেষণার বিষয় নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতেন আর কঅনও তাঁকে উৎসাহ দিয়ে উত্তর দিতেন। কক তাঁর এই

আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করার আগে কঅনকে অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠি দিলেন। কঅন যদি তাঁর এই আবিষ্কারগুলিকে তাঁর সামনে পরীক্ষা করে দেখানোর সুযোগ দিতেন এবং সেগুলি সম্পর্কে তাঁর বিজ্ঞ অভিমত জানাতেন, তবে অত্যন্ত বাধিত হতেন তিনি। চিঠি পেয়ে কঅন ককেকে ডেকে পাঠালেন। সবচেয়ে ভাল সুটটি পরে, চোখে তাঁর সোনার চশমাটি এঁটে— পরীক্ষার যাবতীয় সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে কক তাই একদিন কঅন-এর কাছে হাজির হলেন।

"তারপর যাহা, ইতিহাস তাহা"। কঅন এক প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত করলেন। সকল বিজ্ঞান বিষয়ের বিশারদগণকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। এই মহতী বিজ্ঞান সভায়, এক অখ্যাত গ্রাম্য ডাক্তার—তিনদিন ধরে এমন দক্ষতা, ক্ষিপ্রতা এবং নিখুঁতভাবে তাঁর আবিষ্কারকে তুলে ধরলেন যে, সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এই সভায় সমগ্র ইউরোপের খ্যাতনামা ব্যাধি বিশারদ ও ব্যাধিতত্ত্বের গবেষণাগার কঅন হাউস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক কঅন হাইমও ছিলেন। তিনি অ্যানথ্রাক্স রোগ জীবাণুর এই বিচিত্র ক্রমবিকাশ নিজের চোখে দেখে বিস্ময়ে, আনন্দে এতটা অভিভূত হলেন যে, সেই মুহূর্তেই তিনি গবেষণাগারে ছুটে গিয়ে তাঁর ছাত্র ও সহকারীদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—"যাও, হাতের কাজ ফেলে এক্ষুণি ছুটে গিয়ে ডাক্তার ককেকে দেখে এসো। কি বিরাট আর বিস্ময়কর আবিষ্কার করেছেন এই ডাক্তার কক্।" প্রশ্ন হলো—"কিন্তু কে এই ডাক্তার কক? তাঁর নাম তো আমরা শুনিনি কোনো দিন?"

উত্তরে হাইম বললেন—"তা জানবার দরকার নেই। এ এক বিরাট আবিষ্কার, এত নিখুঁত, অথচ এত সরল! জানতে চাও? তিনি একজন অধ্যাপকও নন, একজন বড় ডাক্তারও নন। কি করে গবেষণা করতে হয়, তাও তিনি শেখেননি কোনদিন! আহা কি আশ্চর্য! সব কিছু তিনি নিজের চেষ্টায় করেছেন, প্রমাণের কিছুই বাকী রাখেননি তিনি, নতুন কিছু কারও আর করবার নেই।"

—"কিন্তু কি এই আবিষ্কার?"

—"যাও নিজের চোখে সবাই গিয়ে দেখে এসো। জীবাণুতত্ত্বের এ এক সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। —মনে হয় কক সকলের মুখে চুনকালি দিয়ে

এমনি আরও অনেক আবিষ্কার করে আমাদের লজ্জা দেবে---যাও এক্ষুণি ছুটে যাও।" ততক্ষণে অবশ্য সবাই ককের উদ্দেশ্যে ছুটে গিয়েছিল।

এর সাত বছর আগে পাস্তুর ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন---"মানুষের মধ্যেই এমন ক্ষমতা রয়েছে যার বলে সে সংক্রামক ব্যাধিকে পৃথিবীর বুক থেকে সমূলে নির্মূল করে দিতে পারবে।" যখন তিনি একথা বলেছিলেন— তখন সারা পৃথিবীর বড় বড় বিজ্ঞ ডাক্তারও মনে মনে বলেছিলেন—লোকটির সত্যই মাথা খারাপ হয়েছে। কিন্তু এই তিন দিনের বিস্ময়কর পরীক্ষায় কক বিশ্ববাসীকে দেখাতে সমর্থ হলেন—পাস্তুরের এই উদ্ভট ভবিষ্যৎবাণী সফল হতে চলেছে। নিশ্চিত পরীক্ষার অবতারণা করে কক পরিশেষে বললেন— "অ্যানথ্রাক্সে মৃত পশুর দেহ কলা বা টিস্যুর (Tissue) তাজা, পচা, শুকনো— এমনকি এক বছরের পুরনো হোক না কেন, তাতে যদি জীবাণু বা জীবাণুর গুটি থাকে একমাত্র তবেই তা অ্যানথ্রাক্স রোগ সৃষ্টি করবে, অন্যথায় নয়। যে সকল পশু অ্যানথ্রাক্স রোগে মারা যায় সেগুলিকে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। যদি পোড়ানোর অসুবিধা থাকে, তবে সেগুলিকে মাটির খুব গভীরে কবর দিতে হবে, কেননা, সেখানে শীতল মাটির সংস্পর্শে জীবাণুরা আর শক্ত গুটিতে পরিণত হতে পারবে না।"

এই তিন দিনের পরীক্ষায় কক যেন দেবতার হাত থেকে সেই শক্তিশালী হাতিয়ার ছিনিয়ে এনে মানুষের হাতের মুঠোয় এনে দিলেন, যে দেবতার তরবারি এমনি ভাবে শত শত পশুকে বধ করে বলে লোকে তখন বিশ্বাস করতো! ককের আবিষ্কার তাই মানুষকে শেখালো জীবাণুকে বধ করার এক নতুন অস্ত্রের ব্যবহার, যে অস্ত্র দিয়ে সে এখন ব্যাধিকে পরাজিত করবে, দূরে সরিয়ে রাখবে মৃত্যুকে! এই যুগান্তকারী আবিষ্কার মানুষকে সেই পথেরই সন্ধান এনে দিলো, যে পথে মানুষ তার বুদ্ধি প্রয়োগ করে সংগ্রাম করবে, তার তরবারি হবে বিজ্ঞান, কুসংস্কার নয়।

যাহোক, কক ব্রাসলাউ-এ এক বিরাট সাড়া জাগিয়ে তাঁর আস্তানায় ফিরে এলেন, কিন্তু বেশীদিন থাকতে পারলেন না। ককের ভাগ্য ভাল যে তিনি কঅন ও কঅন হাইমের মত উদার ও মহৎ ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁরা দুজনেই ভাবলেন ককের মত একজন প্রতিভাবান

বিজ্ঞানীর পক্ষে গাঁয়ে বসে ডাক্তারী করার কোনো সার্থকতা নেই—এতে পৃথিবীরই প্রভূত ক্ষতি। বিজ্ঞান মহলে তাই তাঁরা কক এবং তাঁর আবিষ্কারের এমন গুণ কীর্তন ও প্রচার কার্য চালাতে লাগলেন যে, জীবাণু তত্ত্বের পথিকৃৎ পাস্তুরের প্রধান আসনও যেন টলতে শুরু করলো। বার্লিনের ইম্পেরিয়াল হেলথ অফিসকেও তাঁরা এই বলে খোঁচাতে আরম্ভ করলেন যে, ককের মত লোক, যাঁকে নিয়ে জার্মানীর গর্ববোধ করা উচিত, তাঁকে কেবল মাত্র জীবাণু সন্ধানের কাজে লিপ্ত রেখে, গ্রামে পচতে দেয়া কি ভাল হচ্ছে? তাঁদের চেষ্টার ফলে শেষ পর্যন্ত অবশ্য কক ব্রাসলাউ-এ বার্ষিক নব্বই পাউণ্ড মাইনের শহর চিকিৎসকের এক কাজ পেলেন এবং সেখানেই চলে এলেন।

কঅন ও কঅন হাইম ভেবেছিলেন এমন নামজাদা চিকিৎসক দিয়ে চিকিৎসা করাতে রোগীর খুব ভিড় হবে এবং তাঁর ভাল রোজগারও হবে। তাছাড়া মাইনের ৯০ পাউণ্ডতো আছেই। কাজেই ককের এখানে বেশ ভাল ভাবেই চলে যাবে। কিন্তু তাঁরা যা আশা করেছিলেন তা হলো না--- ককের কাছে খুব কম রোগীই ভিড় জমালো, আর কিছুদিনের মধ্যে কক নিজেও এই সত্য উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ডাক্তারের পক্ষে উর্বর মস্তিষ্ক আর অনুসন্ধিৎসু মন ডাক্তারীতে পসার লাভের তেমন সহায়ক নয়! নিরাশ হয়ে তাই তিনি আগের জায়গাতেই আবার ফিরে গেলেন।

তারপর ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত তিনি সেখান থেকে একের পর এক যা আবিষ্কার করলেন তাতে কঅন ও কঅন হাইমের ভবিষ্যৎবাণী সত্যই সফল হলো। পশু ও মানুষের মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টিকারী জীবাণু তিনি আবিষ্কার করলেন। নানা রঞ্জক দ্রব্যে নানা ধরনের জীবাণুকে তিনি রঙিন করে সেগুলিকে স্পষ্ট ভাবে দেখার পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন - যার ফলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবাণুকেও এই উপায়ে দেখার সুযোগ হলো। শুধু তাই নয়, ক্যামেরার সাহায্যে এসকল জীবাণুর ছবি নেয়ারও এক পদ্ধতি তিনি উদ্ভাবন করলেন। এই ছবি নেয়ার পদ্ধতি উদ্ভাবনের ফলে জীবাণুকে সনাক্ত করা এবং তাদের সম্পর্কে অনুশীলন করার খুবই সুবিধা হলো। কোনো অণুবীক্ষণে দুজন লোক একই সঙ্গে একই সময়ে দেখতে পারে না।

একই জীবাণুর ছবি আঁকতে গিয়ে তুজন যে একই ভাবে ছবি আঁকতে পারবে তারও সম্ভাবনা খুব কম। কাজেই মতদ্বৈতের সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে তাদের ছবি নিলে সে ছবির আর হেরফের হয় না—দশজনে একই সঙ্গে দেখতে পারে—তাদের অনুশীলনও করতে পারে, মতৈক্যে পৌঁছানোও সহজ হয়।

এদিকে কঅন ও কঅন হাইম ককের কথা কিন্তু ভোলেননি, অবশেষে ১৮৮০ সালে তাঁদের চেষ্টায় সরকার তাঁকে ইম্পেরিয়াল হেলথ কমিশনের সভ্য নিযুক্ত করলেন এবং বার্লিনে এসে সেই কাজে যোগ দিতে অনুরোধ জানালেন। কক বার্লিনে এসে এই কাজে যোগ দিলেন। এরপর তাঁকে আর বার্লিন ছাড়তে হয়নি।

গবেষণা কাজের জন্য কক এখানে একটি সুন্দর গবেষণাগার পেলেন। বহু মূল্যবান যন্ত্রপাতি, তুজন সহকারী, আর গবেষণা চালানোর জন্য প্রচুর অর্থ তাঁকে বরাদ্দ করা হলো। কাজেই কক এখন তাঁর রঙিন জীবাণু এবং টেস্টটিউব নিয়ে গিনিপিগ ও খরগোশের উপর নানাবিধ পরীক্ষা চালিয়ে দিনের মধ্যে ১৬ থেকে ১৮ ঘন্টা নিজেকে ব্যতিব্যস্ত রাখার এক সুবর্ণ সুযোগ লাভ করলেন।

ইতিমধ্যে অ্যানথ্রাক্স জীবাণু আবিষ্কারের সূত্রে ককের বদ্ধমূল ধারণা জন্মেছিল যে সকল সংক্রামক ব্যাধির মূল কারণ বস্তুতঃই জীবাণু। এক জাতের জীবাণু একটি বিশেষ রোগের সৃষ্টি করে, কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতের জীবাণুকে আলাদা ভাবে গজানো খুব কঠিন। কোনো জীবাণুর পোষক মাধ্যমে (Culture medium) অন্য জীবাণু এসে বাসা বাঁধে আর সব কাজ ভণ্ডুল করে দেয়। কক তাই চেষ্টা করতে লাগলেন কি করে এক এক জাতের জীবাণু আলাদা আলাদাভাবে পোষক মাধ্যমে গজানো যায়। ভাগ্যক্রমে একদিন তাঁর সূত্র তিনি হঠাৎ করেই পেয়ে গেলেন। ল্যাবরেটরির টেবিলে আধখানা সিদ্ধ আলু পড়ে ছিল। সেদিকে নজর পড়তেই তিনি তার গায়ে ছোট ছোট নানা বর্ণের বিন্দু দেখতে পেলেন। কোনোটি ধূসর, কোনোটি লাল, কোনোটি হলুদ, কোনটি বা বেগুনি। এই রঙিন বিন্দুগুলিকে বিশুদ্ধ পানিতে মিশিয়ে অণুবীক্ষণে তিনি পরীক্ষা করে

দেখলেন যে, এক এক রঙের বিন্দুতে এক এক ধরনের জীবাণু রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো বাতাসে নানা ধরনের জীবাণু ভেসে থাকে কিন্তু সিদ্ধ আলুর গায়ে এক এক জাতের জীবাণু গজালো কি করে? তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে পড়লো বাতাস থেকে জীবাণু যখন কোনো কঠিন জিনিসের উপর পড়ে তখন জীবাণুগুলির মধ্যে যেটি যেখানে পড়ে সেটি সেখানেই আটকা থাকে এবং সেখানেই গজায়। তরল পোষকের মাধ্যমে পড়লে তাদের মধ্যে মিশ্রিত হওয়ার যেমন সুযোগ থাকে, কঠিন মাধ্যমে পড়লে সে সুবিধা আর তাদের থাকে না। কক দেখলেন প্রকৃতিতে আলাদা ভাবে জীবাণু গজানোর কেমন সুন্দর ও সহজ ব্যবস্থা রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক পদ্ধতি অনুকরণ করে তিনি তাঁর দুই সহকারীর সাহায্যে শীঘ্রই সিদ্ধ আলুর মধ্যে বিশুদ্ধ জীবাণু আলাদা আলাদা ভাবে জন্মাতে সক্ষম হলেন। এরপর তিনি বিশুদ্ধ জীবাণু গজানোর জন্য এর চেয়ে ভালো আরো এক কঠিন পোষক মাধ্যম, জিলাটিন ও মাংসের নির্যাস মিশ্রিত করে তৈরি করলেন। মিশ্রণের মধ্যকার জিলাটিন যখন জমে যায় তখন এক কঠিন মাধ্যম তৈরি হয়, যার ফলে জীবাণুকে এক জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে জন্মানো সম্ভব হয়।

কক যখন আলাদা ভাবে জীবাণু গজানোর এক সুষ্ঠু পন্থা উদ্ভাবনে সক্ষম হলেন এবং এভাবে জীবাণু সন্ধানের কাজ যখন সহজতর হলো, তখন তিনি দুরারোগ্য যক্ষ্মা রোগের কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হলেন।

যক্ষ্মা একটি মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধি এবং অতি প্রাচীন কাল থেকেই এটি "কাল ব্যাধি" হিসাবে পরিগণিত হয়ে আসছে। এ রোগে আক্রান্ত হলে রোগী সাধারণতঃ বাঁচতো না বলে ব্যাধিটিকে কাল ব্যাধি নামে অভিহিত করা হতো। শব ব্যবচ্ছেদ করে দেখা গেছে ফুসফুসের যক্ষ্মায় ফুসফুসের ওপর ছোট ছোট এক রকমের গুটি হয়, ঘা হয় এবং পরে ধীরে ধীরে তা ক্ষয় হয়। তাই যক্ষ্মা আসলে একটি ক্ষয় রোগ। শরীর ও জীবনী শক্তি ক্ষয় হতে হতে রোগীর একদিন মৃত্যু ঘটে। কিন্তু যক্ষ্মার কারণ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা ছিল না। ককের সময়ে এটুকুই কেবল জানা ছিল যে,— এই রোগের কারণ নিশ্চয়ই কোনো জীবাণু। কেননা, এই রোগ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রাণীদেহ থেকে সুস্থ প্রাণিদেহে সংক্রামিত হয় বা করা যায়।

কিন্তু বহু বিজ্ঞানী বহু চেষ্টা করেও এ রোগের কোনো জীবাণু খুঁজে পাননি। ভিলেমিন নামে একজন ফরাসী সর্বপ্রথম এ বিষয়ে কিছু কাজ করেন এবং কন্‌ন হাইম রোগীর ফুসফুসে যে গুটি হয় তা খরগোশের চোখের প্রথম প্রকোষ্ঠের মধ্যে রেখে এই রোগ সংক্রামিত করতে সক্ষম হন।

কক তাঁর প্রথম পরীক্ষা খরগোশ ও গিনিপিগকে নিয়ে শুরু করলেন। মৃত এক কৃষকের ফুসফুসের গুটি নির্বীজিত ছুটি ছুরির মধ্যে পিষে তা দিয়ে খরগোশের চোখে এবং গিনিপিগের দেহে ইঞ্জেকশন দিলেন এবং এদেরকে আলাদা করে রাখলেন।

এখন এদের দেহে রোগের লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাই কক সে সময়ে অন্যান্য পরীক্ষা করতে লাগলেন। মৃত কৃষকটির দেহ থেকে সংগৃহীত টিস্যুত তিনি জীবাণুর সন্ধান করলেন—কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কিছু পেলেন না। নিরাশ হয়ে ভাবলেন—হয়ত এত সহজে এদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই তিনি এদেরকে রঙিন করে দেখার চেষ্টা করতে লাগলেন। দিনের পর দিন তিনি টিস্যুগুলিকে নানা রঙে রঙিন করে দেখতে দেখতে—সত্যিই একদিন সফল হলেন—স্পষ্ট দেখতে পেলেন নীল রঙে রঞ্জিত যক্ষ্মার জীবাণু। জীবাণুগুলি অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর মত সোজা নয়—একটু বাঁকা—আর খুবই ছোট ছোট। এই জীবাণু তিনি মৃত লোকটির দেহের সব জায়গা থেকে সংগৃহীত রুগ্ন টিস্যুতে, এমন কি রোগীর থুথুতেও দেখতে পেলেন। (এই জীবাণু রঙ ধরানোর ব্যাপারে একটি গল্প প্রচলিত আছে। এই কাজটি নাকি কক করেননি—করেছিলেন আরলিক নামে আর একজন ডাক্তার। "আধুনিক কেমোথেরাপির জনক—আরলিক" অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। এদিকে যে সমস্ত খরগোশ আর গিনিপিগের চোখে এবং দেহে তিনি ইঞ্জেকশন দিয়ে ছিলেন তাদের অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে লাগলো। যক্ষ্মার লক্ষণ তাদের মধ্যে প্রকাশ পেল এবং একদিন সবকটিই মারা গেল। এদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তিনি তাদের দেহে যক্ষ্মার জীবাণু দেখতে পেলেন। কিন্তু এরাই যে যক্ষ্মার জীবাণু তা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করতে হলে এটুকুই যথেষ্ট নয়। এই জীবাণুকে কোনো মাধ্যমে গজাতে হবে এবং সেগুলি যে প্রাণিদেহে ঐ রোগ সৃষ্টি

করে তাও দেখাতে হবে। কক তাঁর আবিষ্কৃত "সুপ-জিলাটিন"-এর কঠিন মাধ্যমে এই জীবাণুর চাষ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। ককের ধারণা হলো, এরা পরজীবী তাই প্রাণীদেহের খাদ্য এদের দরকার। এই ভেবে তিনি কসাই-এর কাছ থেকে কিছু পশু রক্তের সিরাম ( রক্ত জমে গেলে যে তরল পদার্থ আলাদা হয় ) এনে বিশেষ কৌশলে তা টেস্টটিউবে জমালেন। এই হলো ককের বিখ্যাত "ব্লাডসিরাম জেলি।" এই ধরনের মাধ্যমে তিনি শেষ পর্যন্ত যক্ষার জীবাণু জন্মাতে সক্ষম হলেন এবং এতে জীবাণু গজিয়ে তিনি নানা প্রকার প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে নিশ্চিত ভাবেই প্রমাণ করলেন যে, যক্ষার কারণ আর কিছুই নয়, এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীবাণু। এই শেষোক্ত পরীক্ষায় অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে কচ্ছপ, ব্যাঙ, ইল মাছ এমনকি একটি গোল্ডফিস পর্যন্ত তিনি ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য এগুলি রোগ সংক্রামিত করেনি, দিব্যি বেঁচে ছিল।

কিন্তু কি করে মানুষের দেহে এই রোগ সংক্রামিত হয় কক সে সম্বন্ধেও পরীক্ষা করলেন। এর আগে তিনি দেখেছিলেন যে, যক্ষা রোগীর থুথুতে যক্ষার জীবাণু থাকে। তাঁর ধারণা হলো, ধূলিবালিতে থুথুর সূত্রে যে জীবাণু থাকে কিংবা রোগীর কাসির সঙ্গে যে জীবাণু বেরিয়ে আসে, তাই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সুস্থ লোকের দেহে প্রবেশ করে, আর এমনি করেই রোগ সংক্রামিত হয়। এই তথ্য প্রমাণের জন্যে তিনি একটি বদ্ধ বাক্সে কয়েকটি খরগোশ ও গিনিপিগকে আবদ্ধ রেখে সেই বাক্সটিকে বাগানে রেখে দিলেন এবং বাক্সটির সাথে ল্যাবরেটরি পর্যন্ত একটি সীসার পাইপ যুক্ত করলেন। ল্যাবরেটরিতে গজানো যক্ষার জীবাণু তিনি তিন দিন রোজ আট ঘণ্টা ধরে পাম্প করে ঐ বাক্সে ঢোকালেন। দশ দিনে খরগোশ এবং তিন সপ্তাহে গিনিপিগ যক্ষায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। যাহোক, দীর্ঘ তিন বছর ধরে এমনি পরীক্ষা চালিয়ে যখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত হলেন, তখন ১৮৮২ সালের ২৪শে মার্চ তারিখে, জার্মানীর শারীর বিজ্ঞান সমিতিতে এই আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করলেন। বক্তব্য শেষ করে আলোচনার জন্য যখন তিনি বসে পড়লেন তখন উপস্থিত বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ তাঁর বিপক্ষে বলার কিছু

খুঁজে পেলেন না, এমনকি নামজাদা ব্যাধিবিশারদ ফিরকো (Virchow) যিনি কোনোদিনও জীবাণুর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না—তিনিও চুপিচুপি সভা থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজের মুখ রক্ষা করেছিলেন। কেননা, কক তাঁর কাজে কোথাও কোনো ফাঁক রাখেননি যাতে অন্যের আর কিছু বলার থাকে।

এই আবিষ্কারে ককের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো এবং সব দেশই এই রোগ প্রতিরোধের জন্য নতুন নতুন ব্যবস্থা গৃহীত হতে লাগলো।

এরপর কক আবিষ্কার করলেন কলেরা রোগের জীবাণু। কলেরা জীবাণু স্পর্শকাতর জীবাণুদের মধ্যে অন্যতম। অতি সহজেই এদেরকে ধ্বংস করা যায়। অথচ এই নাজুক জীবাণুটিই যে কত মহামারী, কত লোকের মৃত্যু ঘটিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

১৮৮৩ সালে এশিয়াটিক কলেরা ইউরোপের দ্বারপ্রান্তে আঘাত হানলো। দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশ থেকে রহস্যজনকভাবে এই রোগ সাগর ও মরুভূমি পেরিয়ে মিশরে গিয়ে পৌঁছলো এবং ইউরোপে, ভূমধ্য সাগরের উপকণ্ঠে মহামারী আকারে দেখা দিল। কলেরা রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য ফ্রান্স ও জার্মানী থেকে কমিশন পাঠান হলো। জার্মানীর কলেরা কমিশনের প্রধান ছিলেন ডাঃ কক এবং সহকারী ছিলেন গাফ্‌কি। ফ্রান্সের কমিশনের সদস্য ছিলিন রু (Roux) এবং থুইলিয়ার। পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের গবেষণায় খুবই ব্যতিব্যস্ত ছিলেন বলে তিনি এঁদেরকে পাঠিয়েছিলেন। এরপর পাস্তুরের প্রতিনিধি আর ককের মধ্যে তথা ফ্রান্স এবং জার্মানীর মধ্যে কে আগে কলেরা জীবাণু আবিষ্কার করতে পারে তা নিয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হলো। কক এবং গাফ্‌কি প্রায় খাওয়া দাওয়া ও ঘুম বাদ দিয়ে দিনরাত গবেষণার কাজ চালাতে লাগলেন। কিন্তু নিয়তির কি নির্মম পরিহাস। দুই গবেষক দল যখন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত তখন সেখান থেকে রাতারাতি কলেরা উধাও হয়ে গেলো। গবেষকদের মধ্যে কেউ তখনও নিশ্চিত ভাবে এ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করতে পারেননি। তাই মজার ব্যাপার দাঁড়াল যে, কলেরার আকস্মিক অন্তর্ধানে সেখানকার লোকেরা যেখানে খুশী হলো (এবং তাই হওয়া স্বাভাবিক) সেখানে এই

গবেষকদলের আপসোসের আর অন্ত রইলো না। ব্যাপারটা আরো বেদনা-দায়ক হয়ে দাঁড়ালো যে, ফ্রান্স এ অভিযানে দু'জন দক্ষ জীবাণু সন্ধানী বিজ্ঞানী রু (Roux) এবং থুইলারকে হারালেন। দুর্ভাগ্য, শেষের দিকে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁরা মারা গেলেন।

কক তাড়াতাড়ি বার্লিনে ফিরে কলেরা জীবাণুর যে সমস্ত নমুনা তিনি শক্তিশালী রঙে রাঙিয়ে এনেছিলেন সেগুলি পরীক্ষা করে দেখলেন এবং কমা চিহ্নের ( , ) মত এক প্রকার জীবাণুর সন্ধান পেলেন। সরকারকে তাঁর রিপোর্টে জানালেন যে, প্রত্যেকটি কলেরা রোগীর ক্ষেত্রে একই ধরনের জীবাণু তিনি লক্ষ্য করেছেন, তবে এগুলিই যে কলেরার কারণ সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। কাজেই নিশ্চিত ভাবে প্রমাণের জন্য যেখানে কলেরার প্রায়ই প্রাদুর্ভাব ঘটে, যেমন ভারতে, তাঁকে অনুগ্রহ করে পাঠানো হোক্। সরকার তাঁর এ অনুরোধ অনুমোদন করলেন এবং কক কলকাতায় এসে তাঁর গবেষণা শুরু করলেন।

শীঘ্রই তিনি রোগীর মৃতদেহে, তাদের জামা কাপড়ে, পানীয় জলে কলেরার জীবাণু আবিষ্কার করলেন, এমনকি সেই জীবাণুকে তিনি গোমাংসের সুপ ও জেলিতে গজিয়ে দেখালেন। এমনিভাবে যখন তিনি কলেরা জীবাণুর আকৃতি ও প্রকৃতি—তার আস্তানা এবং কি করে এই জীবাণু মানুষের দেহে সংক্রামিত হয়, বিস্তৃতি লাভ করে, সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উদ্ঘাটন করে দেশে ফিরলেন তখন তাঁকে দিগ্‌বিজয়ী সেনাপতির মত সংবর্ধনা জানানো হলো। প্রুসিয়ার সরকারও তাঁকে এক লক্ষ মার্ক পুরস্কার দিলেন।

পরীক্ষার সূত্রে কক যে সকল তথ্য আবিষ্কার করলেন সেগুলি হলো—কলেরার "কমা" জীবাণু—না খাওয়া পর্যন্ত কোনো সুস্থ ব্যক্তির কলেরা হতে পারে না। কলেরার জীবাণু আকস্মিক বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে জন্মে না—একমাত্র জীবাণু থেকেই তাদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে, কেবলমাত্র মানুষের পেটে কিংবা ভারতের দূষিত পানিতেই তারা বসবাস ও বংশ বৃদ্ধি করতে পারে। কিন্তু মজার ব্যাপার দাঁড়াল এত কিছু দেখে-শুনেও মিউনিকের বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক—পেটেন কোফার তা অবিশ্বাস করলেন। পেটেন কোফার

ককে তাঁর কলেরা জীবাণু পাঠাতে লিখলেন এবং এও জানালেন যে, কলেরা জীবাণু কত নির্দোষ তা তিনি প্রমাণ করে দেখাবেন। কক তাঁকে এক টেস্টটিউব ভর্তি 'কমা' জীবাণু পাঠালেন এবং পেটেন কোফার উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়ে সেই টিউব ভর্তি জীবাণুর সবটুকু খেয়ে ফেললেন! যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যখন গভীর উৎকণ্ঠায় পেটেন কোফারের হৃদয় বিদারক নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে লাগলেন, তখন পেটেন কোফার কি করে যে সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে সত্যি সত্যি ঠেকিয়ে রাখতে সমর্থ হলেন তা বিজ্ঞানীদের কাছে আজও এক পরম রহস্য! অবশ্য এতে পেটেন কোফারের যে অপমৃত্যু ঘটলো না—তা কিন্তু কখনও প্রমাণ করে না যে, কলেরার কারণ ঐ জীবাণু নয়। আজ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। পেটেন কোফারের মত স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নয়, অসাবধানে অনেক বিজ্ঞানী কলেরার জীবাণু খেয়ে মারা গেছেন। কিন্তু কি করে পেটেন কোফার নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেলেন —অনুক্ষণ আমাদের চারপাশে কত মারাত্মক রোগের জীবাণু তাদের মারণ জাল বিস্তার করে আছে—কিন্তু অনেকেই কি করে এমনি প্রতিকূল অবস্থাতেও বেঁচে থাকতে পারে তা আজও রহস্যাবৃত। যাহোক, ককের এই আবিষ্কারের পর থেকে জনস্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্য রক্ষার এক নূতন যুগের সূচনা হয়।

কক শুধু যে যক্ষার জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন তা নয়, এই রোগকে কি করে প্রতিরোধ করা যায় সে সম্পর্কেও গবেষণা করেছিলেন। যে তরল পদার্থে তিনি যক্ষার জীবাণু চাষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তিনি তার নাম দিয়েছিলেন টিউবারকুলিন। টিউবারকুলিন যক্ষা প্রতিরোধ করতে পারে এমন সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিলো, কিন্তু এর ফলাফল ভালভাবে পরীক্ষা করার আগেই বিজ্ঞানে জার্মানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য জার্মানীর কাইজার ককের এই আবিষ্কারকে অবিলম্বে প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কক অবশ্য ফলাফল সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাইজার তা করতে দেননি। তাই ১৮৯০ সালে ককের টিউবারকুলিনকে যক্ষা রোগের প্রতিষেধক বলে ঘোষণা করা হলো। দলে দলে রোগী আরোগ্যের আশায় জার্মানীতে আসতে লাগলো—কিন্তু আরোগ্য হওয়াতো দূরের কথা

মৃত্যুর হার আরও বেড়ে গেলো, আর ককের সুনামও এতে অনেক নষ্ট হলো। ব্যক্তি বিশেষের অহমিকা বা জাত্যাভিমান মানুষের বা জাতির কতটা যে ক্ষতি করতে পারে, হিটলারের সূত্রে জার্মানীর পতন এমনি আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টিউবারকুলিন যদিও যক্ষ্মার প্রতিষেধক হিসাবে কাজে লাগলো না, তবু আজও তা অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়। যক্ষ্মার আধুনিক প্রতিষেধক "বি, সি, জি" টিকা দেয়ার আগে কারো দেহে যক্ষ্মা সুপ্ত অবস্থায় আছে কিনা তা জানার জন্য এটি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

১৮৯১ সালে কক প্রমাণ করে দেখালেন যে কলেরা, টাইফয়েড রোগ জীবাণু দুষ্ট পানি ছাঁকন বা পরিস্রাবন (filtration) পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ করা যায় এবং এই বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করে পানিবাহী রোগ সমূহকে প্রতিরোধ করা সম্ভব। এই আবিষ্কারের পর থেকে সকল সভ্য দেশে পানীয় জল পরিস্রুত করার রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে।

১৯০৫ সালে চিকিৎসা শাস্ত্রে যুগান্তকারী আবিষ্কার করার জন্য কক নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন। যদিও তিনি যশ ও খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন—কিন্তু শেষ জীবনে পারিবারিক কারণে নানাবিধ লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করেন। এমির সঙ্গ তাঁকে সুখী করতে পারেনি তাই একদিন তাঁকে পরিত্যাগ করে যখন এক চিত্রতারকাকে বিয়ে করেন তখন সারা দেশে প্রতিবাদের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। অনেক পুরনো বন্ধুকে তিনি হারিয়েছিলেন—এমনকি এ ব্যাপারে দেশীয় সরকার পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। শেষ বয়সে তিনি শুধু নোবেল পুরস্কার এবং জাপানে আমন্ত্রিত হয়ে যে দুর্লভ সম্মান লাভ করেন তারই স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থেকে, ১৯১০ সালের ২৭শে মে, অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন।

পাস্তুর জীবাণু আবিষ্কারের অগ্রদূত হলেও ককই তাঁর নিখুঁত গবেষণার দ্বারা প্রমাণ করতে সক্ষম হন যে, কতক জীবাণু আমাদের পরম শত্রু। অ্যানথ্রাক্স, যক্ষ্মা, কলেরা প্রভৃতি মারাত্মক রোগের একমাত্র কারণ বিভিন্ন ধরনের জীবাণু। যদিও পাস্তুরের মত তাঁর গবেষণা বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত

ছিল না—নতুন জীবাণু আবিষ্কার ও রোগ প্রতিরোধ করণের মধ্যেই তাঁর গবেষণা সীমাবদ্ধ ছিল—তবু তিনিই সর্বপ্রথম জীবাণুকে সকলের দৃষ্টিগোচরে আনেন এবং পাস্তুরের জীবাণু তত্ত্বকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

অবশ্য এ সকল কাজ করতে গিয়ে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। পাস্তুরের মতই তিনি ছিলেন অক্লান্ত কর্মী। একথা তিনি নিজেও স্বীকার করে বলেছেন—"আমি সাধ্যমত কঠোর পরিশ্রম করেছি, যদি এমন হয় যে, অন্যের চেয়ে অধিক সাফল্য লাভ করেছি, তার কারণ আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে চলতে চলতে পথের ধারে সোনা কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। এই সাফল্য আমার কোনো বিশেষ মেধা বা কৃতিত্বের নয়। আমি মনে করি এই সাফল্য এসেছে নেহাত ভাগ্যের জোরে।"

কিন্তু "ভাগ্যের জোরে" তাঁর জীবনে সাফল্য এসেছে কথাটা কি ঠিক? গবেষণার কাজে তিনি যদি নিবিষ্ট না থাকতেন—অক্লান্ত পরিশ্রম না করতেন—তবে তিনি কি এই বিরাট সাফল্য লাভ করতে পারতেন কখনও? তাই ভাগ্য সম্পর্কে পাস্তুরের বিখ্যাত উক্তি—"যাদের মানসিক প্রস্তুতি রয়েছে ভাগ্য তাদেরকেই সাহায্য করে"—মনে হয়, পাস্তুরের মত ককের জীবনেও যেমন প্রযোজ্য তেমনি সত্য। অবশ্য ভাগ্যের কথাটা কিছু আসে বৈকি? ককের বিরাট সাফল্য—তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কারের পিছনে এমির দেয়া উপহারটির কি কোনো অবদান ছিল না?

একথা ঠিক যে, ককের গবেষণার কাজে এমি কোনো প্রেরণা যোগাতে পারেনি—এ কথাও সত্য যে এমির রুক্ষ আচরণে গবেষক ককের মনে অনেক গ্লানি জমেছিল—তাঁর গবেষণার কাজ অনেক ব্যাহত হয়েছিল—তবু ককের জীবন কথা পড়তে গেলে—তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারগুলির সাথে পরিচিত হতে গেলে, এমির কথা যেন অনেক সময়ে মনে উদয় হয়, ভাবনা দাঁড়ায়,—এমি যদি ককের এক জন্মদিনে তাঁকে ঐ মন ভোলানো মাইক্রোসকোপটি উপহার না দিতেন, তবে তিনি কি তাঁর জীবনে এমন অক্ষয় কীর্তি রেখে যেতে পারতেন?

---

# ডিপথেরিয়ার জীবাণু ও তার প্রতিষেধক আবিষ্কার
## ( লোফ্‌লার, এমিল রু ও এমিল বেরিং )

রবার্ট কক যখন যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কার নিয়ে খুবই ব্যতিব্যস্ত, তখন তাঁর ডান পাশে বসে, বার বার তাঁর উদ্ধত গোঁফকে বশে এনে, যিনি অণুবীক্ষণে জীবাণু সন্ধান করতেন—তিনি হলেন—ফ্রেড্‌রিক লোফ্‌লার ( Friedrich Löffler )। ১৮৮০ সালের প্রথম দিকে এই জার্মান বিজ্ঞানী মারাত্মক ডিপথেরিয়া রোগের কারণ অনুসন্ধানে মত্ত হয়ে ওঠেন। ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে তখন অনেক শিশুই মারা যেত। তাছাড়া আগেও একশো বছর পর পর এই রোগের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যেত। হাসপাতালগুলিতে দেখা যেত, সারি সারি, ছোট ছোট সাদা বালিশের মধ্যে কচি কচি শিশু কেবলই ঘড় ঘড় করে কাসছে। এ হলো তাদের দম বন্ধ হয়ে আসার আগের লক্ষণ। ফুলের মত শুভ্র-শুচি, কোমল মুখগুলি যেনো কোনো এক অদৃশ্য নিষ্ঠুর হাতের নিষ্পেষণে নীল হয়ে গেছে—ডাক্তাররা ছুটাছুটি করছেন এদিকে ওদিকে—হয়তোবা বৃথাই তাঁরা এই হতভাগ্য শিশুদের বদ্ধ শ্বাসনালীতে বাতাস ঢোকাবার চেষ্টা করছেন—অবশ্য তা ছাড়া তখন তাঁদের আর করণীয়ও কিছু ছিল না। এতে যারা বেঁচে যেতো, বলা যেতে পারে, তারা ছিল সত্যই ভাগ্যবান, কেননা, সেকালে প্রতি দশটি এমনি রুগ্ন শিশুর মধ্যে পাঁচটিরই হত অকাল মৃত্যু।

এমনি এক হাসপাতালের শব ঘরে লোফ্‌লারকে দেখা যেত বেশ ব্যস্ত সমস্ত—মৃত শিশুদের গলা থেকে নির্বীজিত করা ছুরি এবং প্লাটিনাম তারের সাহায্যে তিনি সামান্য একটু ধূসর রঙের জিনিস তুলে নিচ্ছেন—হয়ত ভরছেন ছোট ছোট টেস্টটিউবে—কিংবা বিশেষ রঙে রাঙিয়ে সেগুলিকে

পরীক্ষা করছেন অণুবীক্ষণে। এমনি রঙে রাঙা যে জিনিসগুলিকে তিনি পরীক্ষা করছেন তার সবগুলিতেই তিনি কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ঠিক একই ধরনের এক প্রকার জীবাণু। কয়েকদিন ধরে পরীক্ষা করে যখন তিনি প্রত্যেকটি মৃত শিশুর গলায় ঠিক একই ধরনের এক বিশেষ জীবাণু দেখতে পেলেন—তখন তিনি ডিপথেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছেন ভেবে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে সে কথা ককের কাছে প্রকাশ করলেন। কক কিন্তু তাঁর এমন উচ্ছ্বাসে প্রথমেই বাধা দিয়ে বললেন—"বৎস! এখনই এতটা উল্লসিত হওয়ার সময় তোমার আসেনি! এই জীবাণুকে তোমাকে এখন বিশুদ্ধ ভাবে গজাতে হবে—তারপর তা দিয়ে কোনো পশুর উপর পরীক্ষা চালাতে হবে—এখন সেই সব পশুর দেহে যদি ঠিক মানুষের মত ডিপথেরিয়া দেখা দেয়—তবেই হ্যাঁ,—একমাত্র তখনই বলা যাবে, তুমি ডিপথেরিয়ার জীবাণু আবিষ্কার করেছো, অন্যথায় নয়।"

ককের কথায় লোফ্‌লার একের পর এক ডিপথেরিয়ার মৃত শিশু পরীক্ষা করলেন—দেহের বিভিন্ন অংশের ছোট ছোট টুকরোকে রঙে রাঙিয়ে অণুবীক্ষণে দেখতে লাগলেন—অন্যদিকে বিশুদ্ধভাবেও গজালেন এই বিশেষ জীবাণু। লোফ্‌লার কিন্তু লক্ষ্য করলেন এক আশ্চর্য ব্যাপার! শুধু মাত্র গলার ঝিল্লি ছাড়া দেহের আর কোথাও এই জীবাণুকে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায় না—তাছাড়া সবচেয়ে আরো যা আশ্চর্যের দাঁড়ালো—তা হলো এই যে, দু'একটি মৃত শিশুর গলার ঝিল্লিতেও তিনি এই জাতীয় জীবাণুর কোনো চিহ্নও খুঁজে পেলেন না। ব্যাপারটি তাই যেমন অদ্ভুত, তেমনি বিস্ময়কর, কিন্তু তবুও লোফ্‌লার ককের উপদেশ মতই কাজ চালিয়ে গেলেন। গজানো বিশুদ্ধ জীবাণু দিয়ে তিনি কয়েকটি খরগোশের শ্বাস নালীতে, গিনিপিগের শরীরে চামড়ার নিচে ইন্‌জেকশন দিলেন। ডিপ-থেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুর মতই এগুলি দু'তিন দিনের মধ্যে—কোনো কোনোটি বা তার আগেই মারা গেলো। কিন্তু যেখানে ডিপথেরিয়ার জীবাণু ঢোকানো হয়েছিল একমাত্র সেই জায়গাটি ছাড়া দেহের মধ্যে আর কোথাও সে জীবাণুর কোনো খোঁজ পাওয়া গেল না, এমনকি কোনো কোনোটির দেহের সে অংশও দেখা গেল সম্পূর্ণ জীবাণু শূন্য। আবার

কোনো কোনোটির দেহের নির্দিষ্ট স্থানটিতে জীবাণুর সন্ধান পাওয়া গেলেও সংখ্যায় তারা এতই নগন্য আর এতটাই দুর্বল যে, তাদের পক্ষে একটি মাছিকেই ঘায়েল করা সম্ভবপর ছিল কিনা সন্দেহ !

লোফ্‌লারের তাই ভাবনা দাঁড়ালো—এই জীবাণুই যদি সত্যিকার ভাবেই ডিপথেরিয়ার কারণ হয়, তবে তারা জীবদেহের একটি মাত্র স্থানে অবস্থান করে—কি করে তাদের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ বড় একটি প্রাণীকে মরণবাণ হানতে পারে? গবেষণার ফলাফল তাই তেমন উৎসাহব্যঞ্জক দাঁড়ালো না। কাজেই ডিপথেরিয়ার কারণ সম্পর্কে এক প্রবন্ধে বলতে গিয়ে একথাই তিনি শুধু উল্লেখ করলেন— "ডিপথেরিয়ার কারণ হয়তবা এই জীবাণু। তবে এও সত্য যে, এই রোগে মৃত কয়েকটি প্রাণীর দেহে এই জীবাণু আমি খুঁজে পাইনি। যে সকল প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে তাদের মধ্যে কোনোটিকেও আমি ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুর মত পক্ষাঘাতে পঙ্গু হতে দেখিনি। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এবং যে তথ্যটি এই সম্ভাব্য জীবাণু ঘটিত কারণের চরম বিরুদ্ধে যাবে, তা হল এই যে—যে জীবাণু খরগোশ বা গিনিপিগের পক্ষে মারাত্মক, সেই জীবাণুকে আমি একটি শিশুর গলায় দেখতে পেয়েছি—অথচ আশ্চর্য, সেই শিশুটির মধ্যে ডিপথেরিয়ার কোনো লক্ষণই আমি প্রকাশ পেতে দেখিনি।"

প্রবন্ধের পরিশেষে অবশ্য যে সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন —তা তিনি নিজেই পরীক্ষা করে, যাচাই করে দেখতে পারতেন—কিন্তু কেন যে তিনি তা করেননি—সেটাই আশ্চর্য! কেননা, লোফ্‌লারের মত অত্যুৎসাহী, নিষ্ঠাবান এবং নিখুঁত গবেষকের নজির খুব কমই মেলে বিজ্ঞান মহলে। অথচ আশ্চর্য, যে সম্ভাবনার কথা তিনি উল্লেখ করলেন তা এক-বারের মতও পরীক্ষা করে দেখলেন না পর্যন্ত। শুধু এটুকু বলেই বিরত হলেন—"এই জীবাণু শিশুদের গলায়, মৃত টিস্যুর (tissue) মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র এক অংশে অবস্থান করে। গিনিপিগের দেহত্বকের তলে সামান্য জায়গা জুড়ে বসবাস করে,—কোনো প্রাণীর সারা দেহে লাখে লাখে তারা ছড়িয়ে পড়ে না। অথচ আশ্চর্য এতেই প্রাণীর প্রাণনাশ ঘটে। কাজেই মনে হয়, এই জীবাণু নিশ্চয়ই কোনো বিষাক্ত দ্রব্য নিঃসরণ করে—যা প্রাণীর

প্রাণ ধারণের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলিকে শেষাশেষি সম্পূর্ণ রূপে বিকল করে দেয়। মৃত শিশু কিংবা গিনিপিগের দেহে—অথবা যে মাধ্যমে এই জীবাণু ভাল গজায়—তার মধ্যে সন্ধান করলে এই বিষাক্ত দ্রব্যকে হয়ত খুঁজে পাওয়া যাবে। এবং যিনি তা খুঁজে বের করতে পারবেন—তিনিই এই তথ্যটিকে প্রমাণ করতে সমর্থ হবেন যে, ডিপথেরিয়ার কারণ এই বিষ—তথা এই জীবাণু—যা প্রমাণ করতে আমি ব্যর্থ হলাম।"

লোফ্‌লারের এই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করতে এরপর যাঁরা এগিয়ে এলেন তাঁরা হলেন এমিল রু (Roux) এবং এমিল বেরিং (Behring)। অবশ্য এঁদের সাথে ইয়ারসিনের নামও করতে হয়—যিনি রু'কে তাঁর গবেষণার কাজে সাহায্য করেছিলেন।

কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার যে সঠিক বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার চিরাচরিত ধারা অনুসারে আবিষ্কৃত হয়েছে এমন নয়। অনেক বড় বড় আবিষ্কার আকস্মিক ভাবেই আবিষ্কৃত হয়েছে। যুগান্তকারী পেনিসিলিন, এক্সরে, সর্বপ্রথম কৃত্রিম রঙ—মভ, চিনির চেয়েও বহুগুণ মিষ্টি —স্যাকারিন প্রভৃতির আবিষ্কার—তার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। কোথাওবা একটিকে আবিষ্কার করতে গিয়ে কল্পনাতীত অন্য কোনোটি আবিষ্কৃত হয়েছে কিংবা অন্ধের মত হাতড়াতে হাতড়াতে হয়ত হাতে এসেছে সাফল্যের চাবিকাঠি। এমনি অন্ধের মতই রু'কে পথ চলতে হয়েছে লোফ্‌লারের অসম্পূর্ণ কাজ শেষ করতে। তাঁর আগে কোনো বিজ্ঞানীই জীবাণু নিঃসৃত দ্রব্যকে কখনও পৃথক করেননি। রু এবং ইয়ারসিনই ছিলেন সে পথের প্রথম পথিক। অবশ্য সফল তাঁরা হয়েছিলেন, দীর্ঘদিন নানা বাধা বিপত্তি কাটিয়ে, অন্ধকার পথ পেরিয়ে অবশেষে তাঁরা অবতীর্ণ হয়েছিলেন সাফল্যের আলোক তীর্থে। কিন্তু কি করে? শত শত নিরীহ প্রাণী বধ করে! সত্যি বলতে কি—এ বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানের অনুসৃত কোনো পথ বা রীতি নয়—এ যেন এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ,—নির্মম জীব হত্যার এক নিষ্ঠুরতম যজ্ঞ।

যাহোক, লোফ্‌লারের ধারণাটাই যেন ঠিক বলে ঠাঁই পেলো রু'-এর মনে। তিনিও ভাবলেন শিশুদের গলার পাতলা পর্দার মধ্য দিয়ে এই জীবাণুরা

যেমন জীবের রক্তস্রোতে বিষ মিশিয়ে দেয়—তেমনি করে গজানো জীবাণুরাও নিশ্চয়ই জীবাণু চাষের মাধ্যমের মধ্যে বিষ ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু কি করে তা প্রমাণ করা যাবে, বিশেষ করে, প্রমাণের পথ যেখানে নিতান্তই অজানা? তবু এই অজানা, অজ্ঞাত পথেই কাজ শুরু হলো। কতকগুলি বড় বড় বোতলে জীবাণু শূন্য মাধ্যমের মধ্যে রু কিছু ডিপথেরিয়ার জীবাণু ছেড়ে দিলেন এবং চারদিন ধরে ইনকুবেটরে রেখে সেগুলিকে ভাল ভাবে গজানোর সুযোগ দিলেন। এখন এই জীবাণু চাষের মাধ্যম থেকে জীবাণুদের উৎপাদিত বিষকে পৃথক করার পালা। তাই তৈরি করা হলো এক বিচিত্র ধরনের পোরসেলিনের ছাঁকনি—ভেতরটা ফাঁপা, দেখতে অনেকটা মোমবাতির মত। এই পোরসেলিনের তৈরী বিশেষ সূক্ষ্ম ছাঁকনির মধ্য দিয়ে শুধু জীবাণুর বিষই নিঃসৃত হবে—জীবাণু নয়। অতি সাবধানে জীবাণু চাষের মাধ্যমটিকে যখন ছাঁকনিতে ঢালা হলো তখন এক ফোঁটা রসও কিন্তু নির্গত হলো না সেই ছাঁকনি দিয়ে। শেষে অবশ্য তার একটা উপায় করা হলো। ছাঁকনির উপরে খানিকটা বায়ু চাপের সৃষ্টি করে যাহোক কিছুটা সোনালী রঙের তরল দ্রব্যকে ছোট ছোট ফ্লাস্কে সংগ্রহ করা গেলো। এখন এই রস সত্যি সত্যি বিষাক্ত কিনা তার পরীক্ষা প্রয়োজন। সারা ল্যাবরেটরি জুড়ে তাই বিরাজ করতে লাগলো কর্মব্যস্ততা। সহকারীরা কতকগুলি খরগোশ এবং গিনিপিগকে ঠিকঠাক করলেন এই বিষ দেবার জন্য আর রু এই সমস্ত প্রাণীদের পেটে সেই সোনালী রসের ইনজেকশন দিলেন একের পর এক।

অবশ্য এই ইনজেকশন দেবার উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। সাধারণতঃ প্রাণী-দেহে ইনজেকশন দেয়া হয় সেই প্রাণীর কল্যাণের জন্য—তার কোনো রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। কিন্তু এখানে প্রাণীকে রোগ মুক্ত করার জন্য ইনজেকশন দেয়া নয়—বরঞ্চ রোগ সৃষ্টি করে তাকে মেরে ফেলার জন্য। তাই রু প্রত্যহ সকালে এই প্রত্যাশা নিয়েই হাসপাতালে তাদের দেখতে আসতেন যে, তাঁর পরীক্ষাধীন প্রাণীগুলি মরে পড়ে আছে—না হোক অন্ততঃ তাদের দেহের লোমগুলি কুঁচকে গেছে—পিছনের পা টেনে টেনে তারা হাঁটছে—আর কঠিন শীতে তারা যেন থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু

কী আশ্চর্য, প্রত্যাশা তার পূর্ণ হয় না কোনোদিন—পরিবর্তে তাঁকে পরিহাস করার জন্যই প্রাণীগুলি যেন দিব্যি খায় দায়—নেচে বেড়ায়—এমনকি বংশ বৃদ্ধিও করে চলে নির্বিঘ্নে।

দৈনন্দিন এমনিভাবে রু যতই আশাহত হন ততই তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—তাই একদিন ইয়ারসিনকে ডেকে তিনি আরও এক নিষ্ঠুর নির্দেশ দিলেন। বললেন—"বেশী বেশী খাবার খেয়ে বড্ড বাড় বেড়েছে এদের বুঝলে ইয়ারসিন? কাজেই অল্প বিষে কাজ হবে না—তুমি আরো—আরো বিষ দাও এদের।" দ্বিধাহীন কণ্ঠের এক কঠিন নির্দেশ—কিন্তু কী নির্মম! প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলার জন্যই যেন তাঁরা তখন মরিয়া—এগুলি মরলেই যেন তাঁদের স্বস্তি, তাঁদের শান্তি। কিন্তু একি উন্মাদনা তাঁদের? সত্যিই তাঁরা তখন বিজ্ঞানী না খুনী?

যাহোক, আরও বিষ ঢোকানো হলো এদের দেহে, কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটলো না কিছুই—বিষের এই পরিমাণ বৃদ্ধিতেও তারা দিব্যি বেঁচে রইলো। কাজেই জিনিসটি যে নির্বিষ সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ কোথায়? আর তেমন ভাবাটাইতো স্বাভাবিক। কিন্তু রু যেন সে সময়ে সত্যই প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। আবার এও ঠিক যে, রু এ সময়ে এমনি অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক মহামূল্য আবিষ্কার তাঁর দ্বারা এমনিভাবে সম্ভব হয়েছিল—আর এজন্য প্রত্যেক মা ও শিশুর কর্তব্য হবে—তাঁর কাছে চিরঋণী, চিরকৃতজ্ঞ থাকা। এই আবিষ্কারের ফলে কত অসংখ্য শিশু যে মারাত্মক ডিপথেরিয়ার কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে এবং আজও পাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই—আবার এই আবিষ্কারের সূত্রেই এই মারাত্মক ব্যাধিকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় দেবার কথাও আজ আমরা ভাবতে পারছি। রু যেন সেদিন পাস্তুরের মতই পাগলামীতে, সৃষ্টি ছাড়া ভাবনায় উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন, যে উন্মাদনার মুহূর্তে মানুষ ভাবে পৃথিবীর আর সকলেই ভুল—তারা যা জানে তা অসত্য—এবং তাদের সেই অসত্যতা প্রমাণের জন্য অসাধারণ, অদ্ভুত, এমনকি উদ্ভট পরীক্ষা চালাতেও সে বিন্দু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। রু-এর তখন একমাত্র কামনা এই জীবাণু চাষের মাধ্যমে থাকে যেন কোনো বিষ, আর সেই বিষ বিনষ্ট করুক এই প্রাণীগুলিকে। তবেই

তাঁর আশা যেন পূর্ণ হয়, তবেই তিনি যেন পরিতৃপ্ত হন। এবং এই
প্রত্যাশা যদি পূর্ণ হয় তবে জানা যাবে ডিপথেরিয়ার সঠিক কারণটি—তবেই
জানা যাবে শত শত শিশুর এই রোগে কেন ঘটে অপমৃত্যু।

রু যেন পাগলের মতই একের পর এক এই প্রাণীগুলির দেহে প্রবেশ
করাতে লাগলেন—সেই সোনালী রস এবং এমনি ভাবে অন্ততঃ ৩৫ সি,সি'র
মত সেই বিষ প্রবেশ করানো হলো এই সমস্ত ভাগ্যাহত, নিরীহ প্রাণীর
দেহে। কিন্তু তাঁর এই কাণ্ড কারবারকে নেহাত্‌ই এক বুদ্ধিভ্রষ্ট, ক্ষ্যাপামী
ছাড়া আর কী আখ্যা দেয়া যেতে পারে? এই পরিমাণ খাবার পানিও যে
এইসব প্রাণিদেহে বিপর্যয় ঘটায়—অনিবার্য করে তোলে তাদের অপমৃত্যু?

কিন্তু আশ্চর্য, রু-এর এ ব্যাপারে যতটাই পাগলামী প্রকাশ পাক না
কেন—পরিশেষে এতেই আসলো তাঁর জীবনের চরম সাফল্য—সার্থক হলো
তাঁর এতদিনের কঠিন পরিশ্রম, তাঁর সাধনা, তাঁর তিতিক্ষা। মাত্র আটচল্লিশ
ঘন্টার মধ্যেই প্রাণীগুলির দেহের লোম খাড়া হয়ে উঠলো—শ্বাস প্রশ্বাসে
শোনা যেতে লাগলো হিক্কার মত শব্দ এবং প্রাণীদেহে জীবন্ত জীবাণু প্রবেশ
করালে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, অবিকল সেগুলিই প্রকাশ পেয়ে, পাঁচ
দিনের মধ্যেই সেগুলি মারা গেল। কাজেই দেখা যায়, রু-এর সেই ক্ষ্যাপামী
বা পাগলামী—তা যাই হোক না কেনো—তাইতেই আবিষ্কৃত হলো
ডিপথেরিয়ার মূল কারণ—ডিপথেরিয়ার জীবাণু যে বিষের সৃষ্টি করে সেই
বিষের কারণেই এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় প্রাণী—সেই বিষের
প্রতিক্রিয়াতেই তারা মারা পড়ে।

কিন্তু কে বিশ্বাস করবে এই কথা? বিশ্বাস করাতো দূরের কথা—
ব্যাপারটি যেন সত্যই হাস্যাস্পদ। এক বিরাট বোতল পূর্ণ জীবাণু যদি এমন
সামান্য পরিমাণ বিষের সৃষ্টি করে—ক্ষুদ্রকায় এক গিনিপিগকে মারতে গিয়ে
যদি সেই বিরাট বোতলের প্রায় সবটুকু জিনিসই শেষ হয়—তবে সামান্য
কয়েকটি জীবাণু শিশুদের গলায় বসবাস করে কি করেই বা তারা এত প্রচুর
পরিমাণে বিষের সৃষ্টি করে—যার ফলে স্বল্প কালের মধ্যেই মারা পড়ে এক
মানব শিশু?

অবশ্য কেউ বিশ্বাস করুক বা না করুক রু-এর কাছে এর কারণটা যেন
কিছুটা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিলো। তাঁর মনে হলো—এই জীবাণু পূর্ণ বোতল-

গুলিকে হয়ত বেশীদিন ইনকুবেটরে না রাখার জন্য, তেমন বেশী পরিমাণে বিষের সৃষ্টি হয়নি—এবং এই অল্পতার জন্যই হয়ত তেমন কার্যকরী হতে পারেনি এই বিষ। জীবাণুগুলিকে তাই তিনি মানুষের দৈহিক তাপের সমান উষ্ণতায় ৪২ দিন ধরে গজালেন—এবং চাষের মাধ্যম থেকে এরপর তিনি যে বিষাক্ত রস উদ্ধার করলেন—দেখা গেলো, পরীক্ষাধীন প্রাণীগুলির পক্ষে তা সত্যই মারাত্মক। এমনকি সামান্য পরিমাণ এই রস এতটাই উগ্র, এতটাই বিষাক্ত হতে দেখা গেলো যে, কার্যকরী মাত্রার ন্যূনতম পরিমাণ ঠিক করাও যেন কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। গিনিপিগ, খরগোশ, কুকুর, ভেড়া সকলেই কাবু হলো এই বিষের কাছে।

এরপর রু এই জীবাণুর বিষটিকে শুকিয়ে সেটির আণবিক গঠন নির্ণয় করতে চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু সফল হতে পারলেন না। দ্রব্যটিকে এভাবে সনাক্ত করা যখন সম্ভব হলো না, তখন সেটিকে ঘন এবং তার উপযুক্ত মাত্রা ঠিক করে প্রাণীর ওপর পরীক্ষা চালালেন। দেখা গেল, এই ঘন জিনিসটার—মাত্র এক আউন্স ৬ লক্ষ গিনিপিগ কিংবা ৭৫ হাজার কুকুরকে অনায়াসে মারতে পারে—প্রাণিদেহে সেই অবস্থারই সৃষ্টি হয়—সেই লক্ষণগুলিই প্রকাশ পায়—যা ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত কোনো শিশুর ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এ সকল পরীক্ষা থেকে তাই নিশ্চিতভাবেই প্রমাণিত হলো যে—ডিপথেরিয়ার জীবাণু দেহের মাত্র একটি অংশে অবস্থান করে,—যে মারাত্মক বিষের সৃষ্টি করে তাই হলো ডিপথেরিয়া রোগের কারণ আর এই বিষের মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার জন্যই প্রতি বছর শত শত মানব শিশু অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত ডিপথেরিয়ার কারণ যদিওবা জানা গেলো কিন্তু তার প্রতিবিধানের কোনো পন্থা সঙ্গে সঙ্গেই জানা সম্ভব হলো না। রু পাস্তুরের মত বেপরোয়া ছিলেন বটে, তবে পাস্তুরের মত তাঁর প্রতিভা ও ধৈর্য ছিল না। তাই ডিপথেরিয়ার কারণটিই তিনি শুধু আবিষ্কার করলেন—প্রতিবিধানের কোনো উপায় তিনি উদ্ভাবন করতে পারলেন না। অবশ্য এই রোগের কারণ এবং তার প্রতিবিধান সম্পর্কে অন্যত্রও কাজ চলছিল—তাই এর পরবর্তী সাফল্য আসলো জার্মানীর রাজধানীর বুকে, বার্লিনে—

আর এই সাফল্যের গৌরব যিনি অর্জন করেছিলেন তিনি হলেন এমিল বেরিং (Emil Behring)।

এমিল বেরিং

বেরিং ছিলেন রবার্ট ককের শিষ্য এবং এক সময়ে তিনি "রবার্ট কক ইন্সটিটিউট"—এ কাজ করেছিলেন। বিজ্ঞানী হলেও বেরিং-এর মনটি ছিল কাব্যিক। একদিকে তাই তিনি যেমন প্রাণীদের অনাক্রম্যতা (immunity) সম্পর্কে অনুসন্ধান করতেন, তেমনি তাঁর গুরু রবার্ট ককের আবিষ্কৃত যক্ষ্মার জীবাণুকে রাঙিয়ে তার সাথে তুলনা করতেন সূর্য কিরণে রাঙানো সেই সুইজারল্যাণ্ডের তুষারাচ্ছন্ন গিরি শৃঙ্গের—যে অপরূপ দৃশ্যটি ছিল তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। নিউমোনিয়ার উগ্র লক্ষণগুলির মধ্যে তিনি যেমন নৃত্যরতা পাহাড়ী ঝরণার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে বিমুগ্ধ ও বিহ্বল হতেন—তেমনি আগ্রহ ও উৎসাহ ভরেই সন্ধান করতেন ইঁদুরের দেহে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর ধ্বংসকারী অজানা রহস্যময় দ্রব্যের। এক কথায় কাব্য ও বিজ্ঞান দুইই ছিল তাঁর সমান প্রিয়। তাঁর ধারণা ছিল যে, রক্ত জীবদেহের এক প্রবহমান পরমাশ্চর্য সঞ্জীবনী পদার্থ। তিনি বিশ্বাস করতেন—নিশ্চয়ই এমন কতকগুলি

রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে—যা জীবদেহকে অক্ষত রেখেই দেহস্থ জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে—আর এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি একদিন এমন এক রাসায়নিক দ্রব্যের সন্ধানে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন যা ডিপথেরিয়ার জীবাণুকে দেহকে অক্ষত রেখেই ধ্বংস করতে সক্ষম। গিনিপিগের দেহে তাই তিনি ঢোকাতে লাগলেন ডিপথেরিয়ার জীবাণু—আর এগুলি যখন অসুস্থ হলো ডিপথেরিয়ায়, তখন তাদের দেহে তিনি ইনজেকশন দিতে লাগলেন ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ—দামী সোনা থেকে তৈরী লবণ থেকে শুরু করে স্বল্প দামী এবং সাধারণ দ্রব্য পর্যন্ত যাদের সংখ্যা হবে ত্রিশটিরও বেশী। কিন্তু সব কিছুই নিষ্ফল হলো। অবশ্য বহুবারের ব্যর্থতাতেও বিশ্বাস তাঁর টললো না—তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, যে রাসায়নিক দ্রব্য টেস্টটিউবকে অক্ষত রেখে তার মধ্যকার জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে—জীবদেহকে অক্ষত রেখে তা দেহস্থ জীবাণুকেও ধ্বংস করতে পারে। তাই চললো আরো পরীক্ষা—আরো নিরীহ পশু-নিধন যজ্ঞ। এমনি এক পরীক্ষায় বেরিং একদিন ব্যবহার করলেন আয়োডিন ট্রাইক্লোরাইড নামক এক রাসায়নিক পদার্থ—আর তার ফল ফললো অপ্রত্যাশিত। ইনজেকশন দেবার একদিন পর দেখা গেল প্রাণীগুলি ক্রমেই যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। খোঁচা দিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন—এরা পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারে কিনা। যদি পারে তবে বুঝতে হবে, এখনও এদের জীবনের আশা আছে। কিন্তু কোন্ ধরনের এ পরীক্ষা? এ যেন তেমনি এক চিকিৎসার মত—যেখানে চিকিৎসক জানেন না তার চিকিৎসায় রোগী বাঁচবে, কি মরবে—অথচ তিনি চিকিৎসা করে চলেছেন! এমন পরীক্ষা কি কখনও সমীচীন, না যুক্তিসঙ্গত? কিন্তু তবুও একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এমনি রীতি বিরুদ্ধ পথ ধরেই এসেছে অনেক যুগান্তকারী, অনেক কল্যাণকর আবিষ্কার—যা সনাতন রীতি-নীতির পথে চলে কোন কালে সম্ভব হতো কিনা সন্দেহ!

যাহোক, পরীক্ষাধীন প্রাণীগুলি বেরিং-এর খোঁচায় ক্রমেই ক্ষীণভাবে সাড়া দিতে লাগলো—বোঝা গেল—এদের জীবনের আর কোনো আশা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য! একদিন সকালে দেখা গেল এমনি মরোণোন্মুখ গিনিপিগগুলি তাদের নড়বড়ে পা নিয়ে এদিক ওদিক চলাফেরা করছে—

জীর্ণ, শীর্ণ, অতি বিশ্রী যদিও তাদের চেহারা কিন্তু রোগ তাদের সেরে আসছে—অথচ তাদেরই সঙ্গী সাথীরা—যাদের দেহে দেয়া হয়েছে শুধুমাত্র জীবন্ত জীবাণু—দেয়া হয়নি এই আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইড—তারা আগেই মারা গেছে। আশ্বাসে ও আনন্দে ভরে গেলো বেরিং এর বুক। বলে উঠলেন—"যাক্, এতদিনে পাওয়া গেল ডিপথেরিয়ার ঔষধ।"

এবার দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন—অসুস্থ গিনিপিগ-গুলিকে সুস্থ করার জন্য তিনি প্রয়োগ করতে লাগলেন এই আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইড। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরীক্ষায় নিশ্চিত ভাবে কিছু জানবার সুযোগ হলো না। দেখা গেলো, কখনও ডিপথেরিয়ার জীবাণু—কখনও বা এই ঔষধটিই কোনো প্রাণীর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে—কদাচিৎ কোনোটি হয়ত বেঁচে উঠেছে—পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। তাই কি করে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, এই ঔষধটি বস্তুতঃই কার্যকরী? তাছাড়া-যে প্রাণীগুলি বেঁচে ওঠে তাদের দেখলে মনে হয়—মরণই তাদের ছিল ভাল। কেননা, এই আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইডকে যদি ডিপথেরিয়ার ঔষধ হিসাবে ধরেও নেয়া যায় তবে তার প্রয়োগে বিপদ রয়েছে। এই ঔষধে প্রাণীদেহে সৃষ্টি হয় এক তীব্র যন্ত্রণাদায়ক বিশ্রী গভীর ক্ষত আর এই ঘা নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সময় কোনো কিছুর সাথে যদি তার ধাক্কা লাগে তবে প্রাণীগুলি যেন মরণ চিৎকার দিয়ে ওঠে—সে এক মর্মভেদী, হৃদয়বিদারক দৃশ্য! অন্যদিকে আবার এমনও দেখা গেল যে—দু'একটি গিনিপিগ যাদেরকে আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইড না দিলে ডিপথেরিয়ায় নিশ্চয়ই মারা যেত—আশ্চর্য তারা তা ব্যতিরেকেই বেঁচে উঠেছে। কিন্তু আরো আশ্চর্যের যে, ঔষধের কার্যকারিতা যেখানে এমনি অনিশ্চিত সেখানে বেরিং কি করে তা রুগ্ন শিশুদের উপর পরীক্ষা করতে সাহসী হলেন? তাই মনে হয়, জগতে এমন এক শ্রেণীর লোক থাকে যাঁরা কোনো কিছুর পরিণাম সম্পর্কে ততটা মাথা ঘামান না—সত্যকে জানার জন্য তাঁরা যেন বেপরোয়া। তাই একটি প্রাণীকে বাঁচানোর জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা আর এক নিরীহ প্রাণীকে, এমনকি মানুষকে মারতেও যেন দ্বিধা বোধ করেন না!

ফলাফলের কথা চিন্তা না করেই কয়েকটি রুগ্ন শিশুর উপর বেরিং তাই তাঁর আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইড দিয়ে পরীক্ষা বা চিকিৎসা শুরু করলেন—কিন্তু উৎসাহব্যঞ্জক তেমন কিছুই পাওয়া গেল না। তবু বেরিং-এর সন্দেহ ঘোচে না—নিঃসংশয় হতে পারেন না তিনি কিছুতেই। কি করে তিনি উপেক্ষা করবেন সেই ঘটনাকে, মন থেকে মুছে ফেলবেন সেই ব্যাপারটাকে? কয়েকটি গিনিপিগ, হতে পারে তারা দুষ্ট ক্ষতে ক্লিষ্ট হয়েছে—জীর্ণ, শীর্ণ হয়েছে—কিন্তু তারাতো মারাত্মক ডিপথেরিয়াকে পরাভূত করেছে—মুক্তি পেয়ে বেঁচে উঠেছে মারাত্মক এই রোগের কঠিন হাত থেকে?

বেরিং-এর এই যাবতীয় পরীক্ষায় তাই সমাধান হলো না কিছুই, বরঞ্চ তিনি সম্মুখীন হলেন এক কঠিন প্রশ্নের—এক দুরূহ সমস্যার। এই সমস্যা, এই ভাবনা চিন্তার মধ্যে সহসা তাঁর মনে হলো—"তবে কি রোগ মুক্ত এই গিনিপিগগুলি ডিপথেরিয়ার প্রতি অনাক্রম্যতা গড়ে তুলেছে?" শুরু হলো আবার পরীক্ষা—আর দেখা গেলো ব্যাপারটি ঠিক তাই। ডিপথেরিয়ায় ভুগে যে প্রাণীগুলি বেঁচে উঠেছে তাদের শরীরে ডিপথেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়ে দেখা গেলো—তাদের কিছুই হলো না—ডিপথেরিয়া হওয়াতো দূরের কথা, তাদের দেহের একটি লোমও খসে পড়লো না। অথচ যে পরিমাণ জীবাণু এক একটির দেহে ঢোকানো হয়েছিল—তা অন্ততঃ ১২টি সুস্থ প্রাণীকে মেরে ফেলার জন্য ছিল যথেষ্ট।

বেরিং রাসায়নিক পদার্থের উপর আস্থা হারালেন বটে—তবে এ বিশ্বাস তাঁর গেল না যে, জীবদেহে প্রবহমান রক্তধারা এক পরমাশ্চর্য পদার্থ। তাই ভাবলেন—নিশ্চয়ই এ সকল গিনিপিগের রক্তের সিরামে এমন কিছু রয়েছে—যা ডিপথেরিয়ার প্রতি তাদের অনাক্রম্যতা গড়ে তুলেছে। সিরিঞ্জ দিয়ে এ সকল গিনিপিগের ধমনী থেকে কিছু রক্ত বের করে নিয়ে তিনি সিরাম তৈরি করলেন—আর সেই সিরামের সাথে মেশালেন ডিপথেরিয়ার জীবাণু। ভেবেছিলেন জীবাণুগুলি মারা পড়বে। কিন্তু অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করে তাঁকে নিরাশ হতে হলো। জীবাণুগুলি মরা তো দূরের কথা—তাকে বিদ্রূপ করার জন্যই যেন তারা দলে দলে নেচে চলেছে—আরো উৎসাহ ভরে যেন বংশ বৃদ্ধির কাজে মেতে উঠেছে। রু প্রমাণ করেছিলেন

ডিপথেরিয়ার জীবাণু যে বিষ নিঃসৃত করে তাই শিশু ও অন্য প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়—কাজেই সকল ব্যাপার দেখে শেষে তাঁর এটাই মনে হলো যে, আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইডের জন্য যে সকল গিনিপিগ আরোগ্য লাভ করেছে তারা হয়তবা এই বিষাক্ত দ্রব্যকেই নষ্ট করার শক্তি অর্জন করেছে।

বেরিং আবার পরীক্ষায় মাতলেন। ডিপথেরিয়ার জীবাণু গজিয়ে তিনি তা থেকে তৈরি করলেন জীবাণুমুক্ত এক তরল বিষ—আর তারই বেশ কিছু পরিমাণ তিনি ঢুকিয়ে দিলেন কয়েকটি গিনিপিগের গায়ের চামড়ার নিচে। দেখা গেলো, প্রাণীগুলি নির্বিঘ্নেই এই বিষ হজম করলো। বোঝা গেলো, জীবাণুজনিত ঐ বিষের প্রতিও প্রাণীগুলির দেহে অনাক্রম্যতা গড়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত শ্রমসাধ্য গবেষণা চালিয়ে, উপর্যুপরি বিফলতা ও নৈরাশ্য কাটিয়ে, বেরিং যা আবিষ্কার করলেন—চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সে এক অমূল্য অবদান। রোগমুক্তি লাভের, ব্যাধিকে প্রতিরোধ এবং পরাভূত করার এটি এক অভিনব পন্থা,—চিকিৎসাশাস্ত্রে সংযোজিত হলো নতুন এক চিকিৎসা পদ্ধতি! রু হয়তোবা এ সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করতে পেরেছিলেন—কিন্তু বাস্তবে তা পরিণত করতে পারেন নি। পাস্তুর অ্যানথ্রাক্সের কবল থেকে প্রাণীকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন—জলাতঙ্ক থেকে রক্ষা করতে পেরেছিলেন মানুষকে—কিন্তু বেরিং যা আবিষ্কার করলেন তা যেমন অভূতপূর্ব, যেমন বিস্ময়কর—তেমনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ।

প্রাণীদেহে ডিপথেরিয়ার জীবাণু ঢুকিয়ে জীবন্ত অবস্থায় সেই প্রাণীগুলিকে প্রায় মেরে ফেলে—বেরিং তাদের মধ্যে এমন এক অনাক্রম্যতা গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন, যার ফলে সেই জীবাণুজনিত বিষ—যে বিষের মাত্র এক আউন্স ৭৫ হাজার কুকুরকে অনায়াসে মেরে ফেলতে পারে—সেই পরিমাণ মারাত্মক বিষ প্রয়োগেও সে সকল প্রাণী আর মরে না। কিন্তু কেন এমন হয়—প্রাণীরা কি করে এমন শক্তিধর হয়ে ওঠে? বেরিং ভাবলেন, নিশ্চয়ই এরূপ প্রাণীর রক্তে কোনো প্রতিরোধক পদার্থের সৃষ্টি হয়—যা এই রোগকে প্রতিহত করার মত শক্তি তাদের এনে দেয়। প্রমাণের জন্য এরপর তিনি এদের রক্তে সেই প্রতিরোধক পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন।

কিন্তু এই রক্ত সহজে তিনি পাবেন কোথায়? সামান্য যে কয়েকটি গিনিপিগ প্রতিকূল অবস্থা কাটিয়ে বেঁচে উঠেছিল প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করেছিল এর আগের পরীক্ষায়, তাদের সংখ্যাও প্রায় শেষ হয়ে গেছে—তাছাড়া যারা বেঁচে ছিল, সেই পরীক্ষার জন্য রক্ত দান করে তাদের গলার শিরাও শেষে শুকিয়ে গেছে। বহু কষ্টে তাই তিনি একটির পা থেকে সামান্য কিছু রক্ত সংগ্রহ করলেন। এই রক্ত থেকে সিরাম তৈরি করে তিনি তার সাথে বেশ কিছু পরিমাণ ডিপথেরিয়ার জীবাণুজনিত বিষ মেশালেন—তারপর এই মিশ্রিত দ্রব্যকে তিনি এমন কয়েকটি গিনি-পিগের দেহে ঢুকিয়ে দিলেন, যারা এর আগে আর ডিপথেরিয়ার প্রতি অনাক্রম্যতা অর্জন করেনি। দেখা গেলো এরা দিব্যি বেঁচে রইলো।

এবারে শুরু হলো সেই আসল পরীক্ষা; সেই কঠিন পরীক্ষা—যার উপর নির্ভর করছে বেরিং-এর জয়-পরাজয়—তার উত্থান কিংবা পতন। তিনি বেছে নিলেন এমন একটি সুস্থ গিনিপিগ যার দেহে ডিপথেরিয়ার কোনো প্রতিরোধ শক্তি জন্মানো হয়নি। এরই রক্ত থেকে তিনি তৈরি করলেন সিরাম—আর সেই সিরামের সাথে জীবাণুর বিষ মিশিয়ে তিনি ঢুকিয়ে দিলেন কয়েকটি নূতন গিনিপিগের দেহে। দেখা গেলো, তিন দিনের মধ্যেই এদের দেহ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে—তাঁর আঙ্গুলের খোঁচাতেও তারা আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না—শুধু তাই নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সেই মারাত্মক হিক্কা কাশিও দেখা দিল তাদের—তারপর ধীরে ধীরে তারা ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। এদের মৃত্যুই একান্ত কাম্য ছিল বেরিং-এর—আর মরলোও তারা। এবং এমনি ভাবে মরে নিশ্চিত ভাবেই তারা প্রমাণ করলো যে, বেরিং-এর ধারণাটাই সত্য—আর সেই সাথে বেরিং-এর জীবনে আসলো চরম সাফল্য—কঠিন পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন।

বেরিং তাই প্রমাণ করতে সক্ষম হলেন যে, যে সমস্ত প্রাণী ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইডের প্রয়োগে বেঁচে উঠতে পেরেছিল শুধু তাদের রক্তের সিরামই ডিপথেরিয়ার জীবাণু বিষকে বিনষ্ট করতে পারে। কিন্তু গিনিপিগের ক্ষেত্রে যে সাফল্য আসলো, সেই সাফল্য কি

আসবে রুগ্ন শিশুদের বেলায়—তারা কি বেঁচে উঠবে, প্রতিহত করবে সেই মারাত্মক ব্যাধি? অবশ্য এজন্য প্রয়োজন বেশী পরিমাণে এই সিরাম। এই প্রতিরোধক সিরাম—যার নাম তিনি দিলেন অ্যান্টি-টক্সিন, প্রচুর পরিমাণে তা তৈরি করার জন্য তিনি পরীক্ষা শুরু করলেন খরগোশ, ভেড়া, কুকুর প্রভৃতি প্রাণী নিয়ে—একাধারে এদের দেহে তিনি ডিপথেরিয়ার জীবাণু আর আয়োডিন টেট্রাক্লোরাইড ঢোকাতে লাগলেন। পরীক্ষাধীন ভেড়ার দেহ থেকে পেলেন তিনি প্রচুর পরিমাণে এই সিরাম তৈরির রক্ত। প্রথমে এই রক্তের সিরাম এবং পরের দিন ডিপথেরিয়ার জীবাণু তিনি ঢুকালেন কয়েকটি গিনিপিগের দেহে, আর কয়েকটির মধ্যে শুধুমাত্র ডিপথেরিয়ার জীবাণু। দেখা গেল, প্রথমগুলির মধ্যে ডিপথেরিয়ার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না—কিন্তু যে গুলিকে শুধুমাত্র ডিপথেরিয়ার জীবাণুই দেয়া হয়েছিল, কয়েকদিনের মধ্যে তারা সেই রোগে মারা গেল। সিরামের কার্যকারিতার প্রমাণ যদিও পাওয়া গেল, তবে তা একেবারে সন্দেহাতীত নয়। বেরিং তাই দু একটি নয় শতকেরও বেশী পরীক্ষা করলেন—আর সেই সাথে প্রাণ দিল দু'দশটি নয় হাজারেরও বেশী নিরীহ প্রাণী। এত কিছু পরীক্ষা, এত প্রাণী বধ করেও তবু কিন্তু নিশ্চিত হওয়া গেল না। পরীক্ষায় কখনওবা আসলো সাফল্য কখনওবা বিফলতা। অন্য দিকে আবার আর এক কঠিন সমস্যাও দেখা দিল। দেখা গেলো, এই সিরাম বেশীদিন কার্যকরী থাকে না। কাজেই বাস্তব ক্ষেত্রে এমন অস্থায়ী জিনিসে যে তেমন সুবিধা দাঁড়াবে না, তা বেরিং বেশ বুঝতে পারলেন। অবশ্য বেরিং ছিলেন এমন জাতের মানুষ যে, এ সকল ভাবনা-চিন্তা তাঁকে দমাতে পারলো না—তখনি তিনি অধীর হয়ে উঠলেন রুগ্ন শিশুর উপরে সেই সিরামের কার্যকারিতা প্রমাণের জন্য। যে সিরাম ইতর প্রাণীকে ডিপথেরিয়ার কবল থেকে মুক্ত করতে সক্ষম, সে কি মানুষকেও রক্ষা করতে সমর্থ? অবশ্য ইতর প্রাণীদের উপর ফলাফল নিশ্চিত হলে কথা ছিল না—দোষের ছিল না। কিন্তু এই সিরামের কার্যকারিতা যেখানে অনেকটাই অনিশ্চিত, সেখানে সহসা সেটিকে মানব শিশুর ওপর প্রয়োগ করতে বেরিং কেন যে সাহসী হলেন, তা সত্যই আশ্চর্য। তবে কারণ যাই হোক না কেন,

—এ কথা অবশ্যই সত্য যে, বেরিং সেদিন যদি এমনি সাহসী, বেপরোয়া না হতেন, তবে শত শত শিশু মারাত্মক ডিপথেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেত না এতদিন—আর পৃথিবী থেকে—এই ব্যাধিকে চিরতরে বিদায় দেয়ার সম্ভাবনার কথা—আজও আমরা ভাবতে পারতাম না।

যা হোক, ১৮৯১ সালের শেষের দিকে বড়দিনের রাতে, ডিপথেরিয়ার এই প্রতিবিষ ( antitoxin ) এই সিরাম সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হলো বার্লিনের ব্রিক স্ট্রিটের বার্জমান চিকিৎসা কেন্দ্রে—ডিপথেরিয়ায় গুরুতরভাবে আক্রান্ত একটি শিশুর দেহে। সত্যই আশাতীত, আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া গেল একেবারে শুরুতেই। শিশুটি বেঁচে উঠলো—আর এই সাফল্যের নজির দেখে চিকিৎসকেরা সেই সিরাম দিয়ে এর পর ডিপথেরিয়ার চিকিৎসা শুরু করলেন। সকল ক্ষেত্রে অবশ্য সুফল ফললো না—কিছু সংখ্যক শিশু মারাও গেল, বার্লিনের একজন বিখ্যাত চিকিৎসকের ছোট ছেলেটি প্রতিবিষ দেবার কয়েক মিনিট পরেই অকস্মাৎ অজানা কারণে মারা গেল। ব্যাপারটি এতই আশ্চর্যজনক যে, এ নিয়ে প্রচুর হৈ চৈ হলো—কিন্তু তবুও এই চিকিৎসা পদ্ধতি বন্ধ হলো না। জার্মানীর বড় বড় ওষুধের কারখানাগুলি ভেড়ার রক্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রতিবিষ তৈরি করতে লাগলো—আর তা দেশ বিদেশে ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় ব্যবহৃত হতে থাকলো। তিন বছরের মধ্যে প্রায় ২০ হাজার শিশুর চিকিৎসা করা হলো এই প্রতিবিষের সাহায্যে।

যদিও ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় বেরিং-এর আবিষ্কৃত প্রতিবিষের প্রয়োগ যথারীতি চলতে থাকলো তবুও প্রতিবিষের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা কিন্তু তেমনই রয়ে গেল। কতক রোগী বাঁচলো—কতক মারা গেলো। এরূপ চিকিৎসার পদ্ধতি নিয়ে—মানুষের শরীরে জন্তু-জানোয়ারের রক্তের সিরাম প্রয়োগ সম্পর্কে নানা অভিযোগ, নানা সমালোচনা হলো—কিন্তু কেউই বেরিং-এর চেয়ে ভাল কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না। বেরিং-এর তাই সান্ত্বনা, সকল ক্ষেত্রে সুফল না দিলেও তবুও তো কিছু সংখ্যক শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে!

কিন্তু এই প্রতিবিষ সকল ক্ষেত্রে কেন কার্যকরী নয়, কি তার রহস্য? এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে পুনরায় আবির্ভূত হলেন রু। ঘোড়ার উপর পরীক্ষা চালিয়ে তিনি দেখালেন যে—এদের দেহে অতি সহজেই যে শুধু অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করা যায় তা নয়, এদের দেহ থেকেও পাওয়া যায় প্রচুর রক্ত—কাজেই বেশ পরিমাণ সিরামও তৈরি করা যায় এদের রক্ত থেকে। উপরন্ত এই সিরামের কার্যকারিতা যেমন বেশী—তেমনি মানুষের দেহে তার বিরূপ প্রতিক্রিয়াও খুব কম। ১৮৯৪ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী, ঘোড়ার রক্ত থেকে তৈরি সিরাম সর্বপ্রথম মানব দেহে প্রয়োগ করলেন রু। তারপর পাঁচ বছরে তিনশোরও বেশী রোগীকে এই সিরাম দেয়া হলো এবং ফলও পাওয়া গেল আশাপ্রদ।

যাহোক, কার্যকারিতার দিক থেকে রু-এর প্রতিবিষ যে উন্নততর, বেশী ফলদায়ক, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই কিন্তু তৎসত্ত্বেও আগের অনিশ্চয়তা এক্ষেত্রে ঘুচলো না। রু-এর সিরাম যে সত্যই ডিপথেরিয়া নিরাময় করে—এত রোগীর উপর প্রয়োগ করে তবুও সঠিকভাবে তা বলা সম্ভব হলো না—এমনকি আজ পর্যন্ত এই রোগের চিকিৎসায় একমাত্র ঔষধ হিসাবে রু-এর সিরাম ব্যবহৃত হয়ে আসলেও আজও তা বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে এই অদ্বিতীয় ও একমাত্র ঔষধ—এই রহস্যময়ী সিরাম ব্যবহার করে আজও শতকরা ২৬টি শিশু এই রোগে মারা যায়। তবু ডিপথেরিয়ার চিকিৎসায় সব ডাক্তারই এই সিরাম ব্যবহার করেন। যদি কোনো ডাক্তার তা না করেন তবে তা দোষের হয়ে দাঁড়ায়, কেননা, কোন ডাক্তারই হলপ করে বলতে পারেন না যে, রু-এর এই সিরাম ডিপথেরিয়ার ঔষধ নয়।

অবশ্য এই সিরামের সত্যিকার রোগনাশক গুণাগুণ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখতে হলে ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত শিশুদেরকে দুভাগে ভাগ করে—এক ভাগকে সিরাম দিয়ে এবং অন্য ভাগকে তা না দিয়ে ফলাফল দেখা প্রয়োজন। কিন্তু কে এই মারাত্মক ব্যবস্থার ঝুঁকি নেবে? সত্যই যদি এই সিরাম ডিপথেরিয়ার ঔষধ হয়—তবে তা প্রয়োগ না করার জন্য যে শিশুগুলি মারা পড়বে—সে পাপের বোঝা বহন করবে কে?

যাহোক, ডিপথেরিয়ার প্রতিবিষ বা ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনিশ্চয়তা না ঘুচলেও রু এবং বেরিং-এর পরীক্ষা বিফলে যায়নি। এই

আবিষ্কৃত সিরাম—অজানা রহস্যজনকভাবে কার্যকরী হলেও একান্ত নিরাপদ, সকল শিশুর দেহকে যেন একটি ডিপথেরিয়ার প্রতিবিষ তৈরির কারখানায় পরিণত করে—যার ফলে তারা কোনোদিনও আর ডিপথেরিয়ায় আক্রান্ত হয় না। এই শিশুদের দেহে এমন মাত্রায় এই বিষাক্ত দ্রব্য ঢোকানো হয়—যা অনেক কুকুরকে মেরে ফেলতে পারে—অথচ আশ্চর্য সেই বিষাক্ত দ্রব্যটিই এমনভাবে দেহে পরিবর্তিত হয় যে, মাত্র সাতদিনের শিশুর উপরও তা নির্বিঘ্নে প্রয়োগ করা চলে।

যে মারাত্মক ব্যাধি ডিপথেরিয়া এককালে বহু শিশুকে অকালে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে—তা আজ ডাক্তারদের সিরিঞ্জের তিনটি মাত্র খোঁচায় প্রতিহত করা সম্ভব—আর সেজন্য যে তিনজন মহান বিজ্ঞানীর কাছে পৃথিবীর সকল মানুষই চিরকৃতজ্ঞ থাকবে—তাঁরা হলেন—লোফ্লার, রু এবং বেরিং।

---

# ডায়াবেটিস ও ডাঃ ব্যান্টিং

ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগের সঙ্গে যে নামটি বিশেষভাবেই জড়িত এবং যাঁর মহান আবিষ্কারের ফলে লক্ষ লক্ষ বহুমূত্র রোগী আজ অকাল মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে অনেকটাই স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে—তিনি হলেন ডাঃ ফ্রেডারিক গ্রান্ট ব্যান্টিং ( Dr. Frederick Grant Banting )। ব্যান্টিং ১৮৯১ খ্রীঃ কানাডার এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

বহুমূত্র একটি মারাত্মক ব্যাধি। কবিরাজরা একে "মধুমেহ"-ও বলে থাকেন। মূত্রের সঙ্গে মিষ্টি দ্রব্যও নির্গত হয় বলে এই নামকরণ। অবশ্য বহুমূত্র দুই প্রকার। এক ধরনের বহুমূত্রে প্রস্রাবে চিনি (গ্লুকোজ) থাকে—অন্যটিতে থাকে না। ডাঃ ব্যান্টিং যে ধরনের বহুমূত্রে প্রস্রাবে চিনি থাকে—যাকে বলা হয়—ডায়াবেটিস মেলিটাস (Diabetes Mellitus)—তারই চিকিৎসার একটা উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন।

যাহোক, কবিরাজদের দেয়া নামটি কিন্তু বেশ আকর্ষণীয়—অনেকটা কাব্যিক! তবে যত কাব্যিকভাবেই রোগটির নামকরণ করা হোক না কেন—একবার এই রোগে আক্রান্ত হলে কোনো রোগীর নিস্তার ছিল না—ধুকে ধুকে অচিরেই সে নিঃশেষ হয়ে যেতো—অকালেই নির্বাপিত হতো তার জীবন-প্রদীপ। অবশ্য আজও যে এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়ার কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে তা নয়—তবে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধারের একটি উপায় পাওয়া গেছে—এবং সে উপায়টি জানা সম্ভব হয়েছে ডাঃ ব্যান্টিং-এর গবেষণার সূত্রে। তবে মজার কথা হলো—ডাঃ ব্যান্টিং কোনো দিন যে গবেষক হবেন তা নিজেও আগে কখনও

কল্পনা করতে পারেননি—কিন্তু নিয়তি তাঁকে নিয়োজিত করলো এমন এক গবেষণার কাজে—যার ফলে—তিনি আবিষ্কার করলেন বহুমূত্র রোগের এমন এক চিকিৎসা পদ্ধতি—যে পদ্ধতিতে সময় মত ব্যবস্থা নিলে ঐ রোগে মানুষের আর অকাল মৃত্যু ঘটে না। ব্যান্টিং-এর এই পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ার আগে কত লোক যে এই রোগে মৃত্যুবরণ করেছে তার ইয়ত্তা নেই। কেননা, এই রোগ যেমন প্রাচীন—তেমনি তার প্রাদুর্ভাব কোনো কালে কম ছিল না। খ্রীস্টপূর্ব পনেরো শতকের আগেও মিশরে এই রোগে মানুষের মৃত্যু হয়েছে—তার প্রমাণ পাওয়া যায়। খ্রীস্টপূর্ব ৫০ সালে কাপ্পাডোসিয়ার এরিটেয়াস (Aretaeus) এই রোগের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—"দেহ যেন আর দেহ থাকে না—পানি হয়ে যায়।"

কিন্তু বহুমূত্র বহুকালের বহু পরিচিত ব্যাধি হলেও বস্তুতঃ ১৯২২ সালের আগে এ রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। অবশ্য সত্যিকার অর্থে আজও যে এই রোগ নিরাময়ের কোনো ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে—তা নয়। তবে একথা ঠিক যে, সময় মত ব্যবস্থা এবং দৈনিক একটি করে ইন্সুলিন (insulin) ইঞ্জেক্শন নিলে বা অবস্থা ভেদে ঔষধ খেলে আজকাল এ রোগে কোনো রোগী আর মরে না—অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই জীবন যাপন করা সম্ভব হয়। জানা যায়—খ্যাতনামা চিন্তাবিদ এইচ. জি. ওয়েল্স অল্প বয়সে এই রোগে আক্রান্ত হয়েও এই ইনসুলিনের উপর নির্ভর করে দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন—যা আগে কখনও সম্ভব ছিল না। তিনি দৈনন্দিন নিয়মিত কাজ কর্ম করতেন এবং বহু বিখ্যাত বই পুস্তক লিখে গেছেন। "কোডাক" ক্যামেরা এবং ফিল্মের আবিষ্কারক ইস্টম্যান এবং বিখ্যাত চিকিৎসক মাইনট—যিনি এককালে "পার্নিসাস অ্যানিমিয়া" রোগীকে কলিজা খাইয়ে সুস্থ করার উপায় উদ্ভাবন করেন—তাঁরাও বহুমূত্র রোগী ছিলেন। এঁদের সৌভাগ্য যে এঁরা সকলেই ব্যান্টিং-এর চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করার পূর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের জীবনে—তাই অকালে কারোও মৃত্যু হয়নি—অথচ দুর্ভাগ্য আরলিক (Ehrlich)—যিনি সিফিলিসের সর্বপ্রথম নিশ্চিত ঔষধ আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন—তিনি

সে সুযোগ পাননি বলে ঐ রোগে মারা যান। ব্যান্টিং-এর আবিষ্কারটি
তাঁর জীবিত কালে সম্পন্ন হলে—আরো কিছু কাল তিনি হয়ত বেঁচে
থাকতে পারতেন—অন্ততঃ বহুমূত্র রোগে তাঁর মৃত্যু হতো না !

যাহোক, ব্যান্টিং-এর আবিষ্কারের আগে বহুমূত্র রোগীদের চিকিৎসার
ব্যাপারে যেটুকু নির্দেশ ছিল তাহলো, দারুণভাবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ।
অনেক কিছু প্রিয় খাদ্য—রোগীকে বাদ দিয়ে চলতে হতো—কিন্তু তবুও
নিস্তার ছিল না—অকাল মৃত্যুকে কোনরূপেই প্রতিরোধ করা যেত না।
দেহের ওজন দিন দিন কমে আসতো—রোগী ক্রমে জীর্ণশীর্ণ কঙ্কালসার
হয়ে যেত—অতৃপ্ত ক্ষুধায় কাতর হয়ে এবং ঘন ঘন প্রস্রাব করে—হঠাৎ
করেই এক সময়ে অবসন্ন কিংবা অজ্ঞান হয়ে পড়তো—আর এমনি অবস্থার
মধ্যদিয়েই একদিন তার তীব্র ক্ষুধা-তৃষ্ণা—তার চরম দুর্ভোগের চির
অবসান ঘটতো !

অবশ্য বহুমূত্র রোগীকে আজও নিয়মিত খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করে চলতে
হয়। রোগের কারণটি সঠিকভাবে আজও নির্ণয় করা না গেলেও, সত্যিকার
নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থা এখনও করা সম্ভব না হলেও—অনেকটা স্বাভাবিক-
ভাবে বেঁচে থাকার সহজ উপায় একটা পাওয়া গেছে এবং সেই সঙ্গে
এই রোগ সম্পর্কেও জানা গেছে অনেক কিছু।

সতেরো শতকে থমাস উইলিস সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, বহুমূত্র
রোগের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ হলো প্রস্রাবের সঙ্গে চিনি নিঃসৃত
হওয়া। ১৭৭৬ সালে ডবসন প্রমাণ করেন যে, বহুমূত্র রোগীর রক্তের
মধ্যে চিনির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। মূত্রে এবং রক্তে চিনির পরিমাণ বৃদ্ধি
পায় কেন তা উনিশ শতকে ভালভাবে জানা গিয়েছিল। দৈহিক বিপাক
প্রক্রিয়ায় (metabolic process) শ্বেতসার এবং শর্করা জাতীয় খাদ্য
আমাদের শরীরে শেষ পর্যন্ত দেহজ শর্করা—গ্লুকোজ ( glucose )-এ
পরিণত হয়ে রক্তে মিশ্রিত হয় এবং রক্তস্রোতে দেহের সর্বত্র সকল
কোষসমূহে পরিচালিত হয়। নিঃশ্বাসের সাথে যে বাতাস আমরা গ্রহণ
করি সেই বাতাসের অক্সিজেনও ফুসফুস এবং রক্তের লোহিত কণিকার
মাধ্যমে দেহের সকল কোষে পরিবাহিত হয়। এইভাবে অক্সিজেন যখন

দেহজ গ্লুকোজের সংস্পর্শে আসে তখন অক্সিজেন গ্লুকোজকে জারিত (oxidise) করে উৎপন্ন করে শক্তি (তাপ) এবং এভাবে উৎপাদিত শক্তিই যোগায় আমাদের সকল শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা—এক কথায় এই শক্তিই হলো আমাদের সকল কাজ, চলা-বলা ও চিন্তা-ভাবনার প্রধান উৎস।

কিন্তু বহুমূত্র রোগে কেউ যখন আক্রান্ত হয়—তখন অক্সিজেন এই দেহজ গ্লুকোজকে আর জারিত করতে পারে না—ফলে দৈহিক প্রয়োজনীয় শক্তিও আর উৎপন্ন হতে পারে না,—দেহজ শর্করার প্রায় সবটুকুই প্রস্রাবের সাথে নির্গত হয়। শক্তির অভাবে শরীর তাই ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে পড়ে, দিনে দিনে তা হয় জীর্ণশীর্ণ—কর্মক্ষমতা, সজীবতা সবকিছু হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কেন এমন হয়, দেহজ শর্করাকে কোন্ কারণে অক্সিজেন আর জারিত করতে পারে না—সে তত্ত্ব তখনকার শারীরতত্ত্ববিদদের যেমন জানা ছিল না, তেমনি অন্ততঃ ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত তা অজনাই থেকে যায়।

আমাদের দেহে পাকস্থলী ও অন্ত্রের পেছনে এবং যকৃতের নিচের দিকে, অনেকটা জিভের মত দেখতে, ছোট্ট একটি গ্লাণ্ড বা গ্রন্থি থাকে, যার নাম প্যাংক্রিয়াস (pancreas)। যকৃত থেকে পিত্তরস নিঃসৃত হয়ে যেমন প্রথমে পিত্তাশয়ে এবং পরে ক্ষুদ্র অন্ত্রে প্রবেশ করে তেমনি এই প্যাংক্রিয়াস থেকে জারক রস আলাদা একটি নল দিয়ে সরাসরি অন্ত্রে গিয়ে পেঁৗছে। পাকস্থলী থেকে খাদ্য অন্ত্রে প্রবেশ করলে, তা তখন যকৃতের পিত্তরস এবং প্যাংক্রিয়াসের জারক রসের সংমিশ্রণে জীর্ণ হয়। ফলে খাদ্যের সারাংশ রক্তের সঙ্গে মিশ্রণের সুযোগ পায়। খাদ্য জীর্ণ করার জন্য প্যাংক্রিয়াসের জারক রসেরও যে প্রয়োজন, এ তথ্য সতেরো শতকে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন রেগনার দা গ্রাফ। রেগনারের এই আবিষ্কারের পর প্যাংক্রিয়াস সম্পর্কে বহু গবেষণা হয়েছে এবং অনেক তথ্যই আবিষ্কৃত হয়েছে। প্যাংক্রিয়াসের কোন্ কোষগুলিতে এই জারক রস তৈরি হয় তাও জানা গেছে। ১৮৬৯ সালে প্যাংক্রিয়াসে আবার কতকগুলি বিচিত্র কোষের সন্ধান পাওয়া যায়—যেগুলি মোটেই এই জারক

রস তৈরি করে না। জার্মান ডাক্তার পল ল্যাঙ্গারহান্‌স এই তথ্যটি আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামানুসারে সমষ্টিগতভাবে এই কোষগুলিকে বলা হয় আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহান্‌স (Islet of Langerhans)। কিন্তু জারক রস সৃষ্টি করে না—অথচ প্যাংক্রিয়াসে এরা থাকে কেন—তাদের আসল কাজই বা কি, উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত তা রহস্যাবৃতই থেকে যায়।

অবশ্য ১৮৯০ সালের দিকে প্যাংক্রিয়াস সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্ট্রাসবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বার্ণাড নুনীনের নির্দেশে মিনকোভস্কি এবং মেরিং কুকুর, খরগোশ, ইঁদুর, গিনিপিগ প্রভৃতির ওপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেন যে, জীবন ধারণের জন্য সবটুকু প্যাংক্রিয়াসের প্রয়োজন না থাকলেও দেহ থেকে প্যাংক্রিয়াস সরিয়ে নিলে সকল ইতর প্রাণীই বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়।

মিনকোভস্কি এই রোগ নিরাময়ের জন্য কিছুটা চেষ্টাও করেছিলেন। শরীর থেকে প্যাংক্রিয়াস সরিয়ে নিয়ে প্যাংক্রিয়াসের রস রুগ্ন কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্যাংক্রিয়াসের পরিবর্তে কেবল মাত্র তার রস খাইয়ে কোন কুকুরকে কোনোক্রমেই বাঁচাতে না পেরে—শেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য—অর্থাৎ প্যাংক্রিয়াসের অভাবে যে প্রানিদেহে বহুমূত্র রোগের আবির্ভাব ঘটে, সেটি কি মানুষের বেলাতেও খাটে? এই তথ্যটি বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন জন হপকিন্স হাসপাতালের কয়েকজন ডাক্তার। দেখা গেল, বহুমূত্র রোগে মৃত ব্যক্তিদের প্যাংক্রিয়াসে কিছু কিছু কোষ বিনষ্ট হওয়ার চিহ্ন সব ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকে। কাজেই প্যাংক্রিয়াসের কিছু কিছু কোষ যেখানে নষ্ট হওয়ার নজির সব ক্ষেত্রেই রয়েছে সেখানে এ সকল কোষ নষ্ট হওয়ার সাথে যে মানুষের বহুমূত্র রোগের নিশ্চয়ই সম্পর্ক রয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী?

যাহোক, উনিশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন গবেষকদের সূত্রে বহুমূত্র রোগ সম্পর্কে কেবলমাত্র উপরিউক্ত তথ্যগুলিই জানা গেল, রোগের কারণ বা তার প্রতিবিধানের কোনো প্রকার হদিস পাওয়া গেল না।

উনিশ শতক শেষ হলো—শুরু হলো বিশ শতক। এ সময় হরমোন (hormone) নিয়ে বিজ্ঞান মহলে বেশ মাতামাতি শুরু হয়েছে। আমাদের দেহের মধ্যে যে কতকগুলি নলহীন গ্রন্থি (ductless gland) রয়েছে তা যেমন জানা গেল—তেমনি এ সত্যও প্রমাণিত হলো যে, এ সকল নলহীন গ্রন্থি সৃষ্টি করে কয়েক প্রকার আন্তঃরস (internal secretion)—যারা মুখের লালা বা চোখের পানির মত নলের মধ্যদিয়ে নিঃসৃত হয় না, গ্রন্থি থেকে একেবারে সরাসরি রক্তস্রোতে মিলিত হয়—এবং দেহের বিভিন্ন অংশে হাজির হয়ে কোথাও তারা দৈহিক কোষসমূহের পুষ্টি সাধন করে—কোথাওবা উৎপন্ন করে শক্তি। পরিমাণে সামান্য হলেও এঁদের শক্তি বা কর্মক্ষমতা অসাধারণ। অধিকন্ত এদের আধিক্য বা অল্পতা উভয়ই নানা প্রকার দৈহিক ও মানসিক বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম। শারীরিক গঠন, আকৃতি বা অবয়ব, মনোবৃত্তি, এমনকি নর ও নারীর বিভিন্নতা এদের সঠিক পরিমাণ ক্ষরণের উপর নির্ভরশীল—তাই এদের নাম দেয়া হয়েছে "হরমোন" বা বার্তাবাহক। অবশ্য নলহীন গ্রন্থিই যে শুধু হরমোন নিঃসৃত করে তা নয়,—কতকগুলি নলযুক্ত গ্রন্থিও হরমোন তৈরি করে—যেমন, যৌন গ্রন্থি (gonad gland)। এ সকল গ্রন্থি নিঃসৃত হরমোনের স্বরূপ, সক্রিয়তা এবং পরিমিত পরিমাণের ওপরই নির্ভর করে নারী পুরুষের দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য—তাদের পূর্ণ ও সুষ্ঠু বিকাশ।

যাহোক, এ সকল আশ্চর্য আন্তঃরস বা হরমোন আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যে, প্যাংক্রিয়াস গ্রন্থিও হয়ত এমন কোনো হরমোন নিঃসৃত করে—যা দেহের কোষে সঞ্চিত দেহজ চিনিকে অক্সিজেনে জারিত হতে সাহায্য করে—যার ফলে দৈহিক কোষসমূহে শক্তি উৎপন্ন হয়। তা' না হলে,—সঞ্চিত চিনি প্যাংক্রিয়াসের অভাবে জারিত না হয়ে প্রস্রাবের সাথে বেরিয়ে আসে কেন? কাজেই এই ধরনের ধারণা থেকে পরে তাই প্রচেষ্টা চললো—প্যাংক্রিয়াস থেকে কোনো হরমোন উদ্ধার করা যায় কিনা। বার্লিনে ডাঃ জুয়েলজার এদিকে অনেকটাই সফল হলেন। কুকুরের প্যাংক্রিয়াস থেকে তিনি এমন এক নির্যাস তৈরি করলেন যা কয়েকটি রুগ্ন কুকুর—এমনকি আটজন বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রেও উপকার

দর্শালো। কিন্তু এই নির্যাসের ইঞ্জেকশন নিতে রোগীদের খুবই কষ্ট হতো—তা ছাড়া তারা খুবই দুর্বল হয়ে পড়তো,—ইঞ্জেকশনের জায়গাগুলিতেও বিশ্রী ঘা' হতো। অনেক চেষ্টা করেও ইঞ্জেকশনের যন্ত্রণা ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত উপসর্গগুলি কমাতে না পারায়, জুয়েলজার শেষটায় সে প্রচেষ্টা বাদ দিলেন।

এমনি উদ্যম অবশ্য আরো অনেকে নিয়েছিলেন—যেমন রচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মুরলিন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ স্কট এবং ডাঃ কার্লসন প্রভৃতি কিন্তু পুরোপুরি সফল হতে পারেননি কেউ। ইটালীর পশুচিকিৎসক ডাঃ ম্যাসাগলিয়া বহুমূত্র রোগের জন্য গোটা প্যাংক্রিয়াস দায়ী নয়, শুধু আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহান্‌সের অক্ষমতাই দায়ী, এই সিদ্ধান্তে এসে শুধু আইলেটেরই নির্যাসে পরীক্ষা চালালেন বটে, তবে তাতেও তিনি কোনো সুফল পেলেন না। পশুর প্যাংক্রিয়াস বাদ দিয়ে মাছের প্যাংক্রিয়াসে কোনো কাজ দেয় কিনা তাও দেখলেন দুজন স্কটিশ ডাক্তার—ফ্রেজার এবং রেনী, কিন্তু তাতেও কোনো ফল পাওয়া গেল না।

যাহোক, পশু বা মাছের আইলেট নির্যাস দিয়ে বিজ্ঞানীরা এ রোগ সারাতে পুরোপুরি সফল না হলেও—১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যে প্রচেষ্টা চললো তাতে বেশ বোঝা গেল যে,—প্যাংক্রিয়াসের আইলেট অফ ল্যাঙ্গারহান্‌স থেকে নিঃসৃত কোনো হরমোনের অভাবই বহুমূত্র রোগের কারণ, —এমনকি বিখ্যাত হরমোন বিজ্ঞানী শেফার এ সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে এই হরমোনের নামটি পর্যন্ত তিনি দিয়েছিলেন,—"ইনসুলিন" (insulin)।

কিন্তু কাজ আর বেশী দূর এগোলো না—প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাবতে বিজ্ঞানীরা ব্যস্ত রইলেন অন্যসব জরুরী কাজে। বহুমূত্র সম্পর্কে গবেষণার কাজ তাই কিছুকাল বন্ধ থাকলো।

১৯২০ সালের দিকে পুনরায় কাজ শুরু হলো—এবং এ নিয়ে কাজ শুরু করলেন ডাঃ ফ্রেডারিক জি, ব্যান্টিং—যাঁর নাম সর্বাগ্রে একবার স্মরণ করে শুরু করেছি আমাদের এই কাহিনী।

কিন্তু ব্যাণ্টিং কি করে ডাক্তার হলেন এবং কি করে যে তিনি এ পথে পা বাড়ালেন—তা বলতে গেলে বিধির বিধান বলে কথাটার সত্যতা স্বীকার করতেই হয়! তা না হলে, যে পরিবারের কেউ কোনো দিন তেমন শিক্ষিত ছিলেন না—বংশপরম্পরায় যে পরিবারের সবাই ছিলেন কৃষক, —সে পরিবারের সদস্য হয়ে তিনি কী করে ডাক্তারী পড়া শুরু করলেন—পুরোপুরি ডাক্তারী পড়া শেষ না করেই কী করে একদিনেই ডাক্তার ও ক্যাপ্টেন হওয়ার মর্যাদা লাভ করলেন—কেমন করে পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকেই পেলেন এক চাকরি—যে চাকরি শেষ পর্যন্ত তাঁকে টেনে নিল এমন এক গবেষণার পথে—যে পথ যেমন তাঁর নিজস্ব ছিল না—তেমনি সে পথে চলার মত ছিল না তাঁর সামান্যতম পাথেয়—অথচ সেই পথে অগ্রসর হয়ে কী করে তাঁর জীবনে আসলো এক চরম সাফল্য—সে কাহিনী যেমন বিরাট, তেমনি বিচিত্র! সে বিরাট এবং বিচিত্র কাহিনী স্বল্প পরিসরে বর্ণনা করা সম্ভব নয়—কাজেই খুব সংক্ষিপ্তভাবেই তা বলা যাক্।

আগেই বলেছি,—ব্যাণ্টিং ছিলেন কৃষকের ছেলে—এবং তাঁর পরিবারের কেউ কোনোদিন তেমন শিক্ষিত ছিলেন না, ডাক্তার হওয়াতো দূরের কথা। কাজেই এহেন পরিবারের ছেলে হয়ে তিনি যখন ঝোঁকের মাথায় ১৯১১ সালে টরেণ্টো মেডিকেল স্কুলে পড়তে গেলেন, তখন তাঁর পরিবারের কেউ তাঁর কাছ থেকে যেমন বিশেষ কিছু আশা করেননি তেমনি পাঠ্যাবস্থায় তিনিও তেমন কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। সাধারণ গোত্রের ছাত্র ছিলেন তিনি। অথচ এমনি সাধারণ মেধার অধিকারী হয়েও একদিন তিনি এমন এক আশাতীত আবিষ্কার করে বসলেন যে বিশ্বজোড়া তাঁর খ্যাতি যেমন ছড়িয়ে গেল, তেমনি সারা বিশ্বের বহুমূত্র রোগীর তিনি কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে রইলেন।

যাহোক, ব্যাণ্টিং যখন ডাক্তার হওয়ার প্রায় আধাআধি অবস্থায় পৌঁছেছেন তখন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং এই যুদ্ধের বদৌলতে ১৯১৬ সালে তিনি ক্যানেডিয়ান আর্মি ইউনিটে যোগ দিয়ে, একই দিনে পুরোপুরি ডাক্তার ও ক্যাপ্টেন হওয়ার সুযোগ লাভ করলেন। অবশ্য এতে

কপাল তার খোলেনি কিছু। কেননা, তিন বছর পর যখন তিনি দেশে ফিরলেন তখন তাঁর হাত যেমন ছিল কপর্দক শূন্য, তেমনি সে হাতে ছিল যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হওয়ার ফলে এক বিরাট ক্ষত চিহ্ন। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে

ফ্রেডারিক জি, ব্যান্টিং

সাহস ও দক্ষতা দেখানোর জন্য তিনি মিলিটারী ক্রস লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য যুদ্ধে যোগ দিয়ে, এমন দুই স্মারক চিহ্ন সেখানে লাভ করা সত্ত্বেও দেশে ফিরে শেষ পর্যন্ত তাতে কোনো ফল দিলো না, পুরোপুরি বেকার অবস্থায় তাঁর কাটলো কিছুদিন।

গবেষণার কাজে অবশ্য ব্যান্টিং-এর বরাবরই ঝোঁক ছিল। কিন্তু এমন কাজে লিপ্ত থাকলে সুষ্ঠুভাবে যে সংসার চলে না, সে কথা তিনি ভাল ভাবেই জানতেন বলে এমন একটি চাকুরী তিনি খুঁজছিলেন—যার সাথে তাঁর ডাক্তারী প্র্যাকটিসেরও সুবিধা হয়! ভাগ্যক্রমে তেমন এক চাকুরি জুটে গেল—অন্টেরিয়ার লণ্ডন শহরের বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিকলাঙ্গ রোগীর শল্য চিকিৎসা সম্পর্কে শিক্ষাদানের কাজ। দিনে ৬ ঘণ্টার মত সেখানে থাকতে হবে, কাজেই বাকী সময় ডাক্তারী প্র্যাকটিসের সুযোগ মিলবে।

১৯২০ সালের জুলাই মাসের দিকে তাই তিনি লণ্ডন শহরের বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিয়ে, সেই সঙ্গে নিজের প্র্যাকটিসও শুরু করলেন। কিন্তু বিধি বাম। প্র্যাকটিস মোটেই জমলো না, মাসে বড় জোর বিশ টাকার মত এদিকে দাঁড়াল তাঁর রোজগার। ঠিক করেছিলেন প্র্যাকটিস চালিয়ে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে তিনি বিয়ে করবেন। কনেও ঠিক ছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও ডাক্তারী প্র্যাকটিসে তিনি প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেন না বলে, সে কনেও শেষটায় ধৈর্য হারালো, বিগড়ে গিয়ে বিয়ে করলো এক বড় ব্যবসায়ীকে।

ব্যান্টিং-এর বয়স তখন উনত্রিশের কাছাকাছি। বয়সে যুবক, কিন্তু ইতিমধ্যেই তিনি যেন সকল কর্মোৎসাহ, উদ্দীপনা হারিয়ে ফেলেছেন—কোনোদিকে কোনো আশার আলো তাঁর নজরে পড়ে না—চারিদিকে শুধু নৈরাশ্যের ছায়া! সান্ত্বনার মধ্যে এটুকুই যে, তিনি ভারমুক্ত। সংসারের কোনো ঝামেলা নেই, কোনো পরিবার পরিজন নেই—তাঁর আস্তানায়, কদাচিত কখনও হয়ত রোগীর দেখা মেলে—সারাদিনের কাজের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ ৬ ঘণ্টার মত যেটুকু কাজ, বাকী সময় তাঁর পূর্ণ অবকাশ। কিন্তু এ অবকাশ যে দুর্বিসহ। ব্যান্টিং তাই ছবি আঁকা শুরু করলেন, আর অন্যদিকে খুঁজতে লাগলেন উপরি আয়ের জন্য অন্য কোনো চাকুরি।

এহেন যখন তাঁর অবস্থা, তখন একদিন তাঁর এক বন্ধু খবর নিয়ে এলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীর তত্ত্ব বিভাগটি বিভক্ত করার জল্পনা চলছে, তাই এক জন পার্ট টাইম লোক সেখানে নেওয়া হবে। খবর দিয়ে বন্ধু বললেন—"তোমার হাতে তো প্রচুর সময়, যাও না একবার মিলার সাহেবের কাছে? কাজটি নেয়ার একটু চেষ্টা করে দেখ না?"

—"কিন্তু এ যে শারীরবৃত্তের ব্যাপার—! ছাত্র বয়সে বাধ্য হয়ে যেটুকু পড়তে হয়েছে, সেওতো সাত বছরের কথা! এই সম্বল নিয়ে কি . . .।"

—"তোমার কোনো একটা চাকুরির দরকার, নয় কি?"

—"নিশ্চয়ই, চাকুরি আমার ভীষণ প্রয়োজন।"

—"তবে একটু চালবাজীই কর না কেন বন্ধু? না হয় কিছুটা মিথ্যাই বলা হল! মিলার সাহেবকে বলবে—ইংল্যাণ্ডে এ বিষয়ে কিছু কাজ তুমি

করেছ—ডাক্তারী লাইনেইতো ছিলে সেখানে, কাজেই কেউ আর খুঁচিয়ে যাচাই করে তা দেখতে যাবে না!

ব্যান্টিং হেসে বললেন—"ঠিক আছে, যাব আমি। তবে তোমার উপদেশ মাফিক মিথ্যে বলবো না, সত্য কথাই বলবো, আর তা বেশ জোরেসোরেই বলবো।" এই বলে তিনি শারীরবৃত্ত বিভাগের ডাক্তার মিলার সাহেবের সঙ্গে দেখা করে ঐ চাকরির আবেদন জানালেন। বললেন যে—চাকুরিটি তাঁর খুবই প্রয়োজন, কেননা, যে আথিক দুর্গতি তাঁর চলছে, তা তাঁর পক্ষে দুর্বিসহ। সেই সাথে এ চাকুরি পাওয়ার মত তাঁর যে কোনো যোগ্যতা বা পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা নেই—তাও তিনি খোলাখুলি বললেন। তবে এটুকু আশ্বাস ও নিশ্চয়তা তিনি দিলেন যে, তাঁর যেমন প্রচুর অবকাশ রয়েছে—তাতে তিনি ছাত্রদের জানার জিনিস-গুলিকে সেরা ছাত্রদের চেয়েও অনেক আগে সংগ্রহ করতে পারবেন, এমনকি, পাঠ্যপুস্তকের কয়েকটি অধ্যায়কে তিনি আগাম তাঁর মগজে পুরতেও পারবেন! ডাক্তারী প্র্যাকটিস তিনি করলেও রোগীপত্রের তেমন পাত্তা নেই—কাজেই এ চাকুরি যে তার কত প্রয়োজন তা আর বিশদভাবে বলার দরকার পড়ে না,—দয়া করে চাকুরিটি তাই তাঁকে দিতেই হবে!

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে কোনো চাকুরি লাভের—এহেন আব্দার বা দাবীতে, প্রথমে আশ্চর্য, পরে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন ডাক্তার মিলার। অতি কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন—"বলিহারী যাই ডাক্তার ব্যান্টিং চাকুরির জন্য আপনার উমেদারীর বহর দেখে! আপনার উপরিওয়ালা কখনও যদি আপনার চাকুরি লাভের এহেন নতুন ও চমকপ্রদ পন্থা প্রয়োগের কথা শোনেন, তবে নিশ্চয় বলতে পারি,—হাসতে হাসতে তাঁর বছর খানিকের—আয়ু কমে যাবে! তবে সে যাই হোক, আমি অবশ্য আপনার সততা ও স্পষ্টবাদিতা, তদুপরি আপনার আত্মপ্রত্যয়ের জন্য সত্যি মুগ্ধ হয়েছি, আর তাই সত্য কথাটাই জানাই আপনাকে। এ পর্যন্ত এই চাকুরীর জন্য আপনিই একমাত্র আবেদনকারী—এবং আপনাকেই দেয়া হল এই চাকুরি! কন্‌গ্রাচুলেশনস্।" বলে তিনি করমর্দনের জন্য হাত বাড়ালেন ডাক্তার ব্যান্টিং-এর দিকে—আর ব্যান্টিংও

হাসতে হাসতে গভীরভাবে তাতে সাড়া দিলেন। এবং এমনিভাবে, ভাগ্যনিয়ন্তার বিচিত্র বিধানে, ব্যান্টিং তাই সরকারীভাবে শারীরতত্ত্ববিদ হিসাবেও একদিন স্বীকৃতি পেলেন।

ব্যান্টিং তাঁর এই নতুন চাকরি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যেতে লাগলেন। পাছে ছাত্রদের মধ্যে কেউ তাঁর চেয়ে বেশী কিছু জেনে তাঁকে জব্দ করে বসে, সেজন্য তিনি প্রতিদিন ক্লাসের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে বসে বসে পড়াশুনা করতেন, বাড়ীতেও রাত জেগে গাদা গাদা বইপুস্তক ঘাটতেন, নোট টুকতেন এবং এমনি করে সর্বতোভাবে তিনি প্রস্তুতি নিতেন পরের দিনের ক্লাসের জন্য!

এমনই একদিন ১৯২০ সালের ৩০শে অক্টোবরের রাতের ঘটনা। রোজকার মত বই খুলে তিনি পড়তে বসেছেন। প্যাংক্রিয়াস সম্বন্ধে পরের দিন ক্লাসে তাঁকে পড়াতে হবে। রাত জেগে জেগে তাই তিনি এই গ্রন্থি সম্পর্কে তখন পর্যন্ত জানা সমস্ত তথ্য একে একে সংগ্রহ করলেন এবং সেগুলি টুকে শেষের দিকে লিখলেন—আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হান্‌সের সঙ্গে বহুমূত্র রোগের যেন একটা সংযোগ রয়েছে। কেননা, বহুমূত্র রোগে মৃত ব্যক্তিদের এই আইলেটগুলি কখনও সবল থাকে না, শুকিয়ে প্রায় না থাকার মত হয়ে যায়।

বহুমূত্র রোগ সম্পর্কে অবশ্য এর চেয়ে বেশী কিছু তখন জানা ছিল না। কিন্তু এই জানা তথ্যগুলি লিখে শেষ করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়লো তাঁর এক পুরানো, অন্তরঙ্গ বন্ধু—জো গিলক্রাইস্টের কথা—আর সেই সাথে তাঁর অজান্তে বুক থেকে বেরিয়ে আসলো এক দীর্ঘশ্বাস। বেচারা জো, এই বহুমূত্র রোগের কবলে পড়ে এখন সে মরণ পথের পথিক! নিজে ডাক্তার হয়ে জো'এর পক্ষে যেমন, তেমনি কারও পক্ষেও এ ব্যাপারে করার কিছু ছিল না। অসহায়ভাবে তাই ব্যান্টিং ভাবছিলেন—হায়, যে কোনোদিন এখন মৃত্যুদুত এসে জো'কে সরিয়ে নেবে পৃথিবী থেকে দূরে, পরপারে—চিরতরে হারাবেন তিনি তাঁর প্রিয়তম বন্ধুকে।

বন্ধুর এই নির্মম পরিণতির কথা ভাবতে ভাবতে তিনি শুতে গেলেন, হাতে নিলেন একটি সাময়িক মেডিক্যাল জার্নাল,—ঘুম না আসা পর্যন্ত

পড়ার জন্য। জার্নালটি সেদিনের ডাকে এসেছিল লাইব্রেরীতে। হিসাবের খাতায় তখনও সেটি ওঠেনি ; কিন্তু আগ্রহী পাঠক হিসাবে লাইব্রেরীয়ান সাহেব একটু খাতির দেখিয়েছেন তাঁকে, কাল সকালের দিকে ফেরৎ দিলেই চলবে।

জার্নালে চোখ বুলাতে গিয়ে প্রথমে তাঁর নজরে পড়লো বহুমূত্র রোগের যোগসূত্র সম্পর্কে অধ্যাপক মোজেস ব্যারনের একটি প্রবন্ধ। পরের দিন ক্লাসে বলার জন্য হয়ত কোনো নতুন তথ্য এতে পাওয়া যেতে পারে ভেবে, প্রথমে সেটিই তিনি পড়তে শুরু করলেন এবং পড়তে পড়তে এক সময়ে একবারে তন্ময় হয়ে গেলেন, নোট টোকার কথা পর্যন্ত ভুলে গেলেন তিনি। ডাক্তার ব্যারন, গলষ্টোন বা পিত্ত পাথুরি সম্পর্কে ছিলেন একজন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ। জন কয়েক পাথুরি রুগীর ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষ্য করে—এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে, পিত্তাশয়ে পাথর হয়ে যে সকল রোগীর মৃত্যু হয়, তাদের ক্ষেত্রে এই পাথরের চাপে প্যাংক্রিয়াসের জারক রস সৃজনের কোষগুলিকে শুকিয়ে যেতে দেখা যায়, কিন্তু আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হানস্ অক্ষত এবং সুস্থ থাকে। শুধু তাই নয়, আরও দেখা যায় যে, জীবিতকালে তারা কখনও বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয় না, পিত্ত পাথুরি রোগেই তাদের মৃত্যু হয়। কুকুরের প্যাংক্রিয়াসের নল সেলাই করে ডাঃ ব্যারন সে সব ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটিই লক্ষ্য করেছেন—তাদেরও প্যাংক্রিয়াসের জারক রস সৃজনের কোষগুলি শুকিয়ে যায়, কিন্তু আইলেটের কোষগুলি সুস্থ ও অক্ষত থাকে - তাদের ক্ষেত্রেও বহুমূত্র রোগ হতে আর দেখা যায় না।

কিন্তু এর কারণ কি? তবে কি শুধু মাত্র আইলেট থেকে যে হরমোন নিঃসৃত হয় তাই দেহের শর্করাকে পুড়িয়ে শরীরে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে? ইতিপূর্বে বহুমূত্র রোগীকে গোটা প্যাংক্রিয়াস খাইয়ে কিংবা তার রস ইঞ্জেকশন দিয়েও দেখা গেছে—তাতে কোনো ফল হয় না, অথচ প্যাংক্রিয়াসের জারক রস যখন পিত্ত পাথরের চাপে প্রবাহিত হতে পারে না, এই রস নিঃসারক কোষগুলি যখন শুকিয়ে

যায়, —আশ্চর্য, তখন আর বহুমূত্র রোগের আবির্ভাব ঘটে না, মানুষের কিংবা কুকুরের দেহে।

ভাবতে গিয়ে ব্যাণ্টিং সহসা যেন এই রহস্যের একটা সমাধান খুঁজে পেলেন। দেহের মধ্যে প্যাংক্রিয়াস যখন থাকে তখন তার জারক রসের সাথে আইলেট নিঃসৃত হরমোনের হয়ত কোনো বৈরী ভাব থাকে না, কিন্তু দেহ থেকে প্যাংক্রিয়াস সরিয়ে আনলে, তাদের মধ্যে যেন দেখা দেয় দ্বন্দ্ব, প্যাংক্রিয়াসের জারক রস আইলেটের হরমোনকে হয়ত বিনষ্ট করে—যার ফলে শরীর থেকে সরিয়ে আনা প্যাংক্রিয়াসের রসে বহুমূত্র রোগে কোনো উপকার আর দর্শায় না। কিন্তু এই বিনাশক রসকে বিনষ্ট করার উপায় কি?

ব্যাণ্টিং অবশ্য তার এক উপায় ডাঃ ব্যারনের এই প্রবন্ধ থেকেই পেয়ে গেলেন। গভীর রাত জেগে ভেবে ভেবে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন, ঠিক করলেন পরীক্ষা করে তা দেখতে হবে। আইলেট নিঃসৃত হরমোনের অভাব সত্যিই যদি বহুমূত্র রোগের কারণ হয়, তবে আলাদা ভাবে কেবল আইলেটের হরমোন প্রয়োগ করে এই রোগ সারাতে না পারলেও অন্ততঃ পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণতো করা যেতে পারে?

পরে যদি এই পরীক্ষার কথা ভুলে যান তাই তখনই তিনি বিছানা ছেড়ে, তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে, এই কথা কয়টিই তাঁর নোট বইয়ে লিখে রাখলেন—"কুকুরের প্যাংক্রিয়াস বেঁধে রাখ। সেটি ক্ষয়ের জন্য ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ অপেক্ষা কর। পরে বাকী অংশের নির্যাস নাও।"

কিন্তু কে জানত—এমন কি ব্যাণ্টিং সেদিন নিজেও কি জানতেন, তন্দ্রাজড়িত চোখে, রাত জাগার ক্লান্তি আর অবসন্ন দেহমন নিয়ে তিনি যে মাত্র তিন লাইনে এই নোটটি তাঁর নোট বইয়ের পাতায় লিখে রেখেছিলেন, তাই পরে একদিন লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করবে—আসন্ন, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে প্রায় স্বাভাবিক করে তুলবে অগণিত বহুমূত্র রোগীর দৈনন্দিন জীবন যাপন?

এই প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু যে এনোফেলিস মশা বহন করে তা আবিষ্কার করতে

গিয়ে রোলাণ্ড রস যখন অণুবীক্ষণে একের পর এক মশার পাকস্থলীতে সে জীবাণু খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ করেই এক মশার পাকস্থলীতে নজরে পড়লো তাঁর সেই কাংক্ষিত জীবাণু। কিন্তু চোখ দুটি তখন তাঁর এতই ক্লান্ত, দেহমন এতই অবসন্ন যে, তখন তখনই তিনি যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এতদিনের পরিশ্রম তাঁর সার্থক হয়েছে, সাধনায় তাঁর সিদ্ধি লাভ ঘটেছে, এক বিরাট এবং গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার তিনি করেছেন! বেশ কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যখন তিনি জাগলেন তখনই তিনি বুঝতে পারলেন, একটা বিরাট কিছু তিনি আবিষ্কার করেছেন, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

যাহোক, ঘুম থেকে জেগে উঠে ব্যাটিং যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করলেন, তা হলো, ডাক্তারী প্র্যাকটিস বা ছাত্র পড়ানো আর নয়, কি করে বহুমূত্র রোগ নিরাময় করা যায়, সে সম্পর্কেই তিনি এখন থেকে কাজ করবেন, শুধু আইলেটের নির্যাসে বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভবপর কিনা, তাই তিনি প্রথমে কুকুরের উপর পরীক্ষা করে দেখবেন।

ব্যাটিং-এর এই বেপরোয়া সঙ্কল্পের কথা শুনে ডাঃ মিলার প্রথমে আশ্চর্য হলেন; আর তিনি আশ্চর্য হবেন নাই বা কেন? যে বিষয়ে ব্যাটিং-এর কোনো অভিজ্ঞতা নেই, তারই উপর গবেষণা? কিন্তু সব কিছু শুনে এবং ডাঃ ব্যারনের প্রবন্ধটি পড়ে তিনি শেষটায় ব্যাটিং-এর সঙ্কল্পে সায় দিয়ে বললেন "গবেষণা যদি করতেই হয়, তবে এক কাজ করুন ডাঃ ব্যাটিং। এখানেতো এ ধরনের গবেষণা চালানোর সুবিধা নেই, আপনি বরং অধ্যাপক ম্যাকলিয়ডের সঙ্গে দেখা করুন। তাঁর ল্যাবরেটরি আমাদের চেয়ে অন্ততঃ দশগুণ বড়, তাছাড়া ডাঃ ম্যাকলিয়ড এ বিষয়ে একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ, অনেক সাহায্য ও পরামর্শও আপনি পাবেন তাঁর কাছ থেকে।"

ডাঃ মিলারের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যাটিং ডাঃ ম্যাকলিয়ডের সাথে দেখা করলেন, কিন্তু যে আশঙ্কা তিনি করেছিলেন, তাই হলো। ব্যাটিং নিজেও জানতেন হাড়ের ডাক্তার হয়ে এ তাঁর অনধিকার চর্চা, বিশেষ করে এ দিকে যখন তাঁর কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তাই

ডাঃ ম্যাকলিয়ড যখন সেদিকে তাঁকে কটাক্ষ করলেন তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়েই থাকলেন এবং আরো নাজেহাল হলেন যখন ম্যাকলিয়ড সাহেব এ সম্পর্কে কতটা কাজ হয়েছে, অধ্যাপক মুনীরের শিষ্যদের গবেষণার ফলাফল কি, ইত্যাদি জানতে চাইলেন। জবাবে ব্যাণ্টিং কেবল হাত কচলিয়ে—আমতা আমতা করে এটুকুই বলতে পেরেছিলেন—"তেমন কিছু জানিনা স্যার। কিছু কিছু কাজ হয়েছে জানি, তবে কতটা হয়েছে ঠিক বলতে পারবো না।" "তা হলে বলুন?" নাক সিটকালেন ডাঃ ম্যাকলিয়ড। বিরক্তির সুরে বললেন—"এমন অজ্ঞতা নিয়ে আপনি করবেন গবেষণা? যান, আগে সেগুলিই জেনে আসুন···।"

বিপদ বুঝে ব্যাণ্টিং ভিন্ন পথ ধরলেন। বিনীত ভাবে বললেন—"যাচ্ছি স্যার, তবে ভরসা দিচ্ছি সবকিছু জানতে আমার বেশী সময় লাগবে না—তাছাড়া দেখুন, আমি বেশী কিছু চাইছি না আপনার কাছে,— পরীক্ষার জন্য কেবলমাত্র দশটি কুকুর—একজন সহকারী—আর এই ল্যাবরেটরির মধ্যে একটুখানি খালি জায়গা—তাও মাত্র আট সপ্তাহের জন্য। এখানকার পুরানো ছাত্র হিসাবে কিছুটা দাবীও তো আমার রয়েছে আপনার কাছে? অন্ততঃ সেদিক থেকেও বিবেচনা করে—এ দয়াটুকু—যদি করেন আপনি?"—কিন্তু এতেও মন গললো না ম্যাকলিয়ড সাহেবের। বললেন —"দেখুন ডাঃ ব্যাণ্টিং, অহেতুক সময় ও কতকগুলি কুকুর নষ্ট করার পক্ষপাতী আমি নই। এ ধরনের পরীক্ষায় যদি কাজ হতো,—আপনিতো জানেন না কিছুই,—ইউরোপের বহু বড় বড় শারীরতত্ত্ববিদ—যাঁরা এ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন—পরীক্ষা করছেন—তাঁরা কেউ না কেউ সফল হতেন এতদিনে। কাজেই এ ব্যাপারে যেমন কোনো সাফল্যের আশা করতে পারেন না, তেমনি আমার কাছ থেকেও কিছু আশা করতে পারেন না আপনি,—আমি দুঃখিত ডাঃ ব্যাণ্টিং··· ···।"

স্বভাবের দিক থেকে বেপরোয়া হলেও ব্যাণ্টিং ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির—তাই তিনি আর কথা বাড়ালেন না—তবে এ লজ্জা ও নৈরাশ্য তিনি ঢাকবেন কি করে? চেষ্টা তাঁকে করতেই হবে—ম্যাকলিয়ড সাহেবের কাছে মুখ যাতে খুলতে পারেন—সেজন্য কোন্‌দিকে কতটা কাজ হয়েছে—

তা তাঁকে জানতে হবে—আর সেই প্রচেষ্টাই চললো কিছুদিন। দ্বিতীয় বার এমনি কিছুটা প্রস্তুতি ও প্রভাবশালী তাঁর কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সুপারিশ নিয়ে তাই তিনি আবার হাজির হলেন ম্যাকলিয়ড সাহেবের দরবারে। কিন্তু এবারও সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। আর কোনো আশা নেই দেখে তিনি এ ব্যাপারে একেবারে হাল ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু বিধির বিধান যেখানে ভিন্ন—সেখানে ভাগ্যই তাঁকে একদিন আবার সেই পথে টেনে নিল! সে বছরে, বসন্তের দিকে, প্রকৃতির মত তাঁর ভাগ্যও যেন প্রসন্ন হলো। খবর পেলেন—গ্রীষ্মের ছুটি কাটাতে ম্যাকলিয়ড সাহেব যাচ্ছেন তাঁর নিজ বাড়ীতে—স্কটল্যাণ্ডে। ব্যান্টিং ভাবলেন—এত দূরেই যখন তিনি যাচ্ছেন—ল্যাবরেটরি যখন অনেকটাই বন্ধ থাকবে এতদিন—তখন তিনি হয়ত তাঁর আবেদনে আর আপত্তি করবেন না। এবং আশ্চর্য, ঘটলোও তাই। ব্যান্টিং তাঁর সাথে দেখা করে অনুরোধ করতেই তিনি কেন যেন সহজেই রাজি হয়ে গেলেন!

হয়তো ভেবেছিলেন - নাছোড়বান্দা যুবক কিই বা এমন চাইছে তাঁর কাছে? কিংবা হয়তো যুবক ব্যান্টিং-এর মধ্যে এমন কিছু লক্ষ্য করে-ছিলেন যা তিনি তাঁর সহকারীদের মধ্যে লক্ষ্য করেন নি। অবশ্য রাজি হয়ে ব্যঙ্গ করে এও বলেছিলেন—"তুমিতো আবার হাড়ের ডাক্তার! কাজেই কুকুরের প্রস্রাবে চিনির মাত্রা পরীক্ষা করবে কে? সেতো আর পারবে না তুমি—তাই সে ব্যবস্থাও আমাকে করতে হবে বৈ কি? বেস্ট হয়তো তোমার এ কাজটি করে দিতে রাজি হবে। সেও তো তোমার মত আর এক পাগল! অবশ্য সে আমার পাগলাটে ছাত্র হলেও—একাজে কিন্তু খুবই পটু—সেই হবে তোমার সহকারী,—আর তোমার দশটি কুকুর, কাজের জায়গা তুমি পাবে, সব বন্দোবস্ত আমি ছুটিতে যাবার আগে করে দিয়ে যাব, তবে কথা কি জান? সব অপব্যয়, অপচয় জিনিসের আর সময়ের,—কিন্তু কি আর করা? তোমার মগজ থেকে ঐ ভূতুড়ে ভাবনাটাকে যত তাড়াতাড়ি পারা যায় তাড়াতে হবে তো?"

কিন্তু ম্যাকলিয়ড সাহেব কি জানতেন না, এমনি অদ্ভুত, ভূতুড়ে ভাবনাই অনেক বড় বড় আবিষ্কারের মূলে? তিনি কি জানতেন না, এমনি

ভুতুড়ে ভাবনা কারো কারো মগজে হঠাৎ করে ঠাঁই পায় বলেই না তাঁরা এমন উন্মাদনায় উন্মত্ত হয়ে ওঠেন, নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে, এমন কি স্বীয় জীবনকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে অসম্ভবের পথে পা বাড়ান এবং অনেক সময় সফলকাম হন? আশ্চর্য, বিরাট কোনো আবিষ্কার করে বসেন, যা যুক্তিযুক্ত, নিয়মানুগ পথে হয়তো কোনোদিনও আবিষ্কৃত হত না? তাই ম্যাকলিয়ড সাহেব ব্যান্টিং-এর এই ভাবনাকে যতই ভুতুড়ে বলুন, আর তা নিয়ে যতই বিদ্রূপ করুন না কেন, যে ভাবনার ফল লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনকে অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আজও রক্ষা করে চলেছে—সে ভাবনা যে সত্যই ভুতুড়ে ছিল না—ম্যাকলিয়ড সাহেব নিজের জীবনেই তার প্রমাণ পেয়েছিলেন, এমন কি তাঁর জীবনের পরম সৌভাগ্যও একদিন এসেছিলে, ব্যান্টিং-এর এই ভুতুড়ে ভাবনার সূত্রে। কেমন করে? সে কথা পরে বলছি।

১৯২১ সালের ৬ই মে। ব্যান্টিং তাঁর ডাক্তারী প্র্যাকটিস, ছাত্র পড়ানোর পাঠ চুকিয়ে দিয়ে সেদিন টরেণ্টোর মেডিক্যাল স্কুলে ম্যাকলিয়ডের ল্যাবরেটরিতে এসে হাজির হলেন। কাজ শুরু হলো, সহকারী হিসাবে বেস্টকেও পাওয়া গেল। অবশ্য ল্যাবরেটরির যে অংশটি ব্যান্টিং-এর ভাগ্যে জুটলো তা শুধু নামেই ল্যাবরেটরি। ছাদের উপর ছোট্ট খুপরির মত একটি কামরা—তাও জানালা বিহীন। বাইরের আলো বাতাস সেখানে ভালো ভাবে প্রবেশের পথ খুঁজে পায়না—বাইরেই ঘুরে মরে। বেস্ট অবশ্য তাঁর পরীক্ষার কাজটি নীচের তলায় নিজের ডেস্কেই সম্পন্ন করতেন।

যাহোক, এমনি ছাদের উপরের চিলে কোঠায় মে মাসের অসহ্য গরমে, ঘামে ভিজে ব্যান্টিং এবং বেস্ট কুকুরের পেট চিরে প্যাংক্রিয়াসের জারক রসবাহী নলগুলি বেঁধে দিলেন। উদ্দেশ্য ৭।৮ সপ্তাহ পর প্যাংক্রিয়াসের জারক রস তৈরীর কোষগুলি যখন শুকিয়ে যাবে, চুপসে যাবে প্যাংক্রিয়াস, তখন সেই প্যাংক্রিয়াস থেকে যে নির্যাস পাওয়া যাবে তাতে থাকবে শুধু আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হান্‌সের হরমোন, কেননা, সেটিই তখন পর্যন্ত থাকবে সুস্থ এবং সবল। এখন আইলেটের হরমোনই

যদি বহুমূত্র রোগ নিরাময়ের কারণ হয়, তবে এই নির্যাসে থাকবে সেই অজানা হরমোন যা কোনো প্যাংক্রিয়াস সরিয়ে নেয়া বহুমূত্র রোগগ্রস্ত কুকুরকে ইঞ্জেকশন দিয়ে যদি তাকে সত্যিই সারিয়ে তুলতে পারে, প্রস্রাবে তার দেহজ চিনির পরিমাণ যদি কমে আসে, তবেই বুঝা যাবে যে, আইলেটের হরমোনের অভাবেই কুকুর এই রোগে আক্রান্ত হয়।

কিন্তু প্যাংক্রিয়াসের নল বেঁধে রাখার ৭।৮ সপ্তাহ পর তবেই আইলেটের এই নির্যাস তৈরী করার পালা। কাজেই এতদিন শুধু শুধু বসে না থেকে তাঁরা এ বিষয়ে আরো পড়াশুনা, আরো তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। বেস্ট জার্মান ভাষা জানতেন বলে সে ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় তথ্যও তাঁদের জানা হয়ে গেল। কিন্তু এই জ্ঞান লাভ তাঁদের পক্ষে মোটেই সুখের হলো না। যতই তাঁরা বেশী বেশী তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন ততই তাঁরা আশ্চর্য ও নিরাশ হয়ে পড়তে লাগলেন। দেখতে পেলেন, যে কাজ তাঁরা করতে যাচ্ছেন তা এমন নতুন কিছু নয়, ম্যাকলিয়ডের কথাই ঠিক—অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীই অনেক বড় বড় ল্যাবরেটরিতে এমনি ধরনের কাজ করে বিফল হয়েছেন, বিশুদ্ধ অবস্থায় এই হরমোন তাঁরা উদ্ধার করতে সক্ষম না হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। কাজেই কোন্ ভরসায়, কোন্ সাহসে তাঁরা আবার এ কাজে হাত দিতে যাচ্ছেন? সাফল্যের আশাই বা কতটুকু? আর এ ধরনের বিরাট কাজে হাত দেয়ার মত তাঁদের যোগ্যতা আছে কি? আথিক সঙ্গতিই বা কোথায়? তাঁদের না আছে তেমন অর্থবল, এক ধার করা ল্যাবরেটরিতে তাঁরা কাজ শুরু করেছেন, সেও আবার আট সপ্তাহ পর ছেড়ে দিতে হবে। একজন হাড়ের ডাক্তার, অন্যজন পুরো-পুরি ডাক্তার নন, ছাত্র এখনও! এটা কী তাঁদের পক্ষে ধৃষ্টতা নয়?

নৈরাশ্য শুধু এ দিক থেকে নয় - অন্য দিকেও দেখা দিল। জুলাই মাসের প্রথম দিকে যখন অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাঁরা চুপসে যাওয়া প্যাংক্রিয়াসের আশায় পরীক্ষণীয় কুকুরের পেট চিড়লেন, তখন দেখা গেল, সে কুকুরের প্যাংক্রিয়াসটি মোটেই চুপসে যায় নি, দিব্যি আগের মতই রয়েছে সুস্থ এবং সবল। কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা

গেল, এ তাদের ভুলেরই ফসল। ঠিক ভাবে প্যাংক্রিয়াসের নলগুলি বাঁধা হয় নি, তাই এ বিপত্তি। এতদিনের প্রতীক্ষা তাই তাঁদের ব্যর্থ হলো—সব কিছু দাঁড়ালো শুধু পণ্ড শ্রম।

এদিকে আবার ল্যাবরেটরি ব্যবহারের যে ৮ সপ্তাহ সময় তাঁরা পেয়েছিলেন তাঁও শেষ হতে চলেছে—অথচ আসল পরীক্ষায় এখনও তাঁরা হাত দিতে পারেন নি! ভাগ্যের এ পরিহাস, এ পরাজয়কে তাই নীরবে বরণ করা ছাড়া উপায়ই বা কী? কিন্তু এই পরাজয়কে কি সত্যই তাঁরা মেনে নেবেন? অন্ততঃ ব্যান্টিং তেমন স্বভাবের মানুষটি ছিলেন না। দৃঢ় মনোবলে বলীয়ান ছিলেন,—কৃষকের ছেলে ব্যান্টিং। যুদ্ধের সময় যখন তাঁর ডান হাতটি আহত হয়, ক্ষতস্থান বিষাক্ত হয়ে যখন তাঁর জীবন সংশয় দেখা দেয়—তখন অন্যান্য ডাক্তাররা তাঁর হাতটি কেটে ফেলতে চেয়েছিলেন—কিন্তু ব্যান্টিং তা কাটতে দেননি—দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন—"মরবো সেও ভাল; তবু হাত কাটতে দেব না।" —শেষে নিজের ক্ষত নিজেই পরিচর্যা করে সারিয়ে তুলেছিলেন। এবারও তাই সকল বিফলতা ও নৈরাশ্যকে তিনি কাটিয়ে উঠলেন তাঁর অদম্য মনোবলের দৌলতে—সিদ্ধান্ত নিলেন পুনরায় পরীক্ষা করবেন।

ম্যাকলিয়ড সাহেব তখনও ছুটি উপভোগ করছেন ইউরোপে। আট সপ্তাহ সময় তিনি তাঁদেরকে দিয়ে গেছেন—কিন্তু ৮ সপ্তাহ শেষ হলেই তাঁদেরকে যে কাজ বন্ধ করে ল্যাবরেটরি ছেড়ে চলে যেতে হবে এমনতো কোনো নির্দেশ তিনি দেন নি? মনগড়া এমনি এক যুক্তি খাড়া করলেন ব্যাংটিং এবং বেস্টও তাতে সায় দিয়ে বললেন—"ঠিক"!

অতএব আবার কাজ শুরু হলো—কুকুরের পেট চিরে এবারে তাঁরা সযত্নে এবং সঠিকভাবে প্যাংক্রিয়াসের নলগুলি বেঁধে দিলেন। এরপর সেই নির্ধারিত সময় ৮ সপ্তাহ পার হলো, বেস্টের মাইনেও বন্ধ হলো—উপায়ন্তর না দেখে ব্যান্টিং কোনো প্রকারে বেস্টের হাত খরচা চালাতে লাগলেন।

সাধারণতঃ প্যাংক্রিয়াসের জারক রস তৈরী করার কোষগুলি শুকিয়ে আসতে ৬।৭ সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু এতটা সময় দেয়ার সুযোগ তাঁদের



কোথায়? ম্যাকলিয়ড সাহেব ফিরে—আসলেই বিপদ,—ছাড়তে হবে ল্যাবরেটরি। তাই ১৯২১ সালের ২৭শে জুলাই তারিখে, প্যাংক্রিয়াসের নলগুলি বাঁধার মাত্র তিন সপ্তাহ পূর্ণ হতেই তাঁরা কুকুরটির পেট চিরে প্যাংক্রিয়াসের অবস্থা যাচাই করলেন—দেখলেন এবারে সেটি অনেকটাই ছোট হয়েছে, প্রায় বুড়ো আঙুলের সমান। ভাগ্য কি তাঁদের সত্যই সুপ্রসন্ন? তাই আর দেরি নয়—তাড়াতাড়ি কুচি কুচি করে কাটা হলো সেই প্যাংক্রিয়াস—তৈরী করা হলো তার নির্যাস—আর এই নির্যাসের পাঁচ সিসি পরিমাণ নিয়ে ইঞ্জেকশন দেয়া হলো একটি কুকুরকে—যার প্যাংক্রিয়াসটি সম্পূর্ণ সরিয়ে নিয়ে তাকে রোগগ্রস্ত করে তোলা হয়েছিল আগে থেকেই—বহুমূত্র রোগে ভুগে ভুগে সে বেচারী এতটাই কাহিল হয়ে পড়েছিল যে—মাথাটি পর্যন্ত সে আর তুলতে পারতো না।

যাহোক, ইঞ্জেকশন দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কুকুরটিকে কিছুটা সুস্থ বলে মনে হলো—কিন্তু রক্তে চিনির পরিমাণ কমলো কিনা—তা না জানা পর্যন্ত জোর করে কিছু বলা চলে না। বেস্ট কুকুরটির পা থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত নিয়ে তাই ছুটলেন নীচের তলায়, তাঁর পরীক্ষার
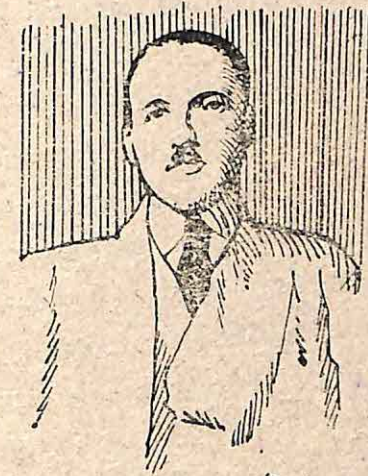
ডাঃ চার্লস এইচ, বেস্ট

টেবিলে, আর এমনিভাবে ঘন্টায় ঘন্টায় কুকুরটির রক্তে চিনির পরিমাণ জানার জন্য পরীক্ষা চললো। রক্ত নিয়ে বেস্ট একবার ছুটে যান নীচে,

আর এই রক্ত পরীক্ষা করে—ব্যাণ্টিংকে তার ফলাফল জানানোর জন্য আবার ছুটে আসেন ওপরে। বেস্টের পক্ষে এই ছুটোছুটি আর হয়রানি বোধ করি তাঁর কাছে পীড়াদায়ক ছিল না—কেননা, প্রতিবারেই তিনি তাঁদের প্রত্যাশিত ফলই পাচ্ছিলেন—ঘণ্টায় ঘণ্টায় তিনি আনন্দের সংবাদটাই বহন করে আনছিলেন ব্যাণ্টিং-এর কাছে—রক্তে চিনির পরিমাণ ক্রমেই কমে আসছে। তারপর এক সময়ে বেস্ট বয়ে আনলেন সেই চরম আনন্দ-সংবাদ—"ফ্রেড, রক্তে চিনির পরিমাণ একেবারে নর্মাল!" আনন্দে, আবেগে, ব্যাণ্টিং জড়িয়ে ধরলেন বেস্টকে!

তবে কি সত্যই তাঁদের ধারণা ঠিক হতে চলেছে?—সফল হতে চলেছে তাঁদের এতদিনের তিতিক্ষা আর পরিশ্রম?

কিন্তু এরপর তাঁদের জীবনে আসলো যে অমানুষিক পরিশ্রম—তার তুলনায় এ পরিশ্রম একেবারে তুচ্ছ। রাত দিন কাজ আর কাজ। নিয়মিত ইঞ্জেকশন দেয়া, ঘণ্টায় ঘণ্টায় রক্ত, প্রস্রাব সংগ্রহ করে সেগুলি পরীক্ষা করা। ঘুমে যখন চোখ জড়িয়ে আসে তখন পালাক্রমে, বাসায় নয়, ঐ চিলে কোঠার গরমের মধ্যে একটি বেঞ্চির উপর কাজের পোশাকেই সটান শুয়ে ক্লান্ত চোখ দুটি আর দেহকে একটু জুড়িয়ে নেয়া বা কখনও ক্ষণিকের জন্য একটু ঘুমানো।

কিন্তু তবু এই প্রাণান্তকর পরিশ্রম তাঁদের কাছে মোটেই নিরানন্দ ও ক্লান্তিদায়ক ছিল না। যে কুকুরটি একটু আগেও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি খেতে তার মাথাটি পর্যন্ত তুলতে পারতো না—ইঞ্জেকশন নেয়ার পর সে যখন তাঁদের দিকে মাথা তুলে তাকায়—শুধু তাকায় না, যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তার লেজ নাড়ে—তখন তাঁদের সে কী আনন্দ! বিস্ময়, পরিতৃপ্তি আর সুখের কোনো সীমা থাকতো না, যখন দু'চোখ ভরে তাঁরা দেখতেন—মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়া, জীবনের শেষ প্রান্তে পেঁাছানো এই কুকুরগুলি তাঁদের ইঞ্জেকশন পেয়ে যেন নবজীবন লাভ করছে,—আবার তারা সজীব ও উজ্জীবিত হয়ে উঠছে। এতক্ষণে যাদের দেহ প্রাণহীন, অসাড় হয়ে যাওয়ার কথা—তারাই এখন উঠে দাঁড়ায়, লেজ নাড়ে, হেঁটে বেড়ায়। আগে এক ফোঁটা চিনির পানি যাদের

দেহ ধরে রাখতে পারেনি,—সবটুকু চিনি নিঃসৃত হতো তাদের প্রস্রাবের সাথে,—ইঞ্জেকশন নেবার পর সামান্য পরিমাণ চিনিও আর নির্গত হয় না তাদের প্রস্রাবে। চিনির পানি খেলেও তাদের রক্তে কিংবা মূত্রে চিনির পরিমাণ আর বৃদ্ধি পায় না। ভুক্ত দ্রব্য থেকে যে দেহজ চিনি তৈরী হয় তাদের দেহে,—তার সবটুকু এখন দৈহিক দহন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হয়, তাপ তথা শক্তি উৎপাদন করে তাদেরকে কর্মক্ষম করে তোলে।

কিন্তু তাঁদের এই সাফল্যের আনন্দ অন্য একটি কারণে যেন ম্লান হয়ে আসে,—দেখা দেয় নৈরাশ্য। দেখা গেল, এই নির্যাস যতক্ষণ রোগগ্রস্ত কুকুরগুলির দেহে থাকে ততক্ষণই তারা কেবল সবল ও সঞ্জীবিত থাকে, ইঞ্জেকশন বন্ধ করলে পুনরায় তারা নির্জীব হয়ে পড়ে এবং এক সময়ে তাদের মৃত্যু ঘটে। প্রথম কুকুরটিকে একদিন মাত্র বাঁচিয়ে রাখা গেল, এরপর একটিকে ১২ দিন, আর একটিকে ২১ দিন। "মারজোরী" ছিল তাঁদের সবচেয়ে প্রিয় কুকুর। থাবা দিয়ে রক্ত পরীক্ষার জন্য টেস্ট-টিউব পর্যন্ত সে তাঁদের হাতে তুলে দেবার কায়দাটি শিখেছিল। সেই মারজোরীকেও ৭০ দিনের বেশী বাঁচিয়ে রাখা গেল না। প্রয়োজনের সাথে তাল রেখে আইলেটের নির্যাস, যার নাম তাঁরা রেখেছিলেন "আইলেটিন", সেই আইলেটিন পরিমিত পরিমাণে তখনও তাঁরা তৈরী করতে পারছিলেন না বলে,—তারই অভাবে মারা গেল তাঁদের প্রিয় কুকুর মারজোরী।

শুধু তাই নয়, নৈরাশ্য ও ভাবনা দাঁড়াল আর এক দিক থেকেও। কেবল যে পরিমিত পরিমাণ আইলেটিন তাঁরা তৈরী করতে পারছিলেন না, তা নয়, দেখা গেল, একটি কুকুরের চুপসে যাওয়া প্যাংক্রিয়াস থেকে যে পরিমাণ আইলেটিন তাঁরা উদ্ধার করতে পারছিলেন, তাতে একটি মাত্র —রোগগ্রস্ত কুকুরকে কেবল মাত্র একদিনের জন্য বাঁচিয়ে রাখা যায়। এমন যেখানে অবস্থা, সেখানে সারা পৃথিবীর হাজার হাজার রোগীকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখার আশা তাঁরা কী করে করতে পারেন? কাজেই —তাঁদের এ আবিষ্কার,—কোন্ কাজ দেবে, কোন্ উপকারেই বা আসবে মানুষের? ব্যান্টিং ও বেস্টের কাছে তাই মনে হলো—সব পণ্ডশ্রম, বৃথাই তাঁরা খেটে মরলেন এতদিন।

অবশ্য এ আবিষ্কারের মূল্য দাঁড়াতো, যদি কোনো উপায়ে প্রচুর পরিমাণে আইলেটিন তৈরী করা সম্ভব হতো। ব্যান্টিং তাই বই পুস্তক, পুরানো পত্র পত্রিকা, নথি পত্র প্রভৃতি খুঁজে দেখতে লাগলেন—যদি তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়। সৌভাগ্যবশতঃ এমনি তথ্যাদি ঘাটতে ঘাটতে একদিন রাতে এক ডাক্তারের প্রকাশিত এক তথ্যের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হলেন। ডাক্তারটি বলেছেন,—মাতৃগর্ভে ভ্রূণের অবস্থায় শিশু যখন থাকে, তখন জারক রসের প্রয়োজন নেই বলে, তার প্যাংক্রিয়াসে আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হানসের অংশটাই থাকে বেশী। ব্যান্টিং তাই ভাবলেন—যদি কোনো ভাবে প্রচুর পরিমাণে কোনো প্রাণীর ভ্রূণ পাওয়া যেত—তবে হয়ত বেশী পরিমাণে আইলেটিন তৈরী করা সম্ভব হত। কিন্তু এত ভ্রূণ তিনি পাবেন কোথায়?

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ তাঁর ছেলেবেলার কথা মনে পড়লো। কৃষকের ছেলে তিনি, গ্রাম দেশে ছেলেবেলায় তিনি দেখেছিলেন যে, বেশী চর্বিওয়ালা মাংসের জন্য গ্রামবাসীরা বা গ্রামের কসাইরা ২/৩ মাসের গর্ভবতী গাভী জবাই করতো। এখানেও হয়ত তাই করা হয় মনে করে তিনি শহরের কসাইখানাগুলিতে খোঁজ করলেন এবং বেশ কিছু ভ্রূণ সংগ্রহ করে আনলেন। তারপর এদের প্যাংক্রিয়াসের নির্যাস তৈরী করে পরীক্ষা করে দেখলেন যে এই নির্যাসেও রোগগ্রস্ত কুকুরের উপকার হয়। কাজেই আইলেটিনের একটি ভাল উৎস তাঁরা পেয়ে গেলেন। বেশী পরিমাণে আইলেটিন পাওয়ার সমস্যা তাঁদের ঘুচে গেল, যতদিন খুশি রুগ্ন কুকুরকে এখন তাঁরা বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। অবশ্য পরে তাঁরা নিষ্কাশন পদ্ধতি আরো উন্নত করে ভেড়া, শূকুর এমনকি যে কোনো প্রাণীর ভ্রূণের প্যাংক্রিয়াস থেকে প্রচুর পরিমাণে আইলেটিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

যাহোক, এই সাফল্যের পর তাঁরা তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করলেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের শারীরবৃত্ত বিভাগের জার্নাল ক্লাবে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে তাঁরা তাঁদের সব কাজ দেখালেন। চিলে-কোঠার গণ্ডি পেরিয়ে এই সর্বপ্রথম তাঁদের সাফল্যের কথা বাইরের বিজ্ঞানীদের কাছে প্রকাশ পেল, এবং প্রশংসা পেলেন তাঁরা সবার কাছ

থেকে। কিন্তু যে প্রশ্নটি সবার কাছে বড় হয়ে দেখা দিল—তাহলো, আইলেটিন কি কুকুরের মত মানুষেরও উপকারে আসবে? যদি আসে তবেই এই আবিষ্কারের যথার্থ সার্থকতা।

কিন্তু মানুষের ওপর পরীক্ষা করার সুযোগ তাঁদের কোথায়? কোন্ রুগী এমন অজানা, অনিশ্চিতের সম্ভাবনায়, বিশেষ করে এমন দুই তরুণ গবেষকের হাতে নিজের জীবনকে সঁপে দেবে? তবে কপাল গুণে তেমন এক রুগীও একদিন জুটে গেল। তাঁদের সে রুগীটি হলো টরেন্টো জেনারাল হাসপাতালের এক ১৪ বছরের বালক, নাম লিওনার্ড থমসন। দু'বছর ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগে ভুগে সে এখন এতই দুর্বল যে, বেচারা মাথাটি পর্যন্ত তার তুলতে পারে না—দেহের ওজন মাত্র ৬৫ পাউণ্ডে এসে দাঁড়িয়েছে। বাঁচার কোনো আশাই তার নেই—ডাক্তাররাও হাল ছেড়ে দিয়েছেন—বড় জোর কয়েক সপ্তাহ তার পরমায়ু।

অবশ্য এই রুগীটিকে পাওয়ার আগেই ম্যাকলিয়ড সাহেব ছুটি কাটিয়ে তাঁর ল্যাবরেটরিতে ফিরেছেন। তবে ফিরে এসে তিনি ব্যান্টিংকে যেমন ল্যাবরেটরি থেকে তাড়িয়ে দেননি—তাঁদের দুজনকে তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ দিয়েছিলেন, তেমনি, বিশেষ কিছু জানতেও চাননি। শুধু প্যাংক্রিয়াস ব্যতিরেকেই কতকগুলি কুকুর দিব্যি বেঁচে আছে দেখে কৌতুক বোধ করেছিলেন। বলেছিলেন "ব্যাপারটা বেশ মজারতো!" আর কিছু নয়। তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল, ম্যাকলিয়ড সাহেব ব্যান্টিং-এর প্রতি এখন আর ততটা বিরূপ নন। ব্যান্টিং ও বেস্টের পক্ষে এতে অবশ্য সুবিধাই হলো,—তাঁদের আগের কাজটি তাঁরা এখনকার নিয়মিত কাজের ফাঁকে ফাঁকে চালিয়ে যেতে পারবেন।

১৯২২ সালের ১১ই জানুয়ারী, চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসের আর এক স্মরণীয় দিন, সেদিন ব্যাধির বিরুদ্ধে বিজ্ঞানী মানুষের আর এক অভিযানের পালা শুরু হলো। থমসনের শীর্ণকায় একটি হাতে ব্যান্টিং নিজ হাতে আইলেটিনের ইঞ্জেকশন দিলেন। মানবদেহে এই দিনটিতে তাই সর্বপ্রথম প্রবেশ করলো আইলেটিন—আর মুহূর্তেই সেই আইলেটিন থমসনের জীর্ণ শীর্ণ দেহের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়লো। রুগ্ন কুকুরের

মত মানবদেহেও ঘটলো নাটকীয় পরিবর্তন। থমসনের রক্তে চিনির পরিমাণ কমে গেল - দিনে দিনে তার শীর্ণকায় দেহ সজীব হয়ে উঠলো, স্বাভাবিক হয়ে আসলো তার জীবনযাত্রা। যে থমসন বালিশ থেকে মাথা তুলতে পারতো না - ডাক্তাররা যার পরমায়ুকে মাত্র কয়েক সপ্তাহে সীমাবদ্ধ করেছিলেন—সেই থমসন এখন সুদীর্ঘকাল বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নিয়ে যেন উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে! এখন সে ভাল খায় দায়, খেলে বেড়ায়, হাসে, গান গায়।

১৯২২ সালের জানুয়ারী মাসে টরেন্টো জেনারাল হাসপাতালে তাই যে ঘটনা ঘটলো—সারা বিশ্বের সুদীর্ঘ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে তা এক বিরল ঘটনা! বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে এতদিন সবাই যেখানে অকাল মৃত্যু বরণ করেছে, সেখানে সেই রোগগ্রস্ত এক বালক সে রোগে আর মরছে না।

এই চাঞ্চল্যকর সংবাদে ম্যাকলিয়ড সাহেবও চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এতদিন ব্যান্টিং ও বেস্টের কাজের প্রতি যে অবহেলা তিনি প্রদর্শন করে আসছিলেন—সহসা সে মনোভাব তাঁর পাল্টে গেল - এমন কি নিজেই তিনি উৎসাহী হয়ে এগিয়ে আসলেন এই কাজে। প্রথমেই তিনি ব্যান্টিং ও বেস্টের দেয়া আইলেটিন নামটিকে বদলিয়ে—পূর্বের প্রস্তাবিত 'ইনসুলিন' নামটিই রাখলেন। বিখ্যাত প্রাণ রসায়নবিদ ( bio-chemist ) বার্ট কলিপকে তিনি নিয়ে আসলেন নিজের ল্যাবরে-টরিতে - ভার দিলেন ইনসুলিনকে আরও বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য করতে। কেননা, ব্যান্টিং ও বেস্টের আইলেটিনে কাজ দিলেও—তা তত বিশুদ্ধ ছিল না - উপরন্তু তাঁদের তৈরী ইঞ্জেকশন নিতে রুগীদের খুবই কষ্ট হতো, তীব্র জ্বালা যন্ত্রণায় তারা চিৎকার করতো এবং ইঞ্জেকশনের জায়গাটি ফুলে ঘা পর্যন্ত হতো।

ম্যাকলিয়ডের ল্যাবরেটরিতে যখন পুরোদমে কাজ শুরু হলো তখন ম্যাকলিয়ডকে দেখা গেল সব কিছুর পুরোভাগে। সহকারী হিসাবে তিনি অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীকে আমদানী করলেন। সারা ল্যাবরেটরি জুড়ে পড়ে গেল এক বিপুল সাড়া—আর এই বিরাট, ব্যাপক গবেষণার

কাজে—ম্যাকলিয়ড ও তাঁর খ্যাতনামা সব সহকারীদের মাঝে ব্যান্টিং ও বেস্টের নাম এমন ঢাকা পড়ে গেল যে, তাঁদের নাম তেমন আর শোনা যায় না—কোথায়, কোন্ অতলে তাঁরা যেন তলিয়ে গেলেন!

এদিকে ১৯২২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে, থমসনকে সর্বপ্রথম আইলেটিন ইঞ্জেকশন দেয়ার ঠিক এক মাস পর, আর এক ঘটনা ঘটলো। ব্যান্টিং এর সাথে তাঁর পুরনো বন্ধু জোসেফ গিলক্রাইস্টের হঠাৎ করে দেখা হলো হাসপাতালে। কয়েক বছর ধরে বহুমূত্র রোগে ভুগে ভুগে গিলক্রাইস্টের অবস্থা তখন খুবই খারাপ। খাওয়া দাওয়ার কড়াকড়ি, বাদবিচার করেও কোনো ফল দিচ্ছিলো না। অবশ্য গিলক্রাইস্ট ছিলেন একজন বাস্তববাদী ডাক্তার—তাই নিজের অবস্থাটা তিনি ভাল ভাবেই বুঝতেন, জানতেন মরণের দিন তাঁর ঘনিয়ে এসেছে খুবই কাছাকাছি।

গিলক্রাইস্টকে হঠাৎ হাসপাতালে দেখে ব্যান্টিং আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"জ্যো! তুমি এখানে?" জবাবে গিলক্রাইস্ট বললেন—"সে তো দেখতেই পাচ্ছ! তবে কারো সাথে নয়, তোমার সাথেই দেখা করতে এসেছি। শুনলাম, তোমাদের এখানে নাকি কী সব মজার মজার পরীক্ষা চলছে—তাই এলাম তোমার সাথে দেখা করতে। পরীক্ষার কাজ যখন, তখনতো তোমাদের গিনিপিগ নিশ্চয়ই দরকার হবে। তাই এসেছিলাম তোমরা যদি আমাকে তোমাদের এক নতুন গিনিপিগ করে নাও—সেই অনুরোধ জানাতে—তা ভাই, নেবে আমাকে তোমাদের নতুন গিনিপিগ করে?" "নতুন গিনিপিগ? তোমাকে? কি বলছো তুমি জ্যো?" "বুঝতে পারলে না বন্ধু? মনুষ্য খরগোশ আর কি! হিউম্যান র‍্যাবিট!" মলিন হাসি হেসে হেঁয়ালীটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "বুঝলে এবার? জীবনের কটা দিনই বা আছে আমার বল? তাই এলাম তোমাদের যদি কোনো কাজে লাগতে পারি!" "কিন্তু জ্যো! নিশ্চিত করে কিছুইতো বলা যায় না এখনও। একটি মাত্র পরীক্ষায় আমরা সফল হয়েছি—কাজেই কী বিরাট ঝুঁকি তুমি নিতে যাচ্ছ, জান?" —"জানি বলেইতো বলছি ফ্রেড! আর ঝুঁকি নেয়ার কথাটাই বা দাঁড়াচ্ছে কোথায়? জীবনতো আমার এমনিতেই শেষ হতে চলছে—কাজেই আর আপত্তি করো না ভাই।"

সেদিন থেকে গিলক্রাইস্ট সত্য সত্যই যেন হলেন এক হিউম্যান র‍্যাবিট! তাঁর উপরেই চললো যাবতীয় পরীক্ষা আর সকল তথ্য সংগ্রহের কাজ। গিলক্রাইস্টের কথা বলতে গিয়ে ব্যান্টিং তাই একবার বলে-ছিলেন—"সত্যি কথা বলতে কি, জীবিতদের মধ্যে এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না—যে একার জীবনে জ্যো'এর মত এত রক্ত দান করেছে।"

শুধু পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য রক্তদান নয়—টরেণ্টোর কৃস্টি হাসপাতালের অন্যান্য রুগীদেরকেও তিনি নিজে ইঞ্জেকশন দিতেন—আর এই রুগীরা ছিল সবাই বাতিল সৈন্য—বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হয়ে ধুকে ধুকে যারা মৃত্যুর পথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে।

যাহোক, এমনি ভাবে ডাঃ গিলক্রাইস্টের সহায়তায় শত শত রুগীর উপর ইনসুলিন পরীক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছিল বলেই তার কার্যকারিতা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হয়েছিল—তার দ্রুত উন্নতি সাধন ঘটেছিল। আজ যেখানে ইনসুলিনের ইঞ্জেকশনে কোনো ব্যথা হয় না—দিনে এক বার ইঞ্জেকশন নিলে কাজ চলে—আগে তা ছিল না। প্রতিদিন দু'বেলা ইঞ্জেকশন নিতে হতো—উপরন্তু সে ইঞ্জেকশনে যে তীব্র ব্যথা, এবং ইঞ্জেকশনের জায়গাটি ফুলে উঠে সেখানে যে ঘা হতো, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তবু রুগীরা যে মুখ বুজে এ সব সহ্য করতো, তা কোন গবেষণার কাজে সাহায্যের মহৎ প্রেরণায় নয়, নিতান্তই প্রাণের দায়ে। গিলক্রাইস্ট নিজেই সে কথা স্বীকার করে তাই বলে-ছিলেন—"এ ব্যাপারে আমাদেরকে যদি কেউ সাহসী বীর বা শহীদ হিসাবে ভেবে বসেন—তবে তিনি নেহায়েতই ভুল করবেন! আমরা এই যে ইনসুলিন নিয়ে চলেছি—সে শুধু প্রাণের দায়ে—না নিলে নিশ্চিত মৃত্যু, এই জেনে। আর এই প্রাণের দায় যে কী, সে কেবল ভুক্তভোগী মাত্রই জানে—আর কেউ নয়।"

এদিকে অক্ষম সেনাদের উপর যখন ইনসুলিনের সাফল্যজনক পরীক্ষা চলছিল তখন কি করে যেন সে সংবাদ সাংবাদিকদের কানে গেল! ফলে ব্যান্টিং-এর কাছে নিত্য সাংবাদিকদের আনাগোনা শুরু হলো—ইনসু-লিনের উপর নানা প্রশ্ন, ইনসুলিনের জন্য নানা জনের আবেদন নিবেদন,

দেশ বিদেশ থেকে বহু চিঠি পত্র—তদুপরি বিভিন্ন সভা সমিতির পক্ষ থেকে ইনসুলিনের উপর বক্তৃতা দেয়ার অনুরোধ আসতে লাগলো। আর এসব সামলাতে গিয়ে ব্যান্টিং এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে, তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। লাজুক স্বভাবের জন্য বক্তৃতা দেবার কাজটি ছিল ব্যান্টিং-এর পক্ষে খুবই কঠিন—তবু কিছুদিনের মধ্যে সেটি রপ্ত করে নিলেন। কিন্তু সাংবাদিকদের সামলানো তাঁর পক্ষে ভীষণ দায় হয়ে উঠলো। কেউ হয়ত প্রশ্ন করতো—"আচ্ছা ডাঃ ব্যান্টিং, মেয়েরা আপনার এ আবিষ্কারকে কোন্ চোখে দেখবে বলে আপনি মনে করেন?" এমন অবান্তর প্রশ্নের কী আর জবাব দেবেন তিনি? প্রশ্নের ধরনে আশ্চর্য, অবাক হতেন, পরে বিরক্ত হয়ে বলতেন—"কিন্তু এর জবাবের জন্য আমার কাছে আসা কেন? মেয়েদের সভা ডেকে জিজ্ঞাসা করুন গিয়ে?" কিংবা কেউ হয়ত একেবারে ব্যক্তিগত প্রশ্ন করে বসতো—"স্যার আপনি কি বিবাহিত?" এমনি নানা ধরনের আজে বাজে, অবান্তর ও ব্যক্তিগত প্রশ্নে অনেক সময় ব্যান্টিং-এর পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়তো, রেগে যেতেন তিনি। একদিন তো এক সাংবাদিকের সঙ্গে দেখাই করলেন না—ফলে সে সাংবাদিক তাঁর কাগজে বড় বড় হরফে সংবাদ ছাপিয়ে টিপ্পনি কাটলেন—"Banting-Pearls Not For Swine!"—বেন্টিং-মুক্তো শূকরের জন্য নয়!

তবে সংবাদপত্রে সত্য মিথ্যা যা কিছুই প্রচার হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তার ফল শুভই হয়ে দাঁড়ালো। ইনসুলিনের প্রতি লোকের যেমন আগ্রহ ও ঔৎসুক্য বাড়লো—তেমনি বার্ট কলিপের বেদনাহীন ইনসুলিনের আবিষ্কার, সেই সাথে যুক্ত হয়ে বহুমূত্র রোগ প্রতিরোধের ব্যাপারে ইনসুলিন এক গুরুত্বপূর্ণ ও পরম কল্যাণকর আবিষ্কার বলে পরিগণিত হলো। ব্যান্টিং ও বেস্ট তাই নানা সম্মানে ভূষিত হতে লাগলেন এবং পরিশেষে চিকিৎসা শাস্ত্রে এক মহান অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২৩ সালে বিশ্বের সেরা সম্মানজনক নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন ব্যান্টিং; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বেস্ট এই পুরস্কার লাভে বঞ্চিত হলেন। ব্যাপারটা আরও দুঃখজনক হয়ে দাঁড়ালো এজন্যই যে, এ বিষয়ে ব্যান্টিং-এর সাথে ম্যাকলিয়ডও

পুরস্কৃত হলেন। হয়ত প্রচারধর্মী ম্যাকলিয়ড তাঁর নিজস্ব প্রচার কার্যটি বেশ ভাল ভাবেই চালিয়ে ছিলেন, তাই ব্যান্টিং-এর সাথে তার এহেন সৌভাগ্যটাও দাঁড়িয়ে গেল। এতেও হয়ত ব্যান্টিং-এর আপত্তি ছিল না, কিন্তু সেই সাথে বেস্টের নাম বাদ পড়ায় তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তাই তিনি তাঁর নিজস্ব পুরস্কারের অর্ধেক টাকা বেস্টকে দিলেন,—ফলে ম্যাকলিয়ড সাহেবকেও বাধ্য হয়ে কলিপের সাথে তাঁর ভাগের অংশ ভাগাভাগি করে নিতে হলো।

যাহোক, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করা ছাড়াও, সেই বছরে টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যান্টিং ও বেস্টের নামে চিকিৎসা বিষয়ে যে নতুন গবেষণা কেন্দ্র খোলা হয়—ব্যান্টিং তার কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের এমনি এক বিভাগের কর্মকর্তা হয়েও তিনি সেদিনের কথাটি কোনোদিনও ভুলতে পারেননি। ভাবতেন, ভাগ্যের কী বিচিত্র লীলা! একদিন এখানকার ল্যাবরেটরিতে সামান্য একটু ঠাঁই পাওয়ার জন্য কত চেষ্টা, কত আবেদন নিবেদনই না করতে হয়েছে তাঁকে। আর আজ? আজ সেখানে তিনি সর্বেসর্বা—সর্বময় কর্তা! দশটি কুকুরের জায়গায় ইচ্ছে করলেই তিনি দশ হাজার কুকুর অনায়াসেই পেতে পারেন—কোনো পরীক্ষার জন্য তিনি ইচ্ছামত খরচ করতে পারেন—এক বেস্ট কেন—বেস্টের মত বহু সহকারীকে তিনি এখন তাঁর কাজে নিযুক্ত করতে পারেন। কিন্তু তবুও অনেক সময়েই তার মনে হতো—সেদিনের সেই ল্যাবরেটরির চিলে কোঠায় কাটানো দিনগুলি কী মধুর, কত আনন্দময়ই না ছিল। নৈরাশ্য ও বিফলতার বেদনা অবশ্য বইতে হয়েছে বহুদিন, কিন্তু তবু সব কিছু মিলে সেই হারানো দিনগুলিতে যে আনন্দ, যে উদ্দামতা ও উন্মাদনা ছিল তা আজ কোথায়? সে মধুর হর্ষোচ্ছল দিনগুলিকে কী কোনোদিন আর ফিরে পাওয়া যাবে না?

ব্যান্টিং ও বেস্ট অবশ্য তখনও একই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করছিলেন, তবে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে—এবং তাঁদের গবেষণার কাজও ছিল ভিন্ন। ১৯২৮ সালে ম্যাকলিয়ড অবসর গ্রহণ করলে বেস্ট তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ভিন্ন বিভাগে কাজ করলেও কিন্তু রোজই তাঁদের দেখা হতো—বিকেলে দুই

বন্ধু একই সঙ্গে বেড়াতেন। ১৯৪১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এমনি একদিন বেড়াতে বেড়াতে ব্যান্টিং তাঁর বহুদিনের মনোবাঞ্ছাটাকে বেস্টের কাছে প্রকাশ করেই ফেললেন। বললেন--চালি, এসো না আমরা দু'জনে মিলে আবার কাজ শুরু করি,—আগের মতই তুমি দেখবে রসায়নের দিকটা, আর আমি সার্জারী ?"

কিন্তু দুর্ভাগ্য, বেন্টিং-এর এই মনোবাঞ্ছা যেমন পূর্ণ হয়নি, তেমনি বেস্টও বন্ধুর এই সাধ পূর্ণ করার সুযোগও আর পাননি। তাঁদের মধ্যে আলাপ হওয়ার মাত্র তিনদিন পর, ১৯৪১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ব্যান্টিং এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেলেন।

আগের মত এ সময়েও তিনি দেশের ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তাই তিনি যোগ দিয়েছিলেন মিলিটারিতে—হয়েছিলেন মেজর—মেজর স্যার ফ্রেডারিক ব্যান্টিং নামে তখন তিনি পরিচিত। বিমানে যে সমস্ত অসুস্থতা দেখা দেয়, তার জন্য ঔষধ ও বিশেষ পোশাক আবিষ্কারের কাজে তিনি তখন লিপ্ত ছিলেন। এমনি এক পোশাকের কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্য ১৯৪১ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী যে বিশেষ বম্বারটি ৪ জন আরোহীসহ লণ্ডনের পথে পাড়ি দেয়—সেই বিমানে প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তিনিও ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে যাত্রা পথে বিমানটি তুষার ঝড়ের কবলে পড়ে নিখোঁজ হয়। চারদিন পর নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের মুসগ্রেভ পোতাশ্রয়ের কাছে এক গভীর জঙ্গলে যখন বিমানটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়—তখন দেখা গেল, এক বিমান চালক ছাড়া—অন্য তিনজনের মৃত দেহ তুষারে জমে নিঃসাড়, নিঃস্পন্দ হয়ে গেছে। হতভাগ্য ব্যান্টিং-এর বুকের পাঁজরের হাড় ভেঙ্গে গিয়ে তাঁর ফুসফুসে প্রবেশ করে—কিন্তু আশ্চর্য এমন অবস্থাতেও—যতক্ষণ তাঁর হাতে শক্তি ছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি পাইলটের আহত স্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেছিলেন। ব্যান্টিং এর মত এমন মানব দরদী,—এমন সেবা ধর্মে দীক্ষিত ও অপূর্ব মনোবলের অধিকারী মহান ব্যক্তি মানবসমাজে সত্যই বিরল। তাই কে ভুলতে পারে, এমন স্বার্থ ত্যাগী, আত্মভোলা মহৎ মানুষটিকে ?

ব্যান্টিং-এর অপমৃত্যু তাই যেমন ভুলবার নয়—তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদানের কথা কোনোদিনও বিস্মৃত হবার নয়। আজও তাঁর আবিষ্কৃত ইনসুলিন ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ বহুমূত্র রুগী অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে, প্রায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করে চলেছে। বহুকালের পুরাতন এই ব্যাধিকে ব্যান্টিংই সর্বপ্রথম প্রতিরোধ করতে সক্ষম হন। ১৯২২ সালের পর নিয়মিত ইঞ্জেকশন নিয়ে এই রোগে কোনো রুগী আর মরেনি!

অবশ্য ইনসুলিন বহুমূত্র রোগের ঠিক ঔষধ নয়। এতে রোগ নিরাময় বা নির্মূল হয় না—রোগটিকে শুধু প্রতিরোধ করে বা ঠেকিয়ে রাখে মাত্র। প্যাংক্রিয়াসের আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হানস্ কোনো কারণে (যা আজও অজানা) যখন রক্তে এই ইনসুলিন নামক হরমোনটিকে আর সরবরাহ করতে পারে না—যার ফলে এই রোগ দেখা দেয়—তখন কোনো পশুর প্যাংক্রিয়াস থেকে নিষ্কাশিত এই জান্তব ইনসুলিন বাইরে থেকে শরীরে ইঞ্জেকশন দিয়ে রক্তে তার অভাবকে পরিপূরণ করা হয়। কাজেই এই রোগে একবার আক্রান্ত হলে এখন দৈনিক একবার (কখনও হু'বার) করে ইনসুলিনের ইঞ্জেকশন জীবনভর নিতে হয় এবং খাদ্যা-খাদ্যের বাচবিচার করে চলতে হয়।

আজকাল অবশ্য এ রোগের চিকিৎসার কয়েকটি নূতন ঔষধও ব্যবহৃত হয়ে আছে। এতে ইঞ্জেকশন নিতে হয় না—এদের বড়ি খেলেই কাজ চলে। তবে ইনসুলিনের মত এ সবেও রোগ সারে না—রোগের উপশম হয় মাত্র। উপরন্তু যারা বয়োবৃদ্ধ এবং যাদের দেহ মেদবহুল—তারাই বড়িতে উপকার পায় বেশী।

বহুমূত্র রোগ তাই আজও একটি অজেয় ব্যাধি। এই রোগের প্রতি-ষেধক বা আরোগ্যকারী ঔষধ যেমন আজও আবিষ্কৃত হয়নি—তেমনি এই রোগের সঠিক কারণটিও নির্ণীত হয়নি। প্যাংক্রিয়াসের আইলেট অফ ল্যাঙ্গার হানসের কোষগুলি কেন যে অক্ষম হয়ে দেহের রক্তে ইনসুলিনকে আর সরবরাহ করতে পারে না—তা আজও আমাদের অজানা।

বহুমূত্র রোগের চিকিৎসার ব্যান্টিং-এর আবিষ্কার—তথা ইনসুলিন ইঞ্জেকশন, তাই এখনও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে—রোগ

না সারলেও এই ইনস্থলিনই লক্ষ লক্ষ বহুমূত্র রুগীর দুর্বিষহ জীবনকে সহনীয় করে—অকাল মৃত্যুর হাত থেকে আজও তাদেরকে রক্ষা করে চলেছে। তাই ব্যাণ্টিং-এর এই কল্যাণকর, অমর অবদানের কথা বলতে গিয়ে তাঁর মৃত্যুর পাঁচ বছর পর লণ্ডনের ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় দাঁড়িয়ে জনৈক বক্তা যে বলেছিলেন—"ব্যাণ্টিং না জন্মালে এই সভায় আর জ্যান্ত মানুষের সমাগম দেখা যেত না—দেখা যেত শুধু তাদের প্রেতাত্মার আনাগোনা !"—সে কথা মোটেই অত্যুক্তি নয়, একান্তই সত্য।

---

# আধুনিক কেমোথেরাপির জনক আরলিক

প্রাচীন কালের রসায়নবিদেরা ইতর ধাতুকে সোনায় পরিণত বা মানুষকে অনন্ত পরমায়ু দান করে এমন কোনো রাসানিক দ্রব্য প্রস্তুত করার পন্থা আবিষ্কারের কাজে লিপ্ত থেকে যেমন বিফল হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার ওপর ভিত্তি করে যেমন গড়ে উঠেছে রসায়ন শাস্ত্রের এক বিরাট সৌধ—তেমনি একটি মাত্র রাসায়নিক দ্রব্য যা—'ম্যাজিক বুলেট'—বা ব্রহ্মাস্ত্রের মত কাজ করবে, মানুষের শরীরের কোনো ক্ষতি না করে, ধ্বংস করবে শুধু মাত্র রোগের জীবাণু—তা আবিষ্কার করার স্বপ্ন ও সাধনায় লিপ্ত ছিলেন যে বিজ্ঞানী—তিনিও শেষ পর্যন্ত বিফল হয়েছিলেন তার লক্ষ্যে—কিন্তু তার পরিবর্তে—তাঁর স্বপ্ন ও সাধনার ফলশ্রুতি হিসাবে আবিষ্কৃত হয়—'স্যালভারসান' (Salvarsan) যা সিফিলিস নামক এক বিশ্রী ব্যাধির সর্ব প্রথম অব্যর্থ ঔষধ—জন্ম নেয় 'কেমোথেরাপি' (Chemotherapy) বা বিশেষ এক রাসায়নিক চিকিৎসা পদ্ধতি। এই বিজ্ঞানী যিনি আধুনিক কেমোথেরাপির জনক হিসাবে পরিচিত—তিনি হলেন জার্মানীর জীবাণুতত্ত্ববিদ পল আরলিক (Paul Ehrlich)। 'কেমোথেরাপি'—নামকরণটিও করেন তিনি।

কেমোথেরাপি হলো এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি। এতে কোনো রাসানিক পদার্থ ঔষধ হিসাবে প্রয়োগ করে রোগ জীবাণু ধ্বংস করা হয়—কিন্তু রোগীর শরীরের ওপর সেই ঔষুধের কোনো প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না। সাধারণ ঔষধ রোগের যন্ত্রণা ও উপসর্গগুলি কমায়, রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি বাড়িয়ে দেয়—কিন্তু কেমোথেরাপির ঔষধ কেবল মাত্র জীবাণুনাশের কাজ করে—ফলে রোগী সুস্থ হয়। অবশ্য

রাসায়নিকও ঔষধ প্রয়োগ করে রোগের চিকিৎসা নতুন নয়। ভারতীয় রসায়নবিদ-চিকিৎসক নাগার্জুন (খ্রীঃ পূঃ ১০০) রোগ নিরাময়ের জন্য রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। সুইজারল্যাণ্ডের পাগলাটে ধরনের আধা ডাক্তার, আধা-রসায়নবিদ, প্যারাসেলসাস (Paracelsus, 1493—1541 A.D), রোগ চিকিৎসায় আফিমের আরক, গন্ধক ও পারদের ব্যবহার প্রবর্তন করেন। ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসায় কুইনীনের ব্যবহারও অনেকটা প্রাচীন।

প্যারাসেলসাস্

যাহোক, প্যারাসেলসাস্ যেমন পাগলাটে ধরনের ছিলেন—আরলিকও ছিলেন অনেকটা তেমনি। প্রাচীনকালের খ্যাতনামা চিকিৎসক গ্যালেনের ওপর আস্থা হারিয়ে প্যারাসেলসাস্ এতটা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন যে, চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে বহু লোকজন জড়ো করে তাদের সামনে গ্যালেনের সমস্ত বই-পুস্তক পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। আরলিক অবশ্য তেমনটা করেন নি,—তবে তিনি ছিলেন রঙের ব্যাপারে পাগল—যার কিছু কিছু পরিচয় আমরা তাঁর এই জীবন কাহিনীর মধ্যেই পেয়ে যাব।

পল আরলিক ১৮৫৪ খ্রীঃ ১৪ই মার্চ, দক্ষিণ-পূর্ব জার্মানীর সাইলেসিয়া (এখন স্ট্রেজেলিন, পোলাণ্ড) প্রদেশের স্ট্রেলেন শহরে এক স্বচ্ছল ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় বিজ্ঞান, অংক, এবং প্রাচীন ভাষার প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। প্রাচীন ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ এতটাই প্রবল ছিল যে, শেষ বয়স পর্যন্ত বিতর্কের সময় তিনি ল্যাটিন ভাষায় মারমুখো সব 'শ্লোগান' ব্যবহার করতে ভালবাসতেন—আর এমনি বিতর্কে জীবনে তাঁকে বহুবার লিপ্ত হতে হয়েছে। কিন্তু তাঁর পরম আসক্তি ছিল রঙের প্রতি। সারা জীবন তিনি রঙ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। রঙের প্রতি তাঁর এই আজীবন আকর্ষণের মূলে ছিল তাঁর এক ভাই—তাঁর ছেলেবেলার 'হিরো'—কার্ল ভাইগার্ট (Karl weigert)। ভাইগার্ট দেখিয়েছিলেন যে, রঙ ব্যবহার করলে—জীবদেহের টিস্যু (tissue)-র খুঁটিনাটি বেশ সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাই ছোটবেলা থেকেই আরলিক রঙ নিয়ে খেলতে ভালবাসতেন—অবশ্য হোলি খেলা নয়—রঙ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার খেলা! কোন্ রঙে কোন জিনিসে কেমন রঙ ধরে তাই দেখা। আর এই সব খেলা বা রঙের পরীক্ষায়—জামা কাপড়, তোয়ালে, বইপত্র এমন কি বিলিয়ার্ড টেবিল পর্যন্ত বাদ পড়তো না। স্কুলে থাকতেই তিনি বাড়ীতেই এক ছোটখাট ল্যাবরেটরি বানিয়ে রঙ নিয়ে পরীক্ষা করতেন। যেখানে সেখানে রঙ লাগিয়ে তিনি বাবা-মাকে জ্বালাতন করে ছাড়তেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতে গিয়েও তাঁর এই স্বভাব কিছু মাত্র বদলালো না—বরং তা আরো বেড়ে গেল। পড়াশোনার অনেক বিষয়ের প্রতি তিনি ছিলেন নিরুৎসাহী। সে সব বিষয়ের ক্লাসেও তিনি নিয়মিত যেতেন না। রসায়নের ক্লাসটিকেই তিনি বর্জন করতেন সবচেয়ে বেশী—অথচ ভবিষ্যতে রাসায়নিক ঔষধ আবিষ্কার করার কাজই তাঁর মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকতে তিনি হাতের কাছে যা পেতেন—তাইতেই রঙ লাগাতেন,—কাজেই রসায়ন ক্লাসের কাজের ডেস্কটিতে তিনি এমন সব পাকা রঙের দাগ লাগিয়েছিলেন যে—সেগুলিকে তুলে ফেলা সহজ ছিল না। বহুকাল পর আরলিকের কাজের ডেস্কটি দেখে এক অধ্যাপক আর এক অধ্যাপককে

লিখেছিলেন—"আরলিকের কাজের চিহ্ন সত্যই অক্ষয়—কারুর সাধ্য নেই সেই অক্ষয় চিহ্ন নিশ্চিহ্ন করে।" আবার এই ডেস্ক দেখিয়ে এক অধ্যাপক রবার্ট কক্-কে বলেছিলেন—"ছেলেটা রঙ লাগাতে খুবই ওস্তাদ —কিন্তু আপসোস, পরীক্ষায় সে কোনদিনও পাস করতে পারবে না।"

ডাক্তারী শিখতে হলে শব ব্যবচ্ছেদ করা প্রয়োজন—প্রয়োজন শরীরের বিভিন্ন অংশের নাম মুখস্থ করা। কিন্তু এই গতানুগতিক পথে আরলিক কখনও চলতেন না। শব ব্যবচ্ছেদ যখন করতেন—মৃত অংশ কেটে তখন তাতে রঙ লাগাতেন,—দেখতেন কোন্ রঙ কোথায় কেমন ধরে।

কাজেই স্বাভাবিক ভাবেই পরীক্ষায় তিনি ফেল করলেন—আর এজন্য এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হলেন—এবং এমনি করে কয়েক বিশ্ববিদ্যালয় পেরিয়ে—শিক্ষকদেরকে তাক লাগিয়ে, ১৮৭৮ সালে, সত্যি সত্যি তিনি ডাক্তারী ডিগ্রি লাভ করলেন। আরো উল্লেখ্য যে—ডাক্তারী পাস করার আগেই তিনি এক মূল্যবান আবিষ্কার করেছিলেন—যা তাঁর রঙ নিয়ে পরীক্ষা করারই এক ফল। তিনি প্রমাণ করেন যে—রক্তে অনেক রকমের শ্বেত কণিকা রয়েছে—যাদের বিভিন্নতা রঙের সাহায্যে শনাক্ত করা যায়।

ডাক্তারী পাস করার পর আরলিক বার্লিনের হাসপাতালে সহকারী ডাক্তারের এক চাকরি পেলেন—কিন্তু ডাক্তার হয়েও তিনি রোগীর চিকিৎসার দিকে মনযোগ দিলেন না—রঙ নিয়েই মেতে রইলেন। অবশ্য এ সময়ে ঐ রঙের সাহায্যেই তিনি দুটি মূল্যবান আবিষ্কার করেন। একটি হলো টাইফয়েড জ্বর নির্ণয়ের জন্য সহজ মূত্র পরীক্ষা এবং অন্যটি হলো যক্ষ্মা জীবাণু রাঙানোর উপায়—যা সামান্য রদবদল করে আজও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

জীবাণুর অস্তিত্ব তখন স্বীকৃত হয়েছে। রবার্ট কক অ্যানথ্রাক্স রোগের জীবাণু আবিষ্কার করে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। জার্মান বিজ্ঞানী এবং আরলিকের ভাই কার্ল ভাইগার্ট সর্বপ্রথম এই জীবাণুতে রঙ ধরিয়ে ( Stain ) চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আরলিক সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন যে—দেহের বিভিন্ন অংশে রঙ

লাগালে যেমন রাঙা হয়—তেমনি তার ভেতরে জীবাণু থাকলে তাও রঙিন হয়। ১৮৮০ সালে একদিন তিনি নতুন রঙ 'মিথিলিন ব্লু' এর সামান্য পরিমাণ নিয়ে একটি সাদা রঙের খরগোশের কানের শিরায় ইঞ্জেকশন দিলেন। দেখলেন, এই রঙ খরগোশের দেহের শুধু মাত্র স্নায়ু প্রান্তগুলিকেই রঞ্জিত করে—অন্যান্য টিস্যুগুলিকে বাদ দিয়ে। খরগোশের ওপর রঙের এই পরীক্ষা আরলিকের মনে জাগালো এক কঠিন প্রশ্ন। "এই রঙ খরগোশের দেহের অন্য সকল টিস্যু বাদ দিয়ে যখন একটি মাত্র টিস্যুকে রঞ্জিত করে, তখন কোনো রাসায়নিক পদার্থ দেহের কোনো টিস্যুর ওপর প্রভাব বিস্তার না করে কেবলমাত্র দেহের মধ্যকার ক্ষতিকারক রোগ জীবাণুর ওপর প্রভাব বিস্তার করবে না কেন?" পরের দিকে আবিষ্কৃত 'ওয়াণ্ডার ড্রাগস্' ( wonder drugs ) বা বিস্ময়কর ঔষধগুলি ঠিক এই কাজটিই করে। অবশ্য এই বিস্ময়কর ঔষধগুলির আবিষ্কার অনেক পরের ঘটনা—এই পরীক্ষা থেকে আরলিকের মনে প্রশ্ন জাগার বেশ কয়েক বছর পর সেগুলি আবিষ্কৃত হতে থাকে, কিন্তু আধুনিক কেমোথেরাপির সূত্রপাত বা তার জন্ম ধরতে গেলে ১৮৮০ সালের সেই দিনটি থেকেই—যেদিন আরলিক একটি সুন্দর, সাদা খরগোশের দেহে তাঁর নতুন রঙটির পরীক্ষা করেন।

রবার্ট কক ১৮৮২ সালে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু তখনও এই জীবাণুকে চিহ্নিত করা বা রঙ ধরানো সম্ভব হয়নি। কথিত আছে যে, আরলিক একদিন ককের আবিষ্কৃত এই যক্ষ্মার জীবাণু দেখতে যান এবং তাঁর যা স্বভাব তিনি তাই করলেন। যে স্লাইডে এই জীবাণু ছিল তার ওপর কিছু মিথিলিন ব্লু রঙটি ছড়িয়ে দিয়ে স্লাইডটিকে ঠাণ্ডা স্টোভের ওপর সরিয়ে রাখলেন। পরদিন ভোর বেলা কাজের মেয়ে এসে যথারীতি সেই স্টোভে আগুন ধরিয়ে চলে গেল। আরলিক দেখলেন স্লাইডটি গরমে তেতে উঠেছে। সেটিকে নিয়ে তখনই তিনি অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করলেন। আশ্চর্য হয়ে দেখলেন —ককের সেই নব আবিষ্কৃত জীবাণুগুলি সমস্তই অপূর্ব নীল রঙে রঙিন হয়ে জ্বল জ্বল করছে।

কক্ নিজের আবিষ্কৃত এই জীবাণুকে এমন সুন্দররূপে ইতিপূর্বে আর দেখেন নি—দেখে একেবারে মুগ্ধ ও অভিভূত হয়ে গেলেন—ফলে আরলিকও হলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র—চাকরি পেলেন বার্লিনের সংক্রামক ব্যাধির বিখ্যাত রবার্ট কক্ ইনস্টিটিউটে।

এই ইনস্টিটিউটে যোগদানের পর খরগোশের ওপর তাঁর রঙের পরীক্ষা—আর সেই সূত্রে যে ভাবনার উদয় হয়েছিল তাঁর মনে—তা স্মরণে থাকলেও সেদিকের কোনো কাজে তিনি অগ্রসর হতে পারলেন না—অন্যান্য কাজে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হলো। ককের ইনস্টিটিউটে ডাঃ ফন বেরিং তখন ডিপথেরিয়া প্রতিষেধক অ্যান্টিটক্সিন বা প্রতিবিষ তৈরী করার এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। প্রথম প্রথম যে অ্যান্টি-টক্সিন তৈরী হত তা এত বেশী দুর্বল ছিল যে—তা দিয়ে রোগ সারানো বা রোগ প্রতিরোধ করা যেত না। আরলিক বেরিং-এর সঙ্গে কিছুদিন কাজ করে এমন এক উপায় উদ্ভাবন করলেন যে, এই অ্যান্টি-টক্সিনের ক্ষমতা ৫০।৬০ গুণ বাড়ানো সম্ভব হলো। এই শক্তি সম্পন্ন অ্যান্টিটক্সিন ডিপথেরিয়ার প্রতিষেধক বা আরোগ্যকারক হিসাবে আজও ব্যবহৃত হয়—কিন্তু দুর্ভাগ্য এই আবিষ্কারের সবটুকু কৃতিত্ব জুটলো বেরিং-এর ভাগ্যে—আরলিক এই কৃতিত্বের অংশীদার হতে পারলেন না।

যক্ষ্মা রোগের জীবাণুতে রঙ ধরাতে গিয়ে আরলিক নিজেই একদিন এই রোগে আক্রান্ত হলেন। সে হলো ১৮৮৮ সাল। তখন তাঁর বয়স ৩৪ বছর মাত্র। যক্ষ্মা রোগের তখন একমাত্র চিকিৎসা ছিল বায়ু পরি-বর্তন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল যে,—প্রখর সূর্যালোক এই রোগ সারিয়ে তোলে। ইউরোপের লোক বায়ু পরিবর্তনের জন্য মিশরে যেত। আরলিকও তাই মিশরে গেলেন এবং দু'বছর পর সুস্থ হয়ে জার্মানী ফিরে এলেন। রবার্ট কক্ তখন তথাকথিত যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক ও আরোগ্যকারী 'টিউবার কিউলিন' আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু তখনও তা ছিল পরীক্ষাধীন। কক্ আরলিকের দেহে এই টিউবার কিউলিন ইঞ্জেকশন দিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ফল হলো উল্টো। আর-লিকের সুপ্ত যক্ষ্মা আবার জাগ্রত হয়ে উঠলো। টিউবার কিউলিন যে

যক্ষ্মার প্রতিষেধক বা ঔষধ নয় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তবে আরলিকের এ রোগে মৃত্যু হলো না। তিনি দিব্যি বেঁচে থেকে তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

১৮৯০ সালে আরলিক বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অধ্যাপকের পদ পেলেন—কিন্তু যেহেতু তিনি জাতে ইহুদী ছিলেন তাই পদের উপযুক্ত মর্যাদা তিনি পেলেন না। কাজেই কিছুদিন পর তিনি বার্লিনের উপকণ্ঠে স্টেগলিজ শহরে প্রুসিয়ান সরকারের প্রতিষ্ঠিত 'প্রুসিয়ান ইনস্টিটিউট ফর সিরাম টেস্টিং'-এ চাকরি নিলেন এবং ১৮৯৬ সালে তার পরিচালক নিযুক্ত হলেন। এখানে এসে আরলিক স্বাধীনভাবে গবেষণার সুযোগ পেলেন।

মিশর থেকে ফিরে এসে তিনি বিশেষভাবে ব্যস্ত থাকলেন 'ভ্যাকসিন' বা টিকা এবং দেহে 'ইমিউনিটি' ( immunity ) বা অনাক্রম্যতা সম্পর্কিত গবেষণার কাজে। মাঝে মাঝে অবশ্য ম্যাজিক বুলেট অনুসন্ধানের কাজ চলতো কিন্তু সেগুলি ছিল নিষ্ফল।

আরলিক মনে করতেন—জীবাণু থেকে জীবদেহে কতটা পরিমাণ বিষ ( টক্সিন ) উৎপন্ন হয়—নিশ্চয় তার মাত্রা আছে—ঠিক যেমন থাকে ভেষজ বিষের বেলায়। কাজেই এরাও অঙ্ক শাস্ত্রের অধীন,—তার নিয়ম মানতে বাধ্য। জীবাণু থেকে কতখানি বিষ উৎপন্ন হলে কতটুকু তার প্রতিষেধক ( Autitoxin ) প্রয়োজন নিশ্চয়ই তার মাত্রা আছে।

আরলিক যখন রবার্ট কক্ ইনস্টিটিউটে ককের অধীনে কাজ করতেন তখনও এমনি আজগুবি কল্পনা তার মাথায় আসতো আর সেই সব উদ্ভট ধরনের ধারণার সত্যতা প্রমাণের জন্য তিনি উঠে পড়ে লাগতেন। আরলিকের এই সব খেয়ালীপনায় কত নিরীহ প্রাণী যে প্রাণ হারাতো তার ইয়ত্তা নেই। অন্যেরা যেখানে বা আগে যেখানে একটি প্রাণী নষ্ট হতো—আরলিক সেখানে অহেতুক নষ্ট করতেন ৫০টির মত প্রাণী।

রবার্ট কক্ যখন কোনো পরীক্ষার ফলাফল জানতে চাইতেন তখন আরলিক বকবক করে কত কিছু যে বলতেন তা ককও অনেক সময় বুঝতে পারতেন না। না বুঝতে পেরে কক্ যদি বলতেন—"আরলিক, তোমার কথার মাথামুণ্ড আমি কিছুই বুঝছি না"—তখন আরলিক লজ্জিত

হওয়া তো দূরের কথা যেন লাফিয়ে উঠে বলতেন—"বুঝতে পারছেন না? এখনি বুঝিয়ে দিচ্ছি স্যার।"—বলে উৎসাহ ভরে হাঁটু গেড়ে বসে চক দিয়ে মেঝের ওপর অণু-চিত্র আঁকতেন, রসায়নের সূত্র লিখতেন,

পল আরলিখ

আর এই উদ্ভট অণু-চিত্র বা রসায়নের সূত্র এক তিনি ছাড়া অন্য কেউ বুঝতো কিনা সন্দেহ।

আরলিক বোঝাতে চাইতেন, পজিটিভ বিদ্যুৎসম্পন্ন কোনো বস্তু যেমন নেগেটিভ বিদ্যুৎ সম্পন্ন বস্তুকে আকর্ষণ করে---বিকর্ষণ করে পজেটিভ বিদ্যুৎ সম্পন্ন কোনো বস্তু—চুম্বকের উত্তর মেরু যেমন চুম্বকের দক্ষিণ মেরুকে আকর্ষণ করে,—বিকর্ষণ করে উত্তর মেরুকে—তেমনি দেহের বিভিন্ন কোষে এমন কোনো বস্তু আছে—যা বিশেষ একটি রাসায়নিক দ্রব্যকেই কেবল আকর্ষণ করে—অন্য পদার্থকে বিকর্ষণ বা বর্জন করে। সুতোয় রঙ দেয়ার সময় কোনো রঙ যেমন কোনো একটি সুতোয় লেগে যায়—রঙ ধরে,—অন্য সুতোয় ধরে না ঠিক তেমনি শরীরের ভেতরে সজীব একটি কোষ বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্যের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে—

ভালবাসে। তাই সেটিকেই সে আকর্ষণ করে—অাঁকড়ে ধরে, অন্যটিকে ঘৃণায় সরিয়ে দেয়---কাছে আসতে দেয় না। জীবদেহের কোষ সমূহের এই যে বৈশিষ্ট্য—বস্তু বিশেষের প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণ, ভালবাসা বা ঘৃণা তা থেকেই শরীরে বিষ থেকে বিষের প্রতিষেধক সৃষ্টি হয়--তৈরী হয় বিষ (toxin) থেকে প্রতিবিষ (antitoxin)।

এই কথাটাই আরলিক সবাইকে বোঝাতে চাইতেন। কিন্তু বোঝাতো দূরের কথা শরীরের কোষের মধ্যেও যে "ভালবাসাবাসির" ব্যাপার রয়েছে তা শুনে সবাই হাসতো, ঠাট্টা বিদ্রূপ করতো কিন্তু আরলিক এতে দমতেন না –ঠাট্টা বিদ্রূপকে গায়ে মাখতেন না। উপযাচক হয়ে, অবিরল বকবক করে, সবাইকে তবু বোঝাতে চেষ্টা করতেন। ডাক্তারদের সভায় যখন বক্তৃতা করতেন তখন এই সব তথ্য নিয়েই তিনি আলোচনা করতেন। কিন্তু ডাক্তাররা তাঁর কথা হেসে উড়িয়ে দিতেন। খবরের কাগজে 'আজগুবি ডাক্তার' বলে তাঁর ব্যঙ্গ ছবি, সংবাদ প্রভৃতি প্রকাশিত হতো। কিন্তু এত কিছুতেও আরলিক দমতেন না নির্বিকার ভাবে তাঁর এই আজগুবি ও কৌতুক পূর্ণ মতবাদ প্রচার করতেন। কখনওবা নাক সিটকিয়ে বলতেন—"কী কাণ্ড দেখ! লোকগুলোর লজ্জা শরম বলতে কিছু নেই! নিজেরাতো কিছু বোঝে না—অথচ যে বোঝে, তাকে বিদ্রূপ করতেও এদের বাধে না!"

১৮৯১ সালে স্টেগলিজের যে ছোট্ট গবেষণাগারে আরলিক কাজ করতেন তা উঠিয়ে আনা হলো ফ্রাঙ্কফুর্টে এবং তা পরিণত হলো এক বিরাট গবেষণাগারে। নাম হলো, "দি রয়াল প্রুসিয়ান ইনস্টিটিউট অফ এক্সপেরিমেন্টাল থেরাপি"। সারা পৃথিবীতে এত বড় ল্যাবরেটরি আর ছিল না এবং আরলিক হলেন তার সর্বময় কর্তা। আরলিকের মাথায় যে সব উদ্ভট কল্পনা আসতো—সুযোগ্য সহকারীরা সেগুলি পরীক্ষা করতেন। আরব্য উপন্যাসের বাদশার মত তিনি শুধু হুকুম দিতেন, আর ক্রীতদাসের মত তাঁর সহকারীরা সে হুকুম তামিল করতো —কেউ কোনো প্রশ্ন করতো না। এই বিরাট গবেষণাগারে, প্রাচুর্য আর অনুকূল পরিবেশে আরলিকের প্রতিভার তাই পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল—

গবেষণার কাজও চলেছিল দ্রুত তালে। ফলে, অনেক কিছুই আবিষ্কৃত হলো। আরলিক আবিষ্কার করলেন—ঔষধ বা বিষের ন্যূনতম মাত্রা নির্ণয়ের পদ্ধতি—যা কোনো ঔষধের বিষক্রিয়া নির্ধারণের জন্য আজও ব্যবহৃত হয়। উদ্ভাবন করলেন "থেরাপিউটিক ইন্‌ডেক্স" (therapeutic index) বা ভৈষজগত অনুক্রমণী—বিষাক্ত মাত্রা ও রোগ সারানো মাত্রার অনুপাত- যা কোনো ঔষধ চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য নিরাপদ কিনা তা জানতে গবেষককে সাহায্য করে। ভ্যাকসিন বা টিকার শক্তি নিরূপণের পদ্ধতি। তিনি দেখালেন যে, -যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সংক্রামক ব্যাধির প্রতি অনাক্রম্যতা অর্জন করে তখন তার রক্তে এক বিশেষ বা নির্দিষ্ট পদার্থের সৃষ্টি হয়—যা ব্যাধির কারণকে প্রশমিত বা প্রতিহত করে। তিনি আরো দেখালেন যে এই প্রশমনকারক বিক্রিয়া (neutralizing reaction) একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া - প্রশমনকারী পদার্থ (যাকে আজকাল "অ্যান্টিবডি" বলা হয়) আক্রমণকারী জীবাণুর সঙ্গে রাসায়নিকভাবে সংযুক্ত হয়ে তাদের আক্রমণকে প্রতিহত করে অনেকটা ক্ষারের সঙ্গে অম্লের বিক্রিয়ার মত। রোগ নির্ণয়ের জন্য আজকাল যে রক্ত পরীক্ষার প্রচলন- তা আরলিকের এমনি প্রশমন বিক্রিয়ার এক সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরার জন্য সম্ভব হয়েছে।

১৯০৮ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অমূল্য অবদানের জন্য আরলিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার, নোবেল পুরস্কার, লাভ করলেন। এই পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন—আধুনিক কেমোথেরাপির জনক হিসাবে বা সিফিলিস রোগের চিকিৎসায় সর্বপ্রথম অব্যর্থ ও ল্যাবরেটরিতে সর্বপ্রথম সংশ্লেষিত ঔষধ স্যালভারসান আবিষ্কারের জন্য নয়—যার জন্য আজ আমরা তাঁকে স্মরণ করি, সম্মানকরি, পেয়েছিলেন রোগের প্রতি "ইমিউনিটি" বা অনাক্রম্যতা সম্পর্কে কৃতিত্বপূর্ণ ও অমূল্য গবেষণার জন্য। স্যাল-ভারসান আবিষ্কারের কথা তিনি ঘোষণা করেন ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের বিরাট গবেষণাগারে আরলিক শুধু যে স্বাধীনভাবে গবেষণা চালিয়ে যাওয়ার বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিলেন তা নয়—জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দূরে থাকার জন্য গবেষণার কাজে

একাগ্র মনোযোগ দিতে পেরেছিলেন। কেননা, জার্মান বিশ্ববিদ্যালয় তখন এমন সব লোকে পূর্ণ ছিল—যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতেন - তাঁর কেমোথেরাপির "আইডিয়া"র জন্য তাঁকে বক্রোক্তি ও বিদ্রূপ বাণে জর্জরিত করতেন। তখনকার লোকের ধারণা ছিল যে, কোনো জীবাণু-নাশক রাসায়নিক দ্রব্য জীবাণুর চেয়ে মানুষেরই ক্ষতি করবে বেশী। আরলিক অবশ্য এঁদের বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পেতেন না—প্রায়ই বিতর্কে লিপ্ত হতেন। ক্যাফেটেরিয়া ও বিজ্ঞানীদের সভায় এজন্য তিনি ছিলেন বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। হাতে সব সময় থাকতো তাঁর প্রিয় হ্যাভানা চুরুট—আর সেই চুরুটসহ হাত নেড়ে নেড়ে তিনি তাঁর বিরুদ্ধ-বাদীদের সঙ্গে তর্ক - যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে এ সবের বালাই ছিল না। তাছাড়া তাঁর ধারে কাছেই ছিল জার্মানীর এর বিরাট রঙের কারখানা - আর সেই কারখানায় ছিল জাঁদরেল সব কেমিস্ট—যাঁরা তাঁর প্রয়োজন মত নতুন নতুন সব রঙ তৈরী করে দিতেন।

আরলিক অসম্ভব পড়াশুনা করতেন। হাতের কাছে যা পেতেন—তাই পড়তেন—আর তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ। একবার যা পড়তেন, তাই তাঁর মনে থাকতো—পরে একেবারে কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপসহ উদ্ধৃতি দিতে পারতেন। অন্যদিকে তিনি ছিলেন খুবই স্ফূর্তি-বাজ ও আমুদে লোক। পদমর্যাদার গাম্ভীর্য তাঁর ছিল না। সব ধরনের লোকের সঙ্গে তিনি মিশতেন—সবার সঙ্গেই হাসি-তামাশা করতেন। রোজ পঁচিশটা করে হ্যাভানা চুরুট খেতেন—এই চুরুট না খেলে তাঁর মাথাই নাকি খুলতো না! প্রত্যেক দিন সকালে ঘোড়ার গাড়ী করে তিনি ল্যাবরেটরিতে আসতেন। বই, কাগজপত্রের স্তূপ থাকতো এই গাড়ীতে—পকেটও ভর্তি থাকতো নানা পত্র-পত্রিকা ও চুরুটের বাক্সে। যে সমস্ত বই, কাগজ পত্র, পত্র - পত্রিকা তিনি সঙ্গে করে নিয়ে আসতেন—সেগুলি সকালের ডাকে আসতো এবং ল্যাবরেটরির বেয়ারা সেই সকালেই সেগুলি তাঁর বাসায় পৌঁছে দিত। সকালের নাস্তা খেতে খেতে তিনি এই সব চিঠি পত্র, বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পড়ে শেষ করতেন। প্রতি-দিনের পরীক্ষার পরিকল্পনা তিনি আগের দিন রাত্রেই করে রাখতেন।

বিভিন্ন রঙের কার্ডে, রঙ বেরঙের পেন্সিল দিয়ে তিনি কাজের নির্দেশ লিখতেন—আর এই সব নানান রঙের লেখা থেকে তাঁর সহকারীরা বুঝতে পারতেন—কোন্ কাজটি আগে করতে হবে, কোন্ কাজ কতটা জরুরী।

যা হোক, একদিন এক ফরাসী পত্রিকায় তিনি এক নতুন আবিষ্কারের কথা পড়লেন। ঘোড়ার এক ধরনের পক্ষাঘাত রোগ (ম্যালডেক্যাডেরাস) এক ধরনের পরজীবী বড় জীবাণু (প্রোটোজোয়ান) দ্বারা সৃষ্টি হয়, যার নাম—"ট্রাইপানোসোমা ইকুইনাম।" ইঁদুরের দেহে এই জীবাণু দিয়ে ইঞ্জেকশন দিলে—সে ইঁদুর চার দিনেই মারা যায়। আরলিক ভাবলেন—"জীবাণু নাশক পদার্থ খোঁজ করার জন্য এবার একটি উপযুক্ত জিনিস পাওয়া গেছে।" কেননা, এই জীবাণু আকারে বড়—কাজেই একে পর্যবেক্ষণ করার কাজটি হবে সহজ। জানা শোনা এমন অনেক রঙ আছে যা দিয়ে এতে রঙ ধরানো যেতে পারে বা একে মেরে ফেলা যেতে পারে। তাই কোন রঙ নিয়ে পরীক্ষার কাজ শুরু করা যাবে তা ঠিক করাও সহজ হবে। অধিকন্তু জীবাণুটি দিয়ে যে সকল ইঁদুরকে ইঞ্জেকশন দেয়া যায় তার সবকটিই মারা যায়। কাজেই পরীক্ষায় যদি একটি ইঁদুরও বাঁচে তবে সেই লাইনে কাজ চালিয়ে হয়ত অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে।

১৯০১ সালে তাই রঙ নিয়ে ভালভাবে কেমোথেরাপির কাজ শুরু হলো। সহকারী হিসাবে জাপানী ডাক্তার কিওশি সিগাকে (যিনি ব্যাসিলারী আমাশয় রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেছিলেন) নিয়ে আরলিক কাজ শুরু করলেন। পাঁচশোরও বেশী রঙ নিয়ে পরীক্ষা করা হলো কিন্তু কোনোটিই মারাত্মক ট্রাইপোনোসাম রোগাক্রান্ত নেংটি ইঁদুরের একটিকেও বাঁচাতে পারলো না। এরপর তাঁরা এক শ্রেণীর নতুন রঙ—যাদেরকে বলা হয় "বেনজো পারপুরিন ডাই"—সেগুলি দিয়ে পরীক্ষা চালালেন। পরীক্ষায় মনে হলো—বেনজো পারপুরিন জাতের রঙগুলি ইঁদুরের দেহে যেন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে না। আরলিক তাই রঙ তৈরীর কারখানায় কেমিষ্টদেরকে অনুরোধ করলেন এই রঙগুলির কিছুটা

পরিবর্তন করে দিত, যাতে সেগুলি ইঁদুরের দেহে সহজেই ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই পরিবর্তিত রঙের একটি—যার নাম "ট্রাইপান রেড" —একদিন একদল নেংটি ইঁদুর যাদের দেহে ট্রাইপানোসাম রোগ সংক্রামিত করা হয়েছে তাদের অর্ধেকের দেহে প্রয়োগ করা হলো। এক সপ্তাহ পর দেখা গেল—যাদেরকে রঙটি ইঞ্জেকশন দেয়া হয়নি তাঁদের সব ক'টি মরে গেছে - কিন্তু যাদেরকে ইঞ্জেকশন দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি মরেনি—রোগ তাদের সেরে গেছে। আরলিক তাই এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য খুঁজে পেলেন—যা কিছু নেংটি ইঁদুরের জীবন রক্ষা করেছে। অবশ্য মানুষকে বাঁচায় এমন একটি রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কার করার লক্ষ্য থেকে তিনি তখনও অনেক দূরে। কেননা, এই রঙটি যখন বিলেতী ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর এবং অন্যান্য ট্রাইপানোসাম রোগ, যেমন স্লিপিং সিকনেস বা কুম্ভকর্ণ রোগের ওপর পরীক্ষা করা হলো— তখন কোনো ফল দিল না। আরলিকের প্রচেষ্টা তাই ব্যর্থ হলো। কিন্তু ব্যর্থ হলেও তিনি আবিষ্কার করলেন ভিন্ন এক তথ্য। সে তথ্যটি হলো পরিবর্তনশীলতার প্রণালী বা নীতি (Principle of variation)। এই নীতি প্রয়োগ করে ভবিষ্যতে তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং এই নীতিই অবলম্বন করে আজকাল চলে নতুন কোনো ঔষধের অনুসন্ধান। নীতিটি হলো—যদি কোনো রাসায়নিক দ্রব্য কোনো রোগ নিরাময়ের কোন রূপ ক্ষমতা দেখায় তবে দ্রব্যটির আণবিক কাঠামো (molecular structure) ঠিক রেখে যত প্রকার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব—তা ঘটিয়ে সেই সব দ্রব্য নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। দ্রব্যটির অণুর মধ্যে একটি পরমাণু বদলিয়ে তা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে—তারপর অন্যটি বদলিয়ে আবার পরীক্ষা করতে হবে এবং এমনি বদল করতে করতে হয়ত এমন একটি পরিবর্তিত পদার্থ পাওয়া যাবে—যা হবে মূল পদার্থের চেয়ে বেশী শক্তিশালী কিংবা বেশী নিরাপদ।

১৯০৬ সালে এক ধনী ব্যাংকারের বিধবা পত্নী মিসেস্ ফ্রানজিসকা স্পেয়ার আরলিকের গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে এক ল্যাবরেটরি

তৈরী করে দিলেন। স্বামীর নামে ঐ ল্যাবরেটরির নাম হলো - "জর্জ স্পেয়ার হাউস।" আরলিক এখানেও তাঁর খেয়াল খুশী মত পরীক্ষা করার সুযোগ পেলেন। কারো কাছে তাঁর কাজের জবাবদিহি দিতে হতো না। এখানে যোগদানের পর আরলিক একদিন "অ্যাটক্সিল" (atoxyl) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়লেন। অ্যাটক্সিল হলো আর্সেনিক বা সেঁকোবিষের একটি যৌগ। আর্সেনিক একটি তীব্র বিষাক্ত পদার্থ। আর্সেনিক ঘটিত দ্রব্য দিয়ে পৃথিবীতে যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে—অন্য কোনো বিষে তা হয়নি। অ্যাটক্সিল আর্সেনিকের মত বিষাক্ত না হলেও বেশ বিষাক্ত---যদিও অ্যাটক্সিলের অর্থ--"বিষাক্ত নয়।" অফ্রিকার স্লিপিং সিকনেস রোগে অ্যাটক্সিল ব্যবহার করা হয়েছিল। রবার্ট কক্ যখন "স্লিপিং সিকনেস কমিশন" - এর প্রধান হয়ে আফ্রিকা ঘুরে আসেন—তখন তিনি এ রোগে অ্যাটক্সিলের ব্যবহার অনুমোদন করেছিলেন - কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। অ্যাটক্সিল ব্যবহারে রোগের প্রকোপ অনেকটা কমে যায় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ সারে না। তাছাড়া কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা গেছে। অনেকে এজন্য অন্ধ হয়েছে, বধির হয়েছে—এমনকি মরেও গেছে। ইঁদুরের বেলায় দেখা গেছে —স্লিপিং সিকনেসে আক্রান্ত ইঁদুর কয়েক দিনেই মারা যায় কিন্তু অ্যাটক্সিল বেশ কয়েকমাস তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। আরলিক অ্যাটক্সিলে পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো কার্যকরী ও নিরাপদ করার মনস্থ করলেন। কিন্তু যে কেমিষ্টরা অ্যাটক্সিল তৈরী করেছিলেন, তাঁরা জোর দিয়ে বলতে লাগলেন- "না, অ্যাটক্সিলের ধর্ম বা গুণের পরিবর্তন না ঘটিয়ে তার কোনো পরিবর্তন ঘটানো যাবে না।"

কাজেই আরলিক নিজেই অ্যাটক্সিলে পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালালেন। একাকী এবং বেশী কিছু সরঞ্জাম নয়, একটি বুনসেন বার্নার, কয়েকটি ফ্লাস্ক ও টেস্টটিউব নিয়ে কাজ করে আরলিক দেখালেন যে, গুণ বজায় রেখেও আটক্সিলে পরিবর্তন আনা যায়। এর পর তিনি জর্জ স্পেয়ার হাউসের কেমিষ্টদেরকে নির্দেশ দিলেন অ্যাটক্সিলের বিভিন্ন যৌগ তৈরী করতে। দু'বছর ধরে কাজ চললো। এক একটি যৌগ তৈরী হয় আর

তা স্লিপিং সিকনেস রোগাক্রান্ত ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করা হয়। এমনি ভাবে ৬০০টি যৌগ তৈরী করে পরীক্ষা করা হলো—কিন্তু কাংক্ষিত ফল পাওয়া গেল না। কোন কোনটি অ্যাটক্সিলের চেয়ে বেশী বিষাক্ত হতে দেখা গেল। কোনকোনটি যদিও বা রোগ সারায়—কিন্তু প্রাণীর রক্ত শূন্যতা বা মারাত্মক জন্‌ডিস রোগ দেখা দেয়—ফলে তারা মারা যায় কিংবা পাগল হয়ে যায়—সারাদিন ধরে খাঁচার ভেতর নাচতে থাকে--অথবা নিজের চারদিকে কেবলই ঘুরতে থাকে। কাজেই অ্যাটক্সিলের এসব যৌগ রোগের চিকিৎসার কোনো প্রয়োজনে আসলো না।

সিফিলিস বা উপদংশ একটি বিশ্রী ব্যাধি। এই মারাত্মক রোগ ক্যারিবিয়ান দ্বীপের অধিবাসীদের কাছ থেকে কলম্বাসের নাবিকদের মাধ্যমে ইউরোপে প্রবেশ করে এবং পরে চারশো বছর ধরে ইউরোপে এই রোগের দাপট চলেছে। লোকের ধারণা ছিল—পাপের ফলেই এ রোগ হয়। কিন্তু ১৯০৫ সালে ভিয়েনার বিজ্ঞানী ফ্রিজ শডিন এবং চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ এরিক ঘোষণা করেন যে—এ রোগ জীবাণু ঘটিত। লোকে এই প্রথম জানলো যে, এই রোগ পাপের ফলে হয় না, হয় কর্কস্ক্রুর মত পাইরোকিট নামক এক প্রকার জীবাণুর আক্রমণে।

আরলিক ভাবলেন অন্যান্য জীবাণুর মত সিফিলিসের জীবাণুতেও রঙ ধরবে এবং সেই রঙ দিয়ে হয়ত ঐ জীবাণুকে ধ্বংস করা যাবে। স্লিপিং সিকনেস এবং সিফিলিসের জীবাণুর মধ্যে প্রকৃতিগত অনেক মিল রয়েছে। কাজেই একটির ঔষধ অন্যটিতেও ফল দিতে পারে। তা ছাড়া, কোন কোন আর্সেনিক ঘটিত ঔষধ সিফিলিস রোগে কিছু কিছু ফল দেয় বলে লোক মুখে শোনা যেত। অ্যাটক্সিল ও তার ৬০০ বিভিন্ন যৌগের কথা এই সূত্রে আরলিকের মনে পড়লো।

জীবাণু সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য তখন জাপান থেকে কৃতী ছাত্ররা জার্মানীতে আসতো। এমনি এক কৃতী ছাত্র ডাঃ হাটা আসলেন আরলিকের অধীনে গবেষণা করতে। ডাঃ হাটা বহুদিন সিফিলিস সম্পর্কে গবেষণা করেছিলেন। কাজেই আরলিক আবার ঐ আর্সেনিকের যৌগগুলি নিয়ে পরীক্ষা করার ভার দিলেন ডাঃ হাটাকে।

ডাঃ হাটা খরগোশের শরীরে সিফিলিস রোগ সংক্রামিত করে—এইসব
যৌগ একে একে ইঞ্জেকশন দিয়ে ফলাফল দেখতে লাগলেন - কিন্তু কোনো
সুফল পাওয়া গেল না। আরো কয়েকটি যৌগ তৈরী করা হলো এবং
শেষে দেখা গেল - ৬০৬ নম্বরের যৌগটি যেন কাজ দিচ্ছে। এই সাফল্যে
তখন শত শত প্রাণীর ওপর এই পরীক্ষা চললো এবং দেখা গেল -
মাত্র একটি ইঞ্জেকশনেই খরগোশের শরীরে সিফিলিসের ঘা শুকাতে শুরু
করেছে। এখন মানুষের ওপর পরীক্ষা। কিন্তু এই পরীক্ষা করার দায়িত্ব
কে নেবে? আর্সেনিক একটি সাংঘাতিক বিষ। এই বিষাক্ত দ্রব্যঘটিত
যৌগ যদি মানুষের দেহে ধীরে ধীরে সঞ্চিত হয়ে (আর্সেনিকে যেমন
হয়) বিষ ক্রিয়ার সৃষ্টি করে? কোনো চিকিৎসক এই বিপজ্জনক দায়িত্ব
নিতে পারেন না—নিলেনও না। রোগীরা কিন্তু ইতর প্রাণীর ওপর
ঔষধটির সাফল্যের সংবাদেই দারুণ উৎসাহী হয়ে উঠলো—নিজেরাই দায়িত্ব
নিলো। আরলিকের এক বন্ধু ডাঃ কোনরাড এলট্ এক রোগীকে এই
ঔষধ দিয়ে খুব ভাল ফল পেলেন। সেই থেকে আরো অনেকে এই
ইঞ্জেকশন নিলো এবং দেখা গেল ঐ ৬০৬ নম্বরের যৌগটি সিফিলিসের
জন্য সত্যি সত্যি একটি অব্যর্থ ঔষধ। এইসব পরীক্ষার রিপোর্ট
সংগ্রহ করে ১৯১০ সালে ভাইসরাদেনের জার্মান মেডিক্যাল কংগ্রেসে
আরলিক তাঁর আবিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন। ঔষধটির নামকরণ করা
হলো "স্যালভারসান"—অর্থাৎ যে ঔষধ জীবন রক্ষা করে। ৬০৬ নম্বরের
তৈরী যৌগটিতে এই সাফল্য আসে বলে—"606" নামেও এটি পরিচিত।
আরো অনেক পরীক্ষার পর স্যালভারসানের চেয়ে আরো কার্যকরী এবং
কম প্রতিক্রিয়াশীল ঔষধ—"নিও স্যালভারসান" আবিষ্কৃত হলো।

জীবদেহকে বাঁচিয়ে শুধু জীবাণুকে ধ্বংস করার একটি মাত্র "ম্যাজিক
বুলেট" বা ব্রহ্মাস্ত্র আবিষ্কার করা যা ছিল আরলিকের স্বপ্ন—তা সফল
না হলেও, তিনি এমন একটি ম্যাজিক বুলেট আবিষ্কার করলেন যা
জীবদেহের ক্ষতি না করে অন্তত সিফিলিসের জীবাণু ধ্বংস করতে
সক্ষম। আরলিকের এই আবিষ্কার ভেষজ বিজ্ঞানে আনলো এক যুগান্তর
—শুরু হলো আধুনিক কালের কেমোথেরাপির যুগ।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিবিধ সম্মানে ভূষিত হয়ে ১৯১৫ সালে, ৬১ বছর বয়সে, বহুমূত্র রোগে, এই রঙ—পাগল বিজ্ঞানী, ফলিত রসায়নের রাজা, আধুনিক কেমোথেরাপির জনক, আরলিক, ইহলোক ত্যাগ করেন।

আরলিক অবশ্য ভেবেছিলেন অচিরে আরো অনেক কেমোথেরাপির ঔষধ আবিষ্কৃত হবে কিন্তু তা হয়নি। পরবর্তী "ওয়াণ্ডার ড্রাগ"—বা বিস্ময়কর ঔষধ- "প্রন্টোসিল" (Prontosil) আবিষ্কৃত হয় ১৯৩৫ সালে আরলিকের মৃত্যুর বিশ বছর পরে।

---

# ডোমাখ্ ও সালফা ঔষধ

পল আরলিকের স্যালভারসান ও নিও স্যালভারসান আবিষ্কারের পর কিছুকালের মধ্যে তেমন চমকপ্রদ ঔষধ আর আবিষ্কৃত হলো না। জৈবিক নিরাময়কারী ঔষধ, যেমন—নিউমোনিয়ার প্রতিষেধক সিরাম (serum) এবং হরমোন (hormone), যেমন—ইনসুলিন প্রভৃতি আবিষ্কারের প্রতি বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। অবশ্য কিছু কিছু বিজ্ঞানী আরলিকের পথ অনুসরণ করে চেষ্টা চালিয়েছিলেন - কিন্তু সফল হতে পারেননি। শেষে ১৯৫৩ সালে কেমোথেরাপির পুনর্জন্ম ঘটলো। ঐ বছর জার্মানীর প্রাণ রসায়নবিদ (biochemist) জেরহার্ড ডোমাখ্ (Gerhard Domagk) " প্রন্টোসিল" (prontosil)-এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা ঘোষণা

জেরহার্ড ডোমাখ্

করে বলেন যে - এই কমলা-লাল রঞ্জকটি (dye) মারাত্মক "ষ্ট্রেপটো কক্কাস" (streptococcus) জীবাণুতে আক্রান্ত ইঁদুরকে তার দৈহিক কোনো ক্ষতি

না করেই আরোগ্য করতে পারে। এক কালে বিস্ময়কর এবং বহু ব্যবহৃত সালফা জাতীয় ঔষধাবলী ( sulpha drugs )-র অগ্রদূত হলো এই প্রোন্টোসিল।

ডোমাখ্ ১৮৯৫ সালের ৩০শে অক্টোবর ব্রানডেন বার্গে (এখন পোলাণ্ড) জন্মগ্রহণ করেন। কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর পড়াশুনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রথমদিকেই বাধাপ্রাপ্ত হয়। যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। এরপর পুনরায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে ১৯২১ সালে তিনি ডাক্তারী পাশ করেন। ১৯২০ সালের শেষের দিকে তিনি জার্মানীর বিরাট রঞ্জক কারখানা আই. জি. ফারবেন ইণ্ডাষ্ট্রি-তে যোগ দেন এবং নতুন সব রঞ্জক নিয়ে ধারাবাহিক পরীক্ষা শুরু করেন। উদ্দেশ্য রোগের চিকিৎসায় কোনোটি সুফল দর্শায় কিনা তা দেখা। পরীক্ষা করতে করতে ১৯৩২ সালে তিনি দেখলেন যে—একটি নতুন রঞ্জক, যার নাম "প্রন্টোসিল" – সেটির জীবাণু নাশক ক্ষমতা রয়েছে। প্রন্টোসিলের এই জীবাণু নাশক ক্ষমতা বহুকাল জানা ছিল না কেবল মাত্র কাপড় রঙ করার কাজে সেটি তখন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।

যাহোক, প্রন্টোসিলের জীবাণুনাশক ক্ষমতার ব্যাপারটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, ইতিপূর্বে যে সমস্ত রাসায়নিক ঔষধ আরলিক এবং অন্যান্য বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছিলেন সেগুলি সাধারণ নয়, এমন সব রোগ যেমন, ঘুম রোগ, সিফিলিস প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে ছিল উপযোগী— মানুষ সচরাচর যে সকল রোগে আক্রান্ত হয়—সে সকল রোগ সারাতে পারতো না। কিন্তু প্রন্টোসিলকে দেখা গেল এ সকল রোগের রোগ-জীবাণুকে দমন করতে খুবই দক্ষ। অবশ্য মানুষের ওপর প্রন্টোসিল তখনও পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। ভাগ্যক্রমে এই পরীক্ষা ডোমাখকে একদিন তাঁর নিজের বাড়ীতেই করতে হলো। তাঁর মেয়ে হিলডেগ্রেড একদিন শুঁচ দিয়ে সেলাই করতে গিয়ে হঠাৎ তার আঙ্গুল ফুটো করে ফেললো। এই সামান্য ক্ষত দূষিত হয়ে শীঘ্রই মেয়েটির অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়ালো। প্রচলিত সব ঔষধ এমনকি শল্য চিকিৎসাও ব্যর্থ হলো। মারাত্মক স্ট্রেপটোকক্কাস রোগ জীবাণুর সংক্রমণ প্রতিরোধ করা গেল না।

ডোমাখ্ বুঝলেন তাঁর মেয়ে আর বাঁচবে না। কাজেই যে প্রন্টোসিল ইঁদুরের ওপর অমন ভাল ফল দিয়েছে তাই তিনি মরিয়া হয়ে মেয়েকে খেতে দিলেন। আশ্চর্য ফল ফললো। হঠাৎ করেই জ্বর ছেড়ে গেল—মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠলো। সেই থেকে প্রন্টোসিল জার্মানীর হাসপাতালগুলিতে ব্যবহৃত হতে লাগলো। দেখা গেল, রক্ত দুষ্টির জন্য প্রন্টোসিল একটি অমোঘ ঔষধ। শুধু তাই নয়—টনসিলের ক্ষত রোগ, নিউমোনিয়া, সূতিকা জ্বরেও তা অব্যর্থ হতে দেখা গেল। প্রন্টোসিলের আশ্চর্য রোগ নিরাময় ক্ষমতা আবিষ্কারের জন্য ১৯৩৯ সালে ডোমাখ্ নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। অবশ্য হিটলারের আদেশে তিনি সেই বছরেই পুরস্কার গ্রহণ করতে পারেননি—গ্রহণ করেছিলেন ৮ বছর পর।

কাজেই দেখা যায় ১৯৩৬ সালে, আরলিকের স্যালভারসান আবিষ্কারের ২৬ বছর পর আবার এমন এক বিস্ময়কর ঔষধ আবিষ্কৃত হলো, যা যৌন ব্যাধি নয়—এমন এক জীবাণুঘটিত সাধারণ রোগ সারাতে সক্ষম—যা মানুষের ঘরে ঘরে হয়—যার কবলে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রন্টোসিলের রোগ নিবারণের কারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ফ্রান্সের পাস্তুর ইন্সটিটিউটের দু'জন রসায়নবিদ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, প্রন্টোসিলের রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা হয়ত তার জটিল ও বৃহৎ অণুটির মধ্যকার কোন সরল ও ক্ষুদ্র অংশে নিহিত রয়েছে। তাঁরা প্রন্টোসিল অণুকে ভাঙ্গতে সক্ষম হলেন। দেখা গেল—প্রন্টোসিলের যে অংশটি তার রঙের জন্য দায়ী সে অংশটির কোনো আরোগ্যকারী ক্ষমতা নেই। এই ক্ষমতা যে অংশটির রয়েছে—সেটি হলো একটি বর্ণহীন জৈব পদার্থ—যার নাম সালফানিলামাইড ( sulphanilamide )। সালফানিলামাইড রুগ্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেল—এটি প্রোন্টোসিলের মতই কার্যকরী। অথচ এই সালফানিলামাইড তৈরী করেন জার্মানীর এক ছাত্র, পল জেলমো—তাঁর ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য ১৯০৮ সালে, কিন্তু তার জীবাণু নাশক ক্ষমতা তখন এবং তারপরও বহুদিন জানা ছিল

। আর এই অজ্ঞতার ফলে—এমন কার্যকরী ঔষধ থাকা সত্ত্বেও, ত শত লোক যে ইতিমধ্যে মারা পড়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

সালফানিলামাইডের এই জীবাণু-নাশক ক্ষমতা আবিষ্কার খুবই মূল্যন হয়ে দাঁড়ালো। কেননা, প্রণ্টোসিলের প্রস্তুতি জার্মানীর পেটেণ্টের ড়াকড়ি নিয়মের নাগ পাশে বাঁধা ছিল কিন্তু সালফানিলামাইডের পটেণ্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই যে কেউ এটি তৈরী রে বাজারজাত করতে পারে। ফলে, মানুষের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা ালিয়ে জন্স হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ পেরিন এইচ, লভ্, ডাঃ এলিয়েনর ব্লিস প্রমুখ যখন ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে সাউদার্ন মেডিক্যাল এসোসিয়েসনে তাঁদের ঐতিহাসিক রিপোর্ট পেশ করেন তখন আমেরিকাবাসীদের মনে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ডাঃ লভ্ যে রোগীটির ওপর প্রথম পরীক্ষা চালান সেটি ছিল এরিসিপেলাস রোগাক্রান্ত সাত বছরের একটি শিশু। ঘন ঘন অ্যান্টিটক্সিন প্রয়োগ করেও কিছু ফল পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু সালফানিলামাইড প্রয়োগের ১২ ঘণ্টা পরেই শিশুটির দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক নেমে আসে। এক মহিলা মারাত্মক সূতিকা জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১০৫ ডিগ্রি জ্বর নিয়ে মৃত্যুর অপেক্ষায় শয্যাগত ছিলেন। রাতের দিকে তাঁকে সালফানিলামাইড দেয়া হলো,—আর পরদিন সকালেই তাঁর জ্বর ছেড়ে গেল।

সালফানিলামাইডের সাফল্যে বিজ্ঞান মহলে অপূর্ব সাড়া জাগলো। ফলে, অচিরেই আবিষ্কৃত হলো শত শত সালফা গোত্রের ঔষধ—সালফা পিরিডিন, সালফা থিয়াজোল, সালফা ডায়াজিন, সালফা গুয়ানিডিন, সালফা মিরাজিন, সালফা মিথাজিন প্রভৃতি। ১৯৪৫ সালের মধ্যেই ৫৪৮৫ রকমের সালফা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়, আর এদের ব্যবহার যে কতটা পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল তা এ থেকেই বোঝা যায় যে, ১৯৪৩ সালে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই ১০,০০৫,৩০৭ পাউণ্ড সালফা ঔষধ তৈরী হয়েছিল। সালফা গোত্রের ঔষধ বিশেষ করে স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণুজনিত রক্ত দুষ্টি ও মেনিনজাইটিস, এরিসিপেলাস, কয়েক প্রকার নিউমোনিয়া, স্কার্লেট ফিভার, সূতিকা জ্বর, গনোরিয়া, আমাশয় প্রভৃতিতে খুবই ফলপ্রদ হতে দেখা গিয়েছে।

মানুষ সচরাচর যে সকল রোগে আক্রান্ত হয়,—সে সকল ক্ষেত্রে সালফা ঔষধসমূহের মত এখন কার্যকরী এবং অব্যর্থ ঔষধ ইতিপূর্বে ডাক্তারদের হাতের কাছে ছিল না। বস্তুতঃ এগুলি রোগের চিকিৎসায় আনলো সত্যিই এক যুগান্তর। অবশ্য একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, সালফা জাতীয় ঔষধ মোটেই ত্রুটিমুক্ত নয়। সালফা ঔষধ আবিষ্কারে চিকিৎসকেরা প্রথমে যতটা আশান্বিত হয়েছিলেন পরের দিকে সে প্রত্যাশা ততটা পূরণ হয়নি। এগুলির প্রয়োগে নানা বিপত্তি দেখা দিতে লাগলো। যদি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় তবে কোনো ফল দেয় না — আবার যদি অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা যায় তবে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি নীলাভ হয়ে যায়—ত্বক ধূসর বর্ণ ধারণ করে। কোন কোন রোগীর এই জাতীয় ঔষধে জ্বর হয়, চুলকানি এবং নানা প্রকার চর্মরোগ দেখা দেয়—বুকে ও পিঠে ব্যথা হয়, রক্ত নষ্ট হয়, জণ্ডিস, রক্ত শূন্যতা প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়, কিডনির ক্ষতি হয়—রক্তে শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমে যায়। আরো দেখা গেল, যে সকল রোগ সালফা জাতীয় ঔষধে আগে সেরে যেতো পরে সেগুলি আর সারে না। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে—বিশেষ করে গনোরিয়ার জীবাণু প্রথমে কিছুটা পরাভব স্বীকার করলেও পরে তাদের পরাক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। যে সকল জীবাণু একবার প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তোলে, সালফা জাতীয় ঔষধ তাদেরকে আর বিনষ্ট করতে পারে না। গোলাকৃতি স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু—যারা ফোড়া, বিষ ফোড়া এবং অন্যান্য পুঁজযুক্ত সংক্রামক ক্ষতের সৃষ্টি করে তাদের ওপর সালফা জাতীয় ঔষধের সক্রিয়তা খুবই কম। যক্ষ্মা, সিফিলিস, ভাইরাস জাতীয় নিউমোনিয়ায় এই জাতীয় ঔষধে কোন ফল দেয় না।

প্রন্টোসিল যেমন ডোমাখের মেয়েকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল—তেমনি আরো কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সাফলা জাতীয় ঔষধ জড়িত। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, প্রন্টোসিল পেটেন্টের কড়াকড়ি নিয়মের আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা ছিল—জার্মানী ছাড়া অন্য দেশ তা প্রস্তুত করতে পারতো না। কিন্তু ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে তার চেয়ে উন্নত, অধিক কার্যকরী ঔষধ "এম. বি. ৬৯৩" আবিষ্কার

করেছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল উত্তর আফ্রিকা সফর কালে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। তিনি এই এম. বি. ৬৯৩ ঔষধটি খেয়ে সেরে ওঠেন। সেই সময় চার্চিলের যদি মৃত্যু হতো তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতি যে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াত, তা যেমন বলা কঠিন, তেমনি এশিয়া আফ্রিকার যে সকল দেশ আজ স্বাধীন তাদের অবস্থা যে কী হতো, তা গবেষণা সাপেক্ষ! ১৯৩৬ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের পুত্র স্ট্রেপটো-ককাস জনিত রক্তদুষ্টিতে হাসপাতালে শয্যাগত ছিল। প্রন্টোসিল বড়ি খেতে দেয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর জ্বর কমতে থাকে এবং পরে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন। এর ১২ বছর আগে আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট মিঃ কুলিজের পুত্র অনুরূপ রক্তদুষ্টিতে শয্যাগত ছিলেন। প্রচলিত সকল চিকিৎসা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভবপর হয় নি। ব্যাপারটা দুঃখজনক এইজন্যই যে, এই ঘটনার অনেক আগেই সালফানিলামাইড আবিষ্কৃত হয়েছিল কিন্তু ঔষধ হিসাবে তার ব্যবহারের কথা তখন জানা ছিল না। জানা থাকলে আর এক প্রেসিডেন্টের পুত্রের মত তাঁরও হয়ত মৃত্যু হত না। মানুষের এই অজ্ঞতার জন্য কুলিজ জুনিয়ারের মত আরো কত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে তার হিসাব কে দেবে?

# পেনিসিলিন ও তার আবিষ্কার

( ডাঃ ফ্লেমিং, ডাঃ ফ্লোরি ও ডঃ চেইন )

সালফা ঔষধসমূহের আবিষ্কার একদিন যে বিপুল আশার সঞ্চার করেছিল মানুষের মনে---সে আশা যে শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি পূর্ণ হয়নি সে কথা আমরা ইতিপূর্বে জেনেছি। এদের সাহায্যে বেশ কিছু কঠিন রোগ সারানো সম্ভব হলেও---অনেক রোগীর ক্ষেত্রে এগুলি বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে---এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার শীঘ্রই সীমিত হয়ে পড়ে। অবস্থা যখন এমনি তখন আশার বাণী বয়ে আনলো আর এক ধরনের অভিনব ও বিস্ময়কর ঔষধ যাদেরকে বলা হয় অ্যান্টি-বায়োটিকস্ (antibiotics)। অ্যান্টিবায়োটিক হলো জীবদেহ---বিশেষ করে অণুজীব, যেমন চিতি, ছত্রাক, জীবাণু প্রভৃতি থেকে পাওয়া এমন কোনো বায়ায়নিক পদার্থ, যা রোগ জীবাণুকে ধ্বংস বা তাদের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে পারে।

এ পর্যন্ত অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের মধ্যে প্রায় ৬০টিকে চিকিৎসকেরা বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু যে অ্যান্টিবায়োটিকটি সর্বপ্রথম বিশ্বজোড়া আলোড়ন সৃষ্টি করে—বাঁচিয়ে তোলে বহু মৃতপ্রায় মানুষকে এবং আজও বাঁচিয়ে চলেছে, তার নাম পেনিসিলিন। পেনিসিলিন বিংশ শতাব্দীর একটি শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। তবে মজার কথা হলো, অনেক বড় বড় আবিষ্কারের মত পেনিসিলিনও আবিষ্কৃত হয় আকস্মিকভাবে। ১৯২৮ সালে ডাঃ আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming) যখন লণ্ডনের সেণ্ট মেরী হাসপাতালে এক জাতের জীবাণু

নিয়ে গবেষণা করছিলেন—তখন হঠাৎ করেই তিনি একদিন এই পেনি-সিলিন আবিষ্কার করেন।

ডাঃ ফ্লেমিং

স্কটল্যাণ্ডের এক সাধারণ কৃষক পরিবারে ১৮৮১ সালের ৬ই আগস্ট ফ্লেমিং জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা তেমন বিত্তশালী ছিলেন না, তবে সৎচরিত্রের মানুষ ছিলেন। ছেলে-মেয়েদেরকে তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তাদের দুটি চোখ ও মস্তিষ্কের সদ্ব্যবহার করতে,—ধৈর্যশীল ও মিতব্যয়ী হতে এবং ভগবানকে ভয় করতে। এই শিক্ষা ফ্লেমিং-এর ভবিষ্যৎ জীবনে পেনিসিলিন আবিষ্কারের কাজে যথেষ্ট সাহায্যে এসেছিল। তাই, বাড়ী থেকে ৪ মাইল দূরের এক গ্রাম্য স্কুলে হেঁটে আসার পথে গাছ-পালা, পশু-পাখী, সব কিছুই যেমন তিনি দেখতে শিখেছিলেন সজাগ এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে—তেমনি এই সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি ও কৌতূহলের কারণে এক-দিন এক ছাতা পড়ে নষ্ট হয়ে যাওয়া "কালচার প্লেট" (culture plate) পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার না করে তিনি সেটিকে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন—আর এই পরীক্ষার ফলে তিনি সন্ধান পেয়েছিলেন অত্যাশ্চর্য জীবাণু

ধ্বংসী এক ছত্রাকের। আবার সেই ছত্রাক থেকে বিশুদ্ধ এবং অধিক পরিমাণে জীবাণু-নাশক পদার্থ উদ্ধার করতে যখন তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, তখন দীর্ঘ দশ বছর—অসীম ধৈর্য সহকারে, ল্যাবরেটরির এক অন্ধকার কোণে সেই ছত্রাকটির চাষ তিনি চালিয়ে গিয়েছিলেন এই আশায় যে, কোনদিন কেউ হয়ত সে কাজে সফল হবেন। সৌভাগ্য যে, তাঁর সে আশা তাঁর জীবনেই পূর্ণ হয়েছিল।

যাহোক, ফ্লেমিং এর বয়স যখন ১৪ বছর তখন তিনি লণ্ডনে তাঁর এক বড় ভাই-এর কাছে চলে আসেন এবং কিলমার্নক একাডেমীতে ভর্তি হন। তাঁর ভাই ছিলেন সাধারণ এক ডাক্তার। একাডেমীতে শিক্ষা শেষ করে তিনি এক জাহাজী অফিসে কেরানীর চাকরি নেন। ফ্লেমিং খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন। স্কুলে থাকতে বহু পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেছিলেন। তাই এই সামান্য চাকরিতে তিনি তৃপ্ত হতে পারলেন না—ভাই-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও ডাক্তার হবেন স্থির করলেন। ইচ্ছে করলে তিনি অক্সফোর্ড কিংবা এডিনবার্গের মত নাম করা ডাক্তারী স্কুলে ভর্তি হতে পারতেন। কিন্তু তা না হয়ে তিনি ভর্তি হলেন—"সেন্ট মেরী হসপিটাল মেডিক্যাল স্কুল"-এ। ভাই কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেছিলেন - "এই স্কুলের সাঁতারের দলটি হলো সেরা—গত বছর রুজার কাপ বিজয়ী হয়েছে।" বলা বাহুল্য ফ্লেমিং-এর ঝোঁক ছিল সাঁতার কাটায়—তাই ঐ স্কুলটি তেমন নামী না হলেও তাঁর ছিল পছন্দ।

সেন্ট মেরী হসপিটাল স্কুলেও তিনি তাঁর মেধার পরিচয় দিলেন। বহু পুরস্কার ও বছর বছর বৃত্তি লাভ করে ১৯০৮ সালে তিনি কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারী পাস করলেন, লাভ করলেন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ-পদক।

ডাক্তারী পাস করার পরেই ফ্লেমিং সেন্ট মেরী হাসপাতালে স্যার এলমথ রাইট-এর গবেষণাগারে এক চাকরি পেলেন। তখনকার দিনে মেরী হাসপাতালের শিক্ষা বিভাগটি তেমন বিশিষ্ট ছিল না—ধরতে গেলে তা ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীর—কিন্তু সেখানকার জীবাণুতত্ত্ব বিভাগের প্রধান স্যার এলমথ রাইট ছিলেন ব্যতিক্রম। জীবাণুতত্ত্ববিদ হিসাবে তিনি

আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। টাইফয়েড জ্বরের প্রতিষেধক এক টিকা আবিষ্কার করে এই টিকা দেয়া এবং অন্যান্য রোগের টিকা আবিষ্কারের জন্য তিনি একটি আলাদা বিভাগ খুলে ছিলেন। তাছাড়া তিনি একজন উৎসাহী ও পারদর্শী শিকারী ছিলেন বলে সেখানে একটি রাইফেল ক্লাবও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ফ্লেমিংও গুলি ছুঁড়তে সুদক্ষ ছিলেন বলে রাইটের অধীনে চাকরি পাওয়াটা সহজ হয়েছিল। অবশ্য চাকরির "ইণ্টার ভিউ"-এর সময় তিনি যে চাতুরী করেছিলেন তাও কম সহায়ক ছিল না। সেটি ছিল যেমন মজার তেমনি অভূতপূর্ব। রাইট জিজ্ঞাসা করেছিলেন—"জীবাণু সম্পর্কে জান কিছু?" জবাবে ফ্লেমিং বিনীতভাবে বলেছিলেন—"খুব সামান্যই স্যার।" উত্তর শুনে রাইট হেসে উঠে বলেছিলেন—"বাঃ চমৎকার। তুমিই পারবে।"

এরপর রাইটের শিক্ষাদানে ফ্লেমিং জীবাণু সম্পর্কে বিশদভাবে জানলেন। জানলেন, কী করে তারা মানবদেহে প্রবেশ করে রোগের সৃষ্টি করে—জানলেন মানবদেহের প্রতিরোধ ক্ষমতার কথা, রক্তের শ্বেত কণিকার আচরণ, অ্যাণ্টিসেপ্টিক বা বীজবারক, সিরাম ও টিকা সম্পর্কে সকল তথ্য—সেই সঙ্গে ছোট খাটো পরীক্ষা করেন—আর মেডিক্যাল ছাত্র পড়ান।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধলো ফ্লেমিং তখন "রয়াল মেডিক্যাল কোর"-এ ক্যাপ্টেনের পদে যোগ দিলেন। ফ্রান্সে ব্রিটিশ এক্সপিডিসনারি ফোর্সেস থারটিন্থ জেনারেল হসপিটাল-এ তাঁকে পাঠানো হলো,—বলা হলো—"আমাদের যে সব বীজবারক রয়েছে সেগুলো তেমন কাজের নয়—আপনার কাজ হবে ক্ষতের জন্য কোনো উন্নত মানের বীজবারক খুঁজে বের করা।"

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মত তিনি উন্নত মানের বীজবারকের সন্ধান করতে লাগলেন। হাতের কাছের শিশি বোতলে, প্যাকেটের মধ্যে যে সকল রাসায়নিক পদার্থ পেলেন—তাই নিয়ে পরীক্ষা করলেন,—তাঁর মত আরো অনেকে তাই করলেন—কিন্তু দুর্ভাগ্য, কোনো উন্নত মানের বীজবারক খুঁজে পাওয়া গেল না। নিছক কৌতূহল বশত ফ্লেমিং এ সময়ে একটু ভিন্ন ধরনের পরীক্ষা করলেন। কয়েকটি প্রমাণ (standard) এবং প্রস্তাবিত

কয়েকটি নতুন বীজবারক দিয়ে রক্তের জীবন্ত শ্বেত কণিকা, যারা শরীরে
সৈনিকের মত রোগ জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে – তাদের ওপর
পরীক্ষা করে দেখলেন অদ্ভুত কাণ্ড! কতকগুলি বীজবারক জীবাণু ধ্বংস
করার চেয়ে রক্তের শ্বেত কণিকাকেই বিনষ্ট করার কাজে বিশেষ পারদর্শী।
কাজেই সেগুলি বীজবারক হিসাবে ব্যবহারের মোটেই উপযোগী নয়।
অনেক তীব্র বীজবারক জীবদেহ এবং জীবাণুর পক্ষে সমান মারাত্মক।
এমন কোনো বীজবারকের কথা তখন জানা ছিল না যা গ্যাংগ্রীনকে
প্রতিরোধ করতে পারে অথচ আহত সৈনিকের এই গ্যাংগ্রীনে আক্রান্ত
হয়ে মারা পড়ে বেশী। তাছাড়া প্রচলিত বীজবারকগুলিকে দেখা যেত
ক্ষতের ক্ষতি করতে। কোন কোনটি দেহের বাইরের ক্ষতে সামান্য
উপকার দিত বটে – কিন্তু গভীর ক্ষতের জন্য সেগুলি মোটেই উপযোগী
ছিল না। অনেক চেষ্টা করেও কোনো উপযুক্ত বীজবারক খুঁজে না পাওয়ায়
ব্যাপারটা তাই হতাশার বড় আপসোসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো ফ্লেমিং-
এর কাছে। এ সম্পর্কে পরে তিনি লিখেছিলেন – "আমাদের চারপাশে
সংক্রামিত (infected) ক্ষত নিয়ে কত লোক কাতরাচ্ছে, ভুগছে, মরছে – অথচ
আমরা তাদের কোনো সাহায্যেই আসতে পারছি না। এ সমস্ত দেখে
শুনে - আপসোস করে কেবল একটা তীব্র অনুভূতিই মনে জাগাতো
—যদি সংক্রামিত ক্ষতকে কোন ক্রমে সুস্থ করা যেত—যদি কোনো কিছু দিয়ে
মেরে ফেলা যেত মারাত্মক ঐ জীবাণুগুলিকে…।" কিন্তু এই "কোনো কিছু"
তিনি ফ্রান্সে থাকা কালে আবিষ্কার করতে পারেননি।

১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে, যুদ্ধ থেমে গেলে - সেনাদলের সংগঠন
ভেঙ্গে দেয়া হলো, – ফ্লেমিং ফিরে আসলেন তাঁর আগের কর্মস্থলে। কিন্তু
যুদ্ধের এই ব্যাপারটা - , আহত সৈনিকদের অসহায় অবস্থার কথা তিনি
ভুলতে পারলেন না কিছুতেই। তাই ছাত্র পড়ানো, আর অন্যান্য
কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি টুকি-টাকি পরীক্ষা চালান—সন্ধান করেন এমন
কোনো জিনিসের যা জীবদেহের সুস্থ "টিসু" (tissue)-কে অক্ষত রেখে
ধ্বংস করবে কেবলমাত্র ক্ষতিকর জীবাণু।

১৯২১ সালের দিকে ভাবলেন তেমনই এক জিনিস যেন তিনি পেয়ে
গেছেন। সেই জিনিসটি—যার নাম তিনি দিয়েছিলেন—"লাইসোজাইম"

(lysozyme)—সেটি হলো এমন এক রাসায়নিক দ্রব্য যা জীবাণুকে দ্রবীভূত করতে পারে। এই লাইসোজাইমকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন—চোখের পানি, মুখের লালা,—এমনকি ডিমের শ্বেতাংশ থেকে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, পরে দেখা গেল লাইসোজাইম ক্ষতিকারক রোগ জীবাণুর মোটেই ক্ষতি করতে পারে না—ক্ষতি করে কেবল মাত্র সেই সকল জীবাণু যারা মানুষের মিত্র। কাজেই ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে মেডিক্যাল রিসার্চ ক্লাবের এক সভায় যখন তিনি লাইসোজাইম সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করলেন তখন সভাস্থ বিজ্ঞানীরা এই আবিষ্কারের কোনো গুরুত্বই দিলেন না, এমনকি একজন রসিকতা করে বললেন—"মারাত্মক সব জীবাণু নিয়ে আমি এমনই বিব্রত আছি যে, নির্দোষ জীবাণুর ব্যাপারে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।" অন্যদিকে যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে সেই কাজ ছাড়া অন্য কোনো কাজ করার জন্য অধ্যক্ষ ডাঃ রাইট তাঁকে ধমক দিলেন।

গবেষণাগারে ডাঃ রাইটের নির্দেশ মত তাঁকে কাজ করতে হতো—কিন্তু এ কাজে তাঁর মন ভরতো না। সব সময় তিনি একটা বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন। বিষাক্ত ক্ষতের যন্ত্রণায় কাতর সৈনিকদের করুণ আর্তনাদ এখনও তাঁর কানে বাজে—এখানেও হাসপাতালে প্রতিদিন কত রোগী আসে—সামান্য কাটা বা ক্ষত একদিন বিষাক্ত হয়ে তাদের অকাল মৃত্যু ঘটে। তিনি ভাবেন—"আচ্ছা এদের কী কোনক্রমে বাঁচানো যায় না? ডাঃ আরলিকের "স্যালভারসান"-এর মত কোনো অব্যর্থ ঔষধ কী আবিষ্কৃত হবে না, এসব বিষাক্ত ক্ষত সারানোর জন্য?" ফ্লেমিং ভাবতে থাকেন আর সন্ধান করেন এমনি কোনো জিনিসের। তাঁর অধ্যক্ষ ডাঃ রাইট কিন্তু রোগ জীবাণু ধ্বংস করার জন্য কোনো ঔষধ বা "রাসায়নিক বিষ" প্রয়োগের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, টিকা দিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিতে পারলে রোগ নিরাময় সম্ভব হবে—আর এটাই হলো উত্তম পন্থা। ফ্লেমিং অবশ্য এ মতবাদের বিরোধী ছিলেন না—তবে তিনি এ ধারণাও পোষণ করতেন যে—রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধেরও প্রয়োজন আছে।

যা হোক, লাইসোজাইম বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলেও তিনি কিন্তু দমলেন না, পরীক্ষা চালিয়ে যেতে লাগলেন। তিন বছর

পর ১৯২৪ সালে---কোনো বীজবারক কার্যকরী ও ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা তা নির্ণয়ের জন্য তিনি এক অভিনব পন্থা উদ্ভাবন করলেন। পন্থাটি হলো—প্রথমত, জীবাণুর ওপর বীজবারকটির কার্যকারিতার পরিমাপ করতে হবে, দেখতে হবে কতটা পরিমাণ জীবাণু ধ্বংস করতে কতটুকু বীজবারক প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, দেখতে হবে দেহের যে নিজস্ব জীবাণু ধ্বংসকারী শ্বেত কণিকা রয়েছে তার ওপর বীজবারকের কার্যকারিতা। যদি বীজবারকটিকে শ্বেত কণিকার প্রতি বেশী বিষাক্ত হতে দেখা যায় তবে বীজবারকটি সম্ভবত তেমন উপযোগী হবে না। কিন্তু সেটি যদি শুধুমাত্র জীবাণুকেই ধ্বংস করতে পারে—শ্বেত কণিকাকে নয়—তবে বীজবারক হিসাবে সেটি হবে যথার্থই কাজের এবং উপযুক্ত।

এরপর আরো চার বছর পার হলো—ঘনিয়ে আসলো তাঁর স্মরণীয় আবিষ্কারের দিন। শীঘ্রই একটি ডাক্তারী বই প্রকাশিত হবে—প্রকাশক তাঁকে অনুরোধ জানালেন—"স্ট্যাফাইলোকক্কাস" (staphylococcus) জীবাণু সম্পর্কে এতে একটি অধ্যায় লিখে দিতে। প্রকাশক অবশ্য উপযুক্ত লোকের কাছেই তাঁর অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কেননা, ফ্লেমিং তখন সেন্ট মেরী হাসপাতালের টিকা দান কেন্দ্রের পরিচালক—তদুপরি তিনি তখন পুঁজ উৎপাদক জীবাণু স্ট্যাফাইলোকক্কাস সম্পর্কে একজন স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। স্ট্যাফাইলোকক্কাস জাতের জীবাণুর মধ্যে রয়েছে এমন সব জীবাণু যারা যন্ত্রণাদায়ক ফোড়া, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি ছাড়াও মেরুদণ্ড, হৃৎপিণ্ড এবং রক্তের মারাত্মক সব সংক্রামক রোগের সৃষ্টি করে। প্রকাশকের পত্রটি ধরতে গেলে এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পত্র ছিল না। কিন্তু এই সাধারণ অনুরোধের পত্রটি পরবর্তীকালে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ও যোগাযোগের সূত্রপাত ঘটালো—যার তুলনা সমগ্র ভেষজ ইতিহাসে আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

ফ্লেমিং যখন লেখার কাজে হাত দিয়েছেন তখন একদিন এক প্রকাশিত রিপোর্ট পাঠ করে এক অবাক কাণ্ডের কথা জানতে পারলেন। কোনো কোনো পরিস্থিতিতে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর চেহারাটাই নাকি একেবারে পাল্টে যায়। ব্যাপারটা তার কাছে বেশ অদ্ভুত এবং অসাধারণ মনে হলো। স্থির করলেন তিনি এটি নিজেই পরীক্ষা করে দেখে তারপর এ

বিষয়ে লিখবেন। কাজেই লেখা আপাতত স্থগিত রইলো—পরীক্ষা শুরু হলো।

১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তাই একদিন ফ্লেমিংকে দেখা গেলো কয়েকটি কালচার প্লেট নির্বীজিত (sterilize) করতে। তারপর নির্বীজিত জেলি দিয়ে তিনি সেগুলি ভরলেন এবং নির্বীজিত ঢাকনি দিয়ে সেগুলিকে ঢাকলেন। এমনিভাবে সব কিছু ঠিকঠাক করে একটির ঢাকনা খুলে জেলির মধ্যে কিছু স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি ঢাকনা দিয়ে প্লেটটি ঢেকে দিলেন এবং এমনি সতর্কতার সঙ্গে সবগুলি প্লেটে জীবাণু চাষের ব্যবস্থা করলেন। বলা প্রয়োজন, ফ্লেমিং যেভাবে এবং যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করে জীবাণু চাষের ব্যবস্থা করলেন তাই ছিল জীবাণু চাষের চিরাচরিত রীতি, যাতে করে কোনো অবাঞ্ছিত জীবাণু উড়ে এসে কালচার প্লেট জুড়ে বসে অঘটন না ঘটায়! আর এটি করাও একান্ত প্রয়োজন ছিল ফ্লেমিং-এর ল্যাবরেটরির জন্য। কেননা, তাঁর ল্যাবরেটরি আধুনিক কালের কোনো উন্নত ল্যাবরেটরির মত ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে এবং নিখুঁতভাবে নির্বীজিত করা ছিল না। সেটি ছিল অনেকটা অন্ধকার, যন্ত্রপাতি আর অন্যান্য জিনিস পত্র দিয়ে প্রায় পূর্ণ—আর সবচেয়ে যা অযাচিত—যার জন্য ফ্লেমিং নিজেও অভিযোগ করতেন—তা হলো—সেটি মোটেই পরিষ্কার ছিল না। (তবে মজার কথা হলো - যা আমরা পরে জানতে পারবো—ফ্লেমিং-এর ল্যাবরেটরি যদি আধুনিক কালের কোনো বড় ল্যাবরেটরি হতো—তবে তাঁর বিরাট আবিষ্কারের পিছনে যে আকস্মিক ঘটনাটি রয়েছে তা কখনও ঘটতো না এবং তাঁর পক্ষে পেনিসিলিনের মত একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের সৌভাগ্য লাভ করা কোনদিন সম্ভব হত না!)

যাহোক, দিন গড়িয়ে চলে—সপ্তাহের পর সপ্তাহ শেষ হয়—ফ্লেমিং একের পর এক কালচার প্লেটগুলি পরীক্ষা করেন নতুন কালচার প্লেটে জীবাণু বপন করেন—আর এমনিভাবে কালচার প্লেটের স্তূপ জমে ওঠে তাঁর টেবিলে। মাঝে মাঝে পুরানো কালচার প্লেটগুলি অণুবীক্ষণে পর্যবেক্ষণ করেন - জীবাণুগুলির চেহারার কোনো পরিবর্তন ঘটেছে কিনা, দেখেন।

এমনিভাবে একদিন একটি পুরানো কালচার প্লেট পরীক্ষা করতে গিয়ে
ভ্রূ দুটি তাঁর কুঞ্চিত হলো –বিরক্তির সাথে বলে উঠলেন—"ড্যাম !
দিয়েছে তো সবকিছু বরবাদ করে ?" কিন্তু কেন এই বিরক্তি—কিসে
বরবাদ হলো তাঁর সবকিছু ? কারণ আর কিছু নয়—কালচার প্লেটে
কোথাও কোথাও ছাতা পড়েছে ! এমন কাণ্ড কেবল এ ক্ষেত্রে নয়—
নতুন কিছুও নয়। এমন অঘটন—অযাচিত বা অবাঞ্ছিত চিতি কিংবা
ছত্রাকের উদ্ভব প্রায়ই ঘটে থাকে কালচার প্লেটে। জীবাণু বপন বা
গজানো জীবাণু পরীক্ষার জন্য প্লেটের ঢাকনাটি সামান্য একটু সময়ের
জন্য হয়ত খোলা হয়েছে আর এরই মধ্যে বাতাসের দমকে ভাসন্ত
কোনো ছাতা বা চিতির বীজ রেণু ঝরে পড়লো সেই খোলা পাত্রে—
তারপর কয়েক দিনের মধ্যেই তা গজিয়ে, বৃদ্ধি পেয়ে কলুষিত করলো
জীবাণু চাষের মাধ্যমটিকে। এরপর যা করণীয় তা হলো কালচার
প্লেটের সবকিছু ফেলে দিয়ে তা পরিষ্কার করা এবং নতুন জীবাণু গজানোর
জন্য সেটি নির্বীজিত করা। ফ্লেমিং-ও তাই করতে যাচ্ছিলেন—কিন্তু
হঠাৎ কি মনে করে তিনি আর একবার প্লেটটিকে দেখলেন। এবার
যা দেখলেন তাতে আর বিরক্তি নয়—বিস্ময় ! অবাক হয়ে দেখলেন
ছাতা পড়া অংশের চারপাশটি বেশ পরিষ্কার - জীবাণুর জন্য ঘোলাটে
ভাব নেই। অণুবীক্ষণে ভাল করে দেখলেন –ছত্রাকটি যে সব জায়গায়
গজিয়েছে তার চারপাশে জীবাণুর বৃদ্ধি যেন কোন মন্ত্র বলে বন্ধ হয়ে
গেছে ! অনেক জায়গায় সেগুলি একেবারে গলে যাওয়ায় - জায়গাটি
একেবারে পরিষ্কার, স্বচ্ছ দেখাচ্ছে !

অন্য কোনো বিজ্ঞানী হলে ছাতার চারপাশের খানিকটা জায়গা
স্বচ্ছ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে হয়ত একটু অবাক হতেন,
তারপর তা নিয়ে আর মাথা ঘামাতেন না –কালচার প্লেটটি পরিষ্কার
করার কাজে মনোযোগী হতেন। কিন্তু ফ্লেমিং তেমন কোনো বিজ্ঞানী
ছিলেন না। আগেই বলেছি তিনি ছিলেন খুবই সজাগ এবং সূক্ষ্ম
দৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞানী। তা'ছাড়া ফ্রান্স থেকে ফিরে আসার পর থেকে
বরাবরই তিনি উপযুক্ত জীবাণুনাশক দ্রব্যের সন্ধান করে আসছিলেন

—লাইসোজাইমের সূত্রে সঞ্চিত হয়েছে তাঁর অনেক অভিজ্ঞতা। তাই ছত্রাক উপনিবেশের সংলগ্ন এলাকায় জীবাণু বিগলিত হওয়ার ব্যাপারটা লক্ষ্য করে ক্ষণিকের জন্য কেবল তিনি অবাক হননি—সেটি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট ও ভাবিত করে তুলেছিল- ভাবনার মধ্যে ভেসে উঠেছিল অনেক কিছু! ভেবেছিলেন,—তবে কী ছত্রাকটি এমন কোনো রাসায়নিক দ্রব্য নিঃসৃত করে যা মন্ত্র বলে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুকে নিশ্চিহ্ন করে? স্টাফাইলোকক্কাসের মত অন্য কোনো রোগ জীবাণুকেও কী তা বিনষ্ট করতে পারে? ব্যাধির বিরুদ্ধে এই ছত্রাককে কী ব্যবহার করা যাবে?

ফ্লেমিং বরাবরই একটা বড় কিছু আবিষ্কারের কথা ভাবতেন—হঠাৎ করে পাওয়া এমন কিছু যা তাঁকে মহৎ কোনো আবিষ্কারের পথ দেখাবে—সার্থক করে তুলবে তাঁর স্বপ্ন। তবে কী দৈবক্রমে যা তিনি আজ দেখতে পেলেন সে কী কেন বড় আবিষ্কারের আভাস? সত্যিই তাই। ব্যাপারটি লক্ষ্য করে যে চিন্তা ভাবনা একের পর এক তাঁর মনে উদয় হচ্ছিল- তারই সূত্রে পরবর্তী কালে তিনি আবিষ্কার করেন এক আশ্চর্য অদ্ভুত কর্ম। অ্যান্টিবায়োটিক—বিখ্যাত পেনিসিলিন।

কিন্তু এ আবিষ্কারের গোড়া পত্তন ঘটেছিল নিতান্ত আকস্মিকভাবে। কেননা, ফ্লেমিং তখন কোনো জীবাণুনাশক ঔষধ আবিষ্কারের কাজে লিপ্ত ছিলেন না। কিন্তু লিপ্ত না থাকলেও এই আকস্মিক ঘটনার গুরুত্ব উপলব্ধি করার মত মানসটি তাঁর প্রস্তুতই ছিল। তাই এই ঘটনার পর পরই তিনি সেই ছত্রাকটি নিয়ে ভীষণ উত্তেজিত ও উন্মত্ত হয়ে উঠলেন! পুষ্টিকর মাংসের নির্যাসে তিনি ছত্রাকটির চাষ করলেন—আর দিনের পর দিন পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন তার আচরণ। দেখলেন,—তরল কালচার মাধ্যমের উপরিতলে ছত্রাকটি জন্মায়—প্রথমে সাদা তুলার মত—কয়েকদিন পর তার রঙ হয় গাঢ় সবুজ—তারপর শুরু হয় সরু সরু ঝাঁটার কাঠির মত শাখা প্রশাখার বিস্তার। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ছত্রাকটির গায়ে জমে সোনালী বর্ণের তরল বিন্দু। এই তরল বিন্দু জমে জমে একতা সময় কালচার মাধ্যমে ঝরে পড়ে—ফলে মাধ্যমটির রঙ হয়ে যায় হলুদ। ফ্লেমিং এই হলুদ রঙের কিছুটা তরল স্ট্যাফাইলো

হয়েছে। এবার স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণুর ওপর পরীক্ষা করেলেন। কক্কাস জীবাণুর মধ্যে ঢেলে দিলেন—দেখলেন, জীবাণুদের বৃদ্ধি বন্ধ হয়েছে। এবার স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণুর ওপর পরীক্ষা করেলেন। দেখলেন - একই ফলাফল। পরীক্ষা চললো একে একে নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, মেনিনজাইটিস, গনোরিয়া রোগ জীবাণুর ওপর। দেখা গেল, এ সকল জীবাণুকেও সহজে নষ্ট করতে পারে হলুদ রঙের ঐ তরল পদার্থ। কিন্তু কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ জীবাণুকে এটি কাবু করতে পারে না। তবে, সব রকমের রোগ জীবাণুকে ঐ হলুদ রঙের তরল ধ্বংস করতে না পারলেও - যে সকল ক্ষেত্রে তা পারে সেখানে তার ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়কর। পানি দিয়ে তরলটিকে ৮০০ গুণ লঘু করলেও তার জীবাণু নাশক ক্ষমতা লাঘব হয় না। হিসাব করে যখন দেখা গেল এর জীবাণু নাশক ক্ষমতা কার্বলিক অ্যাসিডের চেয়েও তিনগুণ বেশী তখন ফ্লেমিং আঁত্‌কে উঠলেন। "কী আশ্চর্য! এমন জিনিস তো ইতর প্রাণী কেন, মানুষকেই মেরে ফেলবে, ধ্বংস করবে তাদের টিস্যু!" কিন্তু না, তা করলো না। শ্বেত কণিকা নিয়ে পরীক্ষা করলেন ফ্লেমিং- দেখলেন, সেগুলি অক্ষতই থাকলো। আধ আউন্সেরও বেশী পরিমাণ ঐ তরল একটি খরগোশের দেহে ইঞ্জেকশন দিলেন - কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেখা গেল না। এমন কি তার ভুরু দুটি পর্যন্ত একটু কুঞ্চিত হলো না! এর পর তিনি খরগোশ, গিনিপিগ প্রভৃতি প্রাণীদেহে রোগ জীবাণুসহ ঐ তরল ইঞ্জেকশন দিয়েও আশাতীত ফল পেলেন। প্রাণীগুলি যেমন রোগাক্রান্ত হলো না, তেমনি তাদের মধ্যে কোনো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াও পরিস্ফুট হলো না। এখন মানুষের ওপর পরীক্ষার পালা। কয়েকজন ডাক্তারকে তিনি অনুরোধ করলেন কোনো রোগীর ওপর এটি পরীক্ষা করতে। কিন্তু ছত্রাক নিঃসৃত এক আনকোরা পদার্থ রোগীর দেহে প্রয়োগ করতে তাঁরা কেউ সাহসী হলেন না। তবে রোগী নয় সুস্থ মানুষের দেহে পরীক্ষার এক সুযোগ তিনি পেলেন। তাঁর এক সহকারী স্টুয়ার্ট ক্রাডক এগিয়ে এলেন। ফ্লেমিং তার দেহে ইঞ্জেকশন দিলেন—খারাপ কিছু ঘটলো না—দিব্যি সুস্থ থাকলেন তাঁর সহকারী।

যদিও রোগীর দেহে ইঞ্জেকশন দিয়ে প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করার সুযোগ তখনও ঘটলো না তবে দ্রব্যটিকে বাহ্যিক প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া গেল। চোখ কিংবা শরীরের অন্য কোন অংশের ক্ষতে এটি ব্যবহার করে— জানা গেল, রোগী কোনো জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে না—অধিকন্তু ঘা শীঘ্রই শুকিয়ে যায়। ক্রাডক এক সময় নাকের পাশে সাইনাসের রোগে ভুগছিলেন। অণুবীক্ষণে দেখা গেল সাইনাসের পুঁজের মধ্যে অসংখ্য স্ট্যাফাইলোকক্কাস। ফ্লেমিং তরল দ্রব্যটি দিয়ে সাইনাস ধুয়ে দিলেন। তিন ঘণ্টা পারে পরীক্ষা করে দেখা গেল, সাইনাস প্রায় জীবাণু শূন্য।

ইতিমধ্যে ছত্রাকাটির পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। ফ্লেমিং অনেক বই পুস্তক ঘেঁটে এটিকে পেনিসিলিয়াম (penicillium) গোত্রের এক ছত্রাক হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তাই ঐ ছত্রাক থেকে নিঃসৃত হলুদ পদার্থটির নামকরণ করলেন –পেনিসিলিন ( penicillin )। পরে অবশ্য ছত্রাকটির সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় ছত্রাক বিশেষজ্ঞ চার্লস থম-এর
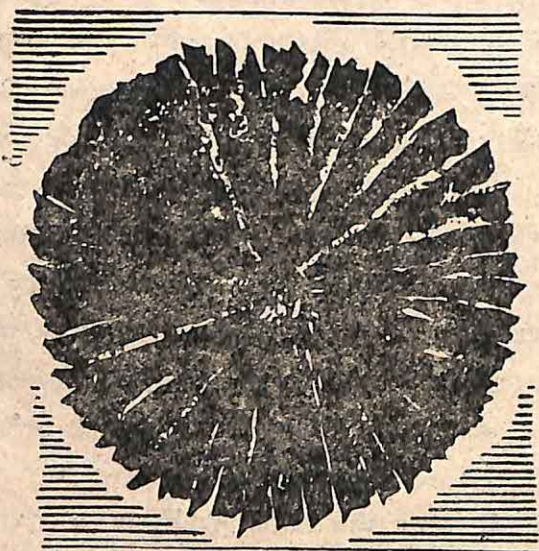
পেনিসিলিয়াম নোটেটাম

কাছ থেকে। তিনি এটিকে পেনিসিলিয়াম নোটেটাম ( penicillium Notatum) বলে শনাক্ত করেন।

যাহোক, পেনিসিলিন নিয়ে এতদিন যে পরীক্ষা চললো তার ফলাফল ছিল উৎসাহব্যঞ্জক। কিন্তু অসুবিধা দাঁড়ালো পেনিসিলিনকে ব্যবহার-যোগ্য ঔষধ হিসাবে উপযোগী করার ব্যাপারে। সামান্য একটি পরীক্ষার জন্য কয়েক সপ্তাহ লেগে যেত প্রয়োজনমাফিক পেনিসিলিন পেতে। সাধারণ অবস্থায় ছত্রাক থেকে কালচার প্লেটে যতটুকু পেনিসিলিন পাওয়া যেত তার পরিমাণ ও শক্তি ছিল খুবই সামান্য। তাছাড়া ঐ পেনিসিলিন যেমন বিশুদ্ধ ছিল না—তেমনি তার গুণাগুণও টিকে থাকতো না বেশীদিন। সামান্য তাপ বা সামান্য এসিডের সংস্পর্শে তার সক্রিয়তা লোপ পেত। ফ্লেমিং তাই চাইলেন পেনিসিলিনকে কঠিন এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় পেতে। ফ্লেমিং নিজে এটি পারবেন না—দরকার রসায়নবিদের সাহায্য। অনেক কষ্টে তিনি তাঁর দু'জন সহকারী রিডলি ও ক্রাডককে এ কাজে রাজি করালেন। তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন - কিন্তু সফল হতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া গেল তা হলো—অবিশুদ্ধ আঠালো এক পদার্থ।

তাঁরা যা পারলেন না—ভবিষ্যতে অন্য কেউ সফল হবেন এই আশায় ফ্লেমিং আটমাস ধরে পরিচালিত তাঁর গবেষণার এক রিপোর্ট পাঠ করলেন ১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে—"লণ্ডন মেডিক্যাল রিসার্চ ক্লাব"-এর এক সভায়। উপস্থিত সকলেই তাঁর আবিষ্কারের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বটে কিন্তু কেউই তাঁর আবিষ্কারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন না, অন্য আলোচনায় মনোযোগ দিলেন। ফ্লেমিং এতেও দমলেন না। তিনি পেনিসিলিন সম্পর্কে একটি গবেষণা পত্র লিখলেন এবং সেটি কোনো ডাক্তারী পত্রিকায় প্রকাশের মনস্থ করলেন। প্রকাশের আগে গবেষণাগারের যিনি প্রধান তাঁর অনুমতি নেয়া প্রয়োজন তাই তিনি প্রবন্ধটি পেশ করলেন স্যার রাইটের কাছে। রাইট প্রথমে অনুমতি দিতে চাইলেন না উপরন্তু নিজের কাজ ছেড়ে অন্য কাজে মনোযোগ দেয়ার জন্য আবার তাঁকে ধমক দিলেন। কিন্তু ফ্লেমিং এবার নাছোড়বান্দা! অগত্যা রাইট রাজি হলেন এই শর্তে যে,—তাঁর শেষের মন্তব্য—"পেনিসিলিন ইঞ্জেকশন হিসাবে বা ক্ষতস্থানের ওপর লাগালে তা রোগ জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা রাখে"—

সেটি বাদ দিতে হবে। ফ্লেমিং জেদ ধরলেন – না, কিছুই তিনি বাদ দেবেন না। শেষ পর্যন্ত রাইট নতি স্বীকার করে সম্পূর্ণ প্রবন্ধটি প্রকাশের অনুমতি দিলেন এবং সেটি প্রকাশিত হলো – 'ব্রিটিশ জার্নাল অফ এক্সপেরিমেণ্টাল প্যাথলজি'' নামে এক ডাক্তারী পত্রিকায় – ১৯২৯ সালের মে মাসে।

কিন্তু ফ্লেমিং যা আশা করেছিলেন তাঁ হলো না – তাঁর ৮ বছর আগেকার লাইসোজাইমের মত পেনিসিলিনও বিজ্ঞান মহলে কোনো সাড়া জাগাতে পারলো না।

এরপর ১৯৩৫ সালে যে ঔষধ নিয়ে সারা বিশ্বে সাড়া পড়ে গেল সেটি হলো ডোমাখ্-এর-''প্রণ্টোসিল''। ফ্লেমিং বলতেন পেনিসিলিন – স্যালভার-সান, প্রণ্টোসিলের চেয়েও বেশী শক্তিশালী। ১৯৩৬ সালের আন্তর্জাতিক চিকিৎসা সম্মিলনীতে তিনি তা প্রমাণ করেও দেখিয়েছিলেন – কিন্তু বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তখন ছিল অন্য দিকে। প্রণ্টোসিল ও অন্যান্য সালফা জাতীয় ঔষধ নিয়ে তখন তাঁরা মেতে উঠেছেন - এদের আশ্চর্য রোগ নিরাময় ক্ষমতা দেখে তখন তাঁরা চমৎকৃত। তাছাড়া পেনিসিলিনের প্রতি বিজ্ঞানীদের অনীহার অন্য কারণও ছিল। গ্রাম্য বা হাতুড়ে ডাক্তাররাই ছাতা, চিতি বা গাছ গাছড়ার নির্যাস রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করতেন - প্রগতিশীল চিকিৎসকেরা তাই এধরনের চিকিৎসাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। ল্যাবরেটরির সংশ্লেষিত (synthetic) ঔষধের প্রতিই তাদের ছিল সবিশেষ আগ্রহ। অন্যদিকে পেনিসিলিনকে তখনও বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়াও সম্ভব হয়নি - প্রচুর পরিমাণে পাওয়া তো দূরের কথা। যদি তা সম্ভবও হয় কখনো, তবু তার তৈরী খরচ পড়বে অনেক বেশী। কেননা, পেনিসিলিন তৈরী হয় একটি জৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। কাজেই তার প্রস্তুতিতে দরকার হয় দীর্ঘ সময়। অথচ সালফা জাতীয় ঔষধগুলি কৃত্রিম উপায়ে ল্যাবরেটরিতে স্বল্প সময়ে যদৃচ্ছা তৈরী করা যেতে পারে – তাই তাদের দামও অনেক কম।

এহেন পরিস্থিতিতে ফ্লেমিং তাই বেশ কিছুটা দমে গেলেন। তাছাড়া অর্থ এবং ল্যাবরেটরিতে উপযুক্ত বিজ্ঞানীর অভাব, অধ্যক্ষ রাইটের বিরূপ মনোভাব তাকে নিরুৎসাহ করে তুলেছিল। নিজে থেকে পেনিসিলিন নিয়ে

কাজ করা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হলো না। অবশ্য এই নৈরাশ্যের মাঝেও কিছুটা আশার আলো তিনি দেখতে পেয়েছিলেন যখন দু'একজন অত্যুৎসাহী বিজ্ঞানী—বিশেষ করে "লণ্ডন স্কুল হাইজিন"-এর স্বনামধন্য প্রাণ রসায়নবিদ ডঃ রেইসট্রিক (Raistrick) ও তাঁর সহকর্মীরা পেনিসিলিন বিশুদ্ধ করণের কাজ হাতে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরাও যখন বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন—তখন সবটুকু আশার আলো নিভে গেল—বাধ্য হয়ে তিনিও এ পথে আর অগ্রসর হলেন না। কাজ বন্ধ করা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন "যখন আমরা দেখলাম যে এই সুদক্ষ কেমিস্ট (রেইসট্রিক) বিশুদ্ধ পেনিসিলিন উদ্ধার করতে পারলেন না তখন আমরাও এ কাজ বন্ধ করলাম। তিনি যদি সক্ষম না হন—তবে আমরাও অক্ষম।" ফলে পেনিসিলিন নিয়ে উচ্চবাচ্য করার মত কেউ আর রইলো না—পেনিসিলিনের কথা লোকে ভুলে গেল—বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেল পেনিসিলিন।

কিন্তু ফ্লেমিং পেনিসিলিনকে ভুলতে পারলেন না। তিনি এবং রেইসট্রিক যা পারলেন না—তা অন্য কেউ কোনো একদিন যে নিশ্চয় সাধন করতে পারবেন এই দৃঢ় প্রত্যয় ও দুরন্ত আশা নিয়ে দীর্ঘ দশ বছর তিনি তাঁর ল্যাবরেটরির এক অন্ধকার কোণে—ঐ অদ্ভুতকর্মা ছত্রাক পেনিসিলিয়াম নোটেটামের চাষ চালিয়ে গেলেন।

এই দশ বছরে পৃথিবীতে অনেক কাণ্ড ঘটে গেল। জার্মানীতে হিটলারের তখন দুর্দান্ত প্রতাপ—তদুপরি জার্মান বিজ্ঞানীরা প্রথম সালফা জাতীয় ঔষধ আবিষ্কার করে জার্মানীর প্রতিপত্তি আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। তারপর সালফানিলামাইড, সালফা পিরিডিন বা এম. বি. ৬৯৩ আবিষ্কৃত হয়ে নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস প্রভৃতি মারাত্মক রোগকে পরাভূত করলো। তারপর বেরুলো সালফা থিয়োজল বা সিবাজল, সালফা গুয়ানিডিন প্রভৃতি—যাদের অব্যর্থ কার্যকারিতা চিকিৎসা ক্ষেত্রে আনলো এক যুগান্তর। চিকিৎসা বিজ্ঞানে যদিও যুগান্তর আসলো কিন্তু কারো মনে শান্তি ছিল না। হিটলারের দাপটে যুদ্ধের ঘনঘটা ঘনিয়ে আসলো।

১৯৩৮ সালের দিকে ইংল্যাণ্ডে এবং সম্ভবত সারা বিশ্ব যুদ্ধ জড়িয়ে পড়ার সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা দিল। দেহের কোনো ক্ষতি না করে রোগ

জীবাণুকেই কেবল বিনষ্ট করবে—এমন একটি জীবাণুনাশক ঔষধের প্রয়োজন তাই বিশেষভাবেই দেখা দিল। কেননা, পূর্বেই বলেছি সালফা জাতীয় ঔষধ যে বিরাট সম্ভাবনা বহন করে এনেছিল তা পুরোপুরি সফল হলো না—বিশেষ করে পরে ক্ষতের চিকিৎসায় তা একেবারেই ব্যর্থ প্রমাণিত হলো। অথচ যুদ্ধের সময় ডাক্তারদের কাছে যা জরুরী হয়ে দাঁড়াবে তা হলো আহত সৈনিকদের তাৎক্ষণিক ক্ষত চিকিৎসা। তা না হলে ক্ষত বিষাক্ত হয়ে বহু সৈন্য মারা পড়বে। কাজেই একটি সুষ্ঠু জীবাণু নাশক ঔষধের সন্ধান করতে লাগলেন বিজ্ঞানীরা। আর এই সন্ধানের কাজে যিনি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন—তিনি হলেন অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক ডাঃ হাওয়ার্ড ওয়ালটার ফ্লোরি ( Dr· Howard walter Florey )।

ডাঃ হাওয়ার্ড ওয়াল্টার ফ্লোরি

ফ্লোরি অস্ট্রেলিয়ায় ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়ায়, খেলা-ধূলায় তাঁর খুব নাম ডাক ছিল। তা ছাড়া বিতর্ক সভায় তিনি ছিলেন বিশিষ্ট। ছাত্রজীবনে অনেক পুরস্কার ও বৃত্তি লাভ করেছিলেন। ভালভাবে ডাক্তারী পাস করে—১৯২১ সালে এক বৃত্তি নিয়ে তিনি চলে আসেন ইংল্যাণ্ডে। আসার সময় তিনি তাঁর বান্ধবী ইথেল রীডকে (তখন মেডিক্যাল ছাত্রী) বলে আসেন—"অপেক্ষা করো,—আমি তিন বছরের

মধ্যে ফিরে আসছি।" এরপর তিনি তিন বছর অক্সফোর্ডে পড়াশুনা করে কিছুদিন কেমব্রিজে কাজ করেন। ১৯২৫ সালে রকফেলার ফেলো হিসাবে আমেরিকায় যান এবং পরের বছর লণ্ডন হাসপাতালে যোগ দেন। দেশে আর ফেরা হলো না—বান্ধবীকে চিঠি দিলেন—"দেশে যেতে পারবো না বেশ কিছুদিন—তুমি কি আমার কাছে, ইংল্যাণ্ডে চলে আসবে?"

ইতিমধ্যে ইথেল ডাক্তারী পাস করে এক শিশু হাসপাতালে চাকরি করছিলেন—বেশ সুনামও হয়েছে—কিন্তু ফ্লোরির চিঠি পেয়ে, চাকরি ছেড়ে, তিনি চলে আসলেন ইংল্যাণ্ডে, ফ্লোরির গৃহিণী হতে।

বিয়ের কিছুদিন পর ফ্লোরি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়ে ছাত্র পড়ানো এবং জীবাণুনাশক জিনিস নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ভাগ্যক্রমে ফ্লোরি ফ্লেমিং-এর লাইসোজাইম নিয়েই কাজ শুরু করলেন এবং শেষ করলেন ফ্লেমিং-এর সেই অনাদৃত পেনিসিলিন দিয়ে যার জন্য ভবিষ্যতে, তিনি হয়েছিলেন বিশ্ববিখ্যাত।

ফ্লোরি লাইসোজাইম নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে ফ্লেমিং-এর বক্তব্য এক বর্ণও মিথ্যে নয়। মনে মনে বললেন—"এই ভদ্রলোক, ফ্লেমিং, তাঁর কাজ বেশ ভালভাবেই জানতেন দেখছি!"

১৯৩১ সালে ফ্লোরি শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং পরে ১৯৩৫ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্যাথলজির অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবাণু বিষয়ে গবেষণার জন্য "স্যার উইলিয়াম ডান ইনস্টিটিউট অফ প্যাথলজি" নামক প্রতিষ্ঠানটি তখন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতিতে সেটিকে সুসজ্জিত করা হয়। ফ্লোরি এই গবেষণাগারের জন্য সুযোগ্য গবেষক সংগ্রহ করছিলেন। একজন প্রতিভাবান প্রাণ রসায়নবিদের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি স্বভাবতঃই কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রাণ রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক নোবেল বিজয়ী ভিটামিন আবিষ্কারক স্যার ফ্রেডারিক গওল্যাণ্ড হপকিন্স-( Frederick Gowland Hopkins )—এর পরামর্শ চাইলেন। হপকিন্স প্রাণ রসায়নবিদ ডঃ আর্নষ্ট বোরিস চেইন (Dr. Ernst Boris Chain)-কে উপযুক্ত বলে সুপারিশ করলেন।

চেইন ১৯০৬ সালে জার্মানীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মা ছিলেন জার্মান এবং বাবা রুশীয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বায়োকেমিষ্ট্রিতে

আর্নষ্ট বোরিস চেইন

স্নাতক ডিগ্রী লাভ করে তিনি সেখানকার বিরাট চ্যারিটি হাসপাতালে জীবাণুতত্ত্ব বিভাগে এনজাইম এবং অন্যান্য জটিল পদার্থ, ঈস্ট, জীবাণু, টিস্যু কালচার প্রভৃতি বিষয়ে কাজ করে বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন ইহুদী। তাই হিটলার ও তাঁর নাজী দলের ইহুদী নির্যাতনের সময় তিনি দেশ ছেড়ে ইংল্যাণ্ডে চলে অসেন এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিটামিন সন্ধানী স্যার ফ্রেডারিক হপকিনসের অধীনে গবেষণা করতে থাকেন। ১৯৩৫ সালে হপকিসের সুপারিশক্রমে তাকে সহকারীর পদে যখন ফ্লোরি আমন্ত্রণ জানালেন তখন তিনি সানন্দে তা গ্রহণ করলেন।

ফ্লোরি ও চেইনের মধ্যে শীঘ্রই বন্ধুত্ব গড়ে উঠলো—তাঁরা হলেন সহকর্মী। পরস্পরের কাজ সম্পর্কে তারা আলোচনা করেন—একে অন্যের প্রশ্নের জবাব দেন। ফ্লোরি টিস্যু ও রোগ সম্পর্কে তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করেন আর চেইন তার কেমিষ্ট্রির কলা-কৌশল। সালফা জাতীয় ঔষধ নিয়েও

তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। এগুলি আবিষ্কারের ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ উন্নতি হয়েছে একথা তাঁরা স্বীকার করেন—কিন্তু রোগ চিকিৎসায় আরো ভাল কিছুর প্রয়োজন রয়েছে বলে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রথমে তাঁরা ফ্লেমিং-এর-লাইসোজাইম নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন—জীবাণুনাশক দ্রব্য সম্পর্কে বিশদভাবে জানার জন্য। এ কাজ শেষ করে তাঁরা ভাবতে লাগলেন লাইসোজাইমের মত অন্য কোন জীবাণুনাশক দ্রব্যের কথা—তবে বড় কোনো জীব নিঃসৃত নয়—চিতি, ছত্রাক বা জীবাণু নিঃসৃত কোনো পদার্থ। [রেনে ডুবোস (Rene Dubos)-এর গবেষণা তাঁদেরকে এই সব অণুজীবের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিয়েছিল যা আমরা পরের অধ্যায়ে জানতে পাবো।] ফ্লোরির ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। এই ভাবনার সূত্রে ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিনের কথা তাঁর মনে পড়লো। মনে পড়লো একটি ডাক্তারী পত্রিকায় এ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি চেইনকে প্রবন্ধটির খোঁজ করতে বললেন। চেইন এবং তার সহকারী লেসলি ফক্ জীবাণুনাশক দ্রব্য সম্পর্কে পুরানো সব রিপোর্ট ঘাঁটতে ঘাঁটতে একদিন ফ্লেমিং-এর ১৯২৯ সালে প্রকাশিত রিপোর্টটি পেয়ে গেলেন। প্রবন্ধটি পাঠ করে চেইন বিস্মিত হয়ে ফক্‌কে বললেন—"কী অদ্ভুত কাণ্ড দেখ! আট বছর আগে এই ভদ্রলোক চমৎকার এক জীবাণুনাশকের খোঁজ পেয়েছিলেন কিন্তু কেন যে তিনি এ নিয়ে আর বেশী দূর এগোননি সেটাই আশ্চর্য।" ফক্ প্রবন্ধটি পড়ে বললেন—"আমার মনে হয় ডঃ চেইন, পেনিসিলিন এমন কোনো নটখটে, এমন কোনো কঠিন কেমিক্যাল যাকে বশে আনা হয়ত সম্ভব ছিল না!" চেইন উত্তেজিত হয়ে বললেন "সম্ভব ছিল না? না তা হতে পারে না—কাজটা হয়ত কিছু কঠিন—কেমিক্যালটা হয়ত একটু বিদঘুটে কিন্তু তাকে বাগে আনতে পারা যাবে না, এ আমি বিশ্বাস করি না—আমি এ চালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। চলো, ডাঃ ফ্লোরির সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা যাক্।"

আলোচনায় ঠিক হলো কাজ শুরু করার। ফ্লোরি রকফেলায় ফাউণ্ডেশনের কাছে আবেদন করে ৫ হাজার ডলার সাহায্য পেলেন। কয়েকটি ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠান থেকেও সামান্য সাহায্য পাওয়া গেল। ১৯৩৮ সালে পেনিসিলিনের রাসায়নিক প্রকৃতি, শারীর বৃত্তীয় ক্রিয়া (physiological action) সম্পর্কে

বিস্তৃত গবেষণা শুরু হলো। অক্সফোর্ড ল্যাবরেটরির একজনের কাছ থেকে ফ্লেমিং-এর ছত্রাকের নমুনা পাওয়া গেল। তবে কাজ চললো ঢিমে তালে অন্যান্য জরুরী কাজের ফাঁকে ফাঁকে। কিন্তু হঠাৎ করেই দ্রুত তালে শুরু করতে হলো কাজ। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের এক সকালে "বি-বি-সি" ঘোষণা করলো হিটলারের পোলাণ্ড আক্রমণের কথা—আরম্ভ হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

যুদ্ধে ব্রিটেনের যেমন দরকার বন্দুক-কামান ট্যাঙ্ক-বম্বার তেমনি প্রয়োজন বিভিন্ন ঔষধ—অ্যানেসথেটিক, ভ্যাক্‌সিন—এবং বিশেষ করে ক্ষতে পচন ধরায় এমন জীবাণুকে ধ্বংস করার অব্যর্থ জীবাণুনাশক। কিন্তু তেমন অমোঘ জীবাণুনাশক কোথায়? পেনিসিলিন কি সে আশা পূরণ করতে পারবে? কিন্তু আপসোসের কথা পেনিসিলিনকে তখনওতো বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়নি—রুগ্ন প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করে দেখা হয়নি, মানুষতো দূরের কথা। বিশুদ্ধ পেনিসিলিন প্রস্তুতের কাজে চেইনকে সাহায্য করার জন্য ফ্লোরি তাই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর এক শ্রেষ্ঠ সহকারী ডঃ নরমান হিটলিকে চেইনের সাথে কাজ করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অক্সফোর্ডের জীবাণুতত্ত্বের অধ্যাপক আর্থার ডানকান গার্ডনারকে রাজি করালেন এই দলে যোগ দিতে এবং শীঘ্রই আরো অনেক বিজ্ঞানী সহকারে গঠিত হলো একটি শক্তিশালী গবেষক দল। বিরাট বিরাট মাটির পাত্রে ভরা হলো ছত্রাকের খাদ্য আর তাইতে চললো পেনিসিলিয়াম নোটেটামের চাষ। চললো, কালচার মাধ্যম থেকে পেনিসিলিন উদ্ধার করে প্রাণীর ওপর তার পরীক্ষা। ফ্লেমিং যা যা উল্লেখ করেছিলেন সবগুলিই তাঁরা যাচাই করে দেখলেন। পেনিসিলিনের কোনো বিষক্রিয়া আছে কিনা তা তাঁরা ইঁদুর, বিড়াল, কুকুরের দেহে, এমনকি একটি খরগোশের মগজ—টিস্যুতে পরীক্ষা করলেন। না, কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হলো না। কোন্ কোন্ জীবাণুকে পেনিসিলিন ঘায়েল করতে পারে -কাদেরকে পারে না তাও তাঁরা একাধিক বার পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে পরীক্ষা করে দেখলেন।

১৯৩৯ সালের শেষের দিকে তাঁরা কালচার মাধ্যম থেকে হলুদ রঙের কিছু পাউডার তৈরি করতে সক্ষম হলেন। এটি বিশুদ্ধ পেনিসিলিন না

হলেও মোটামুটি বিশুদ্ধ। পরীক্ষায় দেখা গেলো, এই হলুদ রঙের পাউডার
৩ কোটি গুণ পানিতে লঘু করলেও তার জীবাণুনাশক ক্ষমতা লাঘব
হয় না। এর জীবাণুনাশক ক্ষমতা সবচেয়ে শক্তিশালী সালফা ঔষধের
চেয়ে দশগুণ এবং ফ্লেমিং-এর ব্যবহৃত পেনিসিলিনের চেয়েও এক হাজার-
গুণ বেশী।

১৯৪০ সালের শেষের দিকে পরীক্ষা চললো রোগাক্রান্ত প্রাণীর ওপর।
ফ্লোরি ৮টি সুস্থ সাদা ইঁদুর বেছে নিয়ে স্ট্রেপটোককাস রোগজীবাণু
সক্রামিত করলেন। রোগাক্রান্ত এই ৮টি ইঁদুরের মধ্যে ৪টিকে কোনো
পেনিসিলিন দেয়া হলো না (কন্ট্রোল)—অন্য চারটিকে দেয়া হলো পেনি-
সিলিন ইঞ্জেকশন—৩ ঘন্টা পরপর, একদিন একরাত ধরে। কেননা, তাঁরা
দেখেছিলেন—পেনিসিলিন প্রাণিদেহে বেশী ক্ষণ থাকে না··প্রস্রাবের
সঙ্গে বেশীর ভাগ বেরিয়ে যায়। এসম্পর্কে ফ্লোরি পরে মন্তব্য করেছিলেন
"এ যেন প্লাগ (plug) খোলা রেখে বেসিনে পানি ঢালার মত।"

যা হোক, এই পরীক্ষার ফলাফল যা দাঁড়ালো তা' বিস্ময়কর।
সকালের দিকেই যে ৪টি ইঁদুরকে পেনিসিলিন দেয়া হয়নি তারা মারা
গেল—কিন্তু যাদেরকে পেনিসিলিন দেয়া হয়েছিল তাদের সবকটিই বেঁচে
রইলো।

এরপর তাঁদের হাতে যেটুকু পেনিসিলিন ছিল তাই দিয়ে তাঁরা প্রাণি-
দেহে অনুরূপ পরীক্ষা চালালেন এবং পরিশেষে যে ফলাফল দাঁড়ালো
তাতে দেখা গেল,—এই "ম্যাজিক কেমিক্যাল"—পেনিসিলিন—স্ট্রেপটো-
ককাস জীবাণু সংক্রামিত ২৪টি ইঁদুরের মধ্যে ২১টি, বিশেষ ধরনের মারাত্মক
স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু সংক্রামিত ২৫টি ইঁদুরের মধ্যে ২৪টি এবং
গ্যাস-গ্যাংগ্রীন রোগাক্রান্ত ২৫টি ইঁদুরের মধ্যে ২৪টিকে বাঁচাতে সক্ষম
হয়েছে।

এ ফলাফল তাঁরা তাঁদের মন্তব্যসহ একটি সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট হিসাবে
ডাক্তারী পত্রিকা "ল্যানসেট"—এ প্রকাশ করলেন। মন্তব্যটি হলো—
"পরীক্ষার ফলাফল সুস্পষ্ট, পেনিসিলিনের জীবাণুনাশক ক্ষমতা অসাধারণ।"

রিপোর্ট'টি পাঠ করে ফ্লেমিং সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসলেন অক্সফোর্ডে—
অভিনন্দন জানাতে সেই সব বিজ্ঞানীকে—যাঁরা তাঁর আবিষ্কারকে সাফল্যের

পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। চেইন ফ্লেমিংকে দেখে অবাক হলেন। তিনি ভেবেছিলেন ফ্লেমিং বেঁচে নেই। নতুবা এত বড় আবিষ্কার করে তিনি গবেষণা শেষ করেন নি কেন? বিস্ময়ের সাথে চেইন তাই বললেন—"স্যার, আপনি জীবিত জানলে আপনার কাছে আগেই উপদেশ নিতে যেতাম—কিন্তু আপনি কাজ বন্ধ করেছিলেন কেন?" ফ্লেমিং অকপটে স্বীকার করলেন—"যোগ্য সহকারী এবং অর্থাভাব, অধ্যক্ষের বিরূপ মনোভাব—আমাকে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করেছিল।"

এই সাক্ষাতের ফলে ফ্লেমিং-এর সাথে অক্সফোর্ড-গবেষকদের অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠলো। যে কোনো প্রয়োজনে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি এবং সকলকে সমধিক উৎসাহ দিয়ে ফ্লেমিং লণ্ডনে ফিরে এলেন।

এরপর অক্সফোর্ড-গবেষকদলের প্রস্তুতি চললো রুগ্ন মানুষের ওপর পেনিসিলিন পরীক্ষা করার। ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারীর প্রথম দিকে প্রায় দু'বছর কঠিন পরিশ্রমের পর তাঁরা প্রায় এক চা চামচ পরিমাণ পেনিসিলিন প্রস্তুত করতে সক্ষম হলেন। ভাবলেন এদিয়েই সম্ভব হবে কোনো রোগীকে সারিয়ে তোলা। হাসপাতালের ডাক্তারদেরকে ফ্লোরি অনুরোধ করলেন কোনো রোগীর ওপর এই পেনিসিলিন পরীক্ষা করতে। কিন্তু রোগীকে কোনো নতুন ওষুধ প্রয়োগ করতে তাঁরা নারাজ। নতুন ওষুধ প্রয়োগ করার সুযোগ ঘটে শুধুমাত্র সেইসব রোগীর ক্ষেত্রে, যাদের চিকিৎসায় প্রচলিত সকল ওষুধ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে—যাদের বাঁচার কোনো আশা নেই—মৃত্যু যাদের অবধারিত।

ভাগ্যক্রমে এমনি এক সুযোগ কয়েকদিনের মধ্যেই পাওয়া গেল। ৪৩ বছর বয়স্ক অক্সফোর্ডের এক পুলিশ দাড়ি কামাতে গিয়ে তার গাল কেটে ফেলেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে তার এই ক্ষত দূষিত হলো—গাল মুখ সব ফুলে উঠলো। র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালে তার চিকিৎসা শুরু হলো—কিন্তু রোগ ক্রমাগত বেড়েই চললো। ক্ষতস্থান দিয়ে যে স্ট্যাফাইলোকক্কাস ও স্ট্রেপটোকক্কাস জীবাণু প্রবেশ করেছিল তাদের যুগল আক্রমণে মারাত্মক সেপ্টেমিয়া সৃষ্টি করলো—সারা দেহে ফোড়া—ফুসফুস দুর্বল—দেহের তাপ ১০৫ ডিগ্রী। সব সালফা ওষুধ ব্যর্থ প্রমাণিত হলো—রোগীর মৃত্যু আসন্ন ও অবধারিত হয়ে উঠলো।

খবর পেয়ে ফ্লোরি ছুটে গেলেন হাসপাতালে। হাসপাতালের প্রধান ডাক্তার ফ্লেচার রোগীকে পরীক্ষা করলেন। শরীর একেবারে জীর্ণশীর্ণ—অসহ্য যন্ত্রণায় সারাক্ষণ কাতরাচ্ছে—কফের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে পুঁজ।

রোগী দেখে ডাঃ ফ্লেচার ফ্লোরিকে বললেন—"এ রোগী তো একেবারে মরমর।" অন্যান্য ডাক্তাররাও তা স্বীকার করলেন—বললেন—"হ্যাঁ, এর বাঁচা বারো, বড় জোর চব্বিশ ঘণ্টা।"

ফ্লেমিং তবু আশা ছাড়লেন না—পেনিসিলিন দিতে চাইলেন। ঠিক হলো—ডাঃ ফ্লেচার প্রথম ইঞ্জেকশনটি দেবেন। ফ্লেচার ২০০ মিলিগ্রাম পেনিসিলিন পানিতে গুলে—সিরিঞ্জে ভরে—মৃতপ্রায় পুলিশটির হাতে ইঞ্জেকশন দিলেন। পরের বার ১০০ মিলিগ্রাম এবং এভাবে প্রতি তিন ঘণ্টা পরপর ইঞ্জেকশন দেয়া চলতে থাকলো। দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী—যে দিনটিতে এক রুগ্ন মানুষের দেহে ঘটলো পেনিসিলিনের প্রথম অনুপ্রবেশ—চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সংযুক্ত হলো আর একটি স্মরণীয় দিন!

এর পরের ঘটনা বেশ নাটকীয়। বারো ঘণ্টা পরেও পুলিশটির মৃত্যু হলো না। পরের দিন একজন নার্স রোগীর অবস্থা দেখে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—চার্টে লিখে রাখলেন—"চমৎকার উন্নতি!" রোগী শুধু বেঁচে ছিল না - তার জ্বর কিছুটা কমেছে—ব্যথা প্রায় নেই—ফুসফুস অনেক পরিষ্কার—রক্ত পরীক্ষায় দেখা গেল "ব্লাড কাউন্ট" বেড়ে গেছে। তৃতীয় দিনে গালের ফোলা কমতে লাগলো। পরের দিন জ্বর প্রায় নেই—ফোড়ার অবস্থা ভালোর দিকে—রোগী বেশ ভাল বোধ করতে লাগলো—এমনকি ক্ষুধার্ত হয়ে ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া শুরু করলো। পঞ্চম দিনে রোগীর অবস্থা এতটাই ভাল হয়ে উঠলো যে—আর সপ্তাহ খানিকের মধ্যে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে বলে ডাক্তাররা বলাবলি করতে লাগলেন।

"আরও সপ্তাহ খানিক?"—আঁতকে উঠলেন ডাঃ ফ্লেচার এবং ডাঃ ফ্লোরি। যে সামান্য পেনিসিলিন তখন হাতে আছে তাতে তো সপ্তাহ খানিক চলবে না। ইতিমধ্যে ছত্রাক থেকে আরো কিছু পেনিসিলিন তৈরি করা সম্ভব নয়—সেটি বেশ সময় সাপেক্ষ। ততদিনে রোগীতো শেষ হয়ে যাবে! তাহলে উপায়?

উপায়ন্তর না দেখে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা তাই উন্মত্ত হয়ে প্রচেষ্টা চালালেন রোগীর প্রস্রাবের মধ্যে যেটুকু পেনিসিলিন বেরিয়ে আসে তার সবটুকু উদ্ধার করতে। রাত দিন পরিশ্রম করে রোগীর প্রস্রাব থেকে যেটুকু পেনিসিলিন পাওয়া যেতে লাগলো তাই আবার তার দেহে প্রয়োগ করে চিকিৎসা চলতে লাগলো। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই পেনিসিলিনের পরিমাণ পরিমিত ছিল না। রোগ পুনরায় মাথা চাড়া দিলো—আর কয়েকদিনের মধ্যেই পুলিশটি মারা গেল!

ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়ালো তা একাধারে দুঃখের এবং সাফল্যের। লোকটি যদিও বাঁচলো না—তবু বেশ বোঝা গেল—পেনিসিলিন কী আশ্চর্য জিনিস-কী অসীম তার ক্ষমতা। সেই সঙ্গে এও দেখা গেল—কয়েকদিন ধরে একটানা পেনিসিলিন প্রয়োগ করেও রোগীর দেহে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় না। পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে—এ ক্ষেত্রে ব্যর্থতার কারণ পেনিসিলিনের প্রযুক্ত মাত্রা এবং প্রয়োগ কাল দুই ছিল কম। পুলিশটির মৃত্যুর সূত্রে যে শিক্ষা লাভ হলো তা এই যে,—রোগীকে হারাতে না হলে যেমন বেশী মাত্রায় পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে হবে—তেমনি প্রয়োগের সময় সীমাও বাড়াতে হবে।

এ কথা যে কত সত্য তা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আবার প্রমাণিত হলো। অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে কিছু পেনিসিলিন তৈরি করলে—দ্বিতীয় এক রোগীর ওপর তা প্রয়োগ করা হলো। এবারের রোগী—১৫ বছরের এক যুবক—হাড় অপারেশনের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। প্রচুর রক্তক্ষরণ-তদুপরি সংক্রমণের কারণে সে খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। সালফা ওষুধ এ ক্ষেত্রেও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। খবর পেয়ে ফ্লোরি ফ্লেচারের হাতে তাঁদের সবটুকু মজুত পেনিসিলিন দিয়ে গেলেন। পাঁচ দিন পেনিসিলিন প্রয়োগের পর যুবক রোগীটির যথেষ্ট উন্নতি ঘটতে দেখা গেল। নিতম্বের দুটি বিশ্রী ঘা শুকাতে শুরু করেছে, জ্বর ছেড়ে গেছে—ফ্যাকাসে গালে রক্তের লালিমা দেখা দিয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য—এবারেও পেনিসিলিনের ঘাটতি ঘটলো—ফলে কয়েকদিনের মধ্যেই সংক্রমণ তীব্র হয়ে যুবকটি মারা গেল।

এই দুই ঘটনার পর পেনিসিলিন নিয়ে আর মাতামাতি করা ঠিক নয়—এই অভিমত অনেকে ব্যক্ত করতে লাগলেন। দু'বছরের বেশী সময় অতিবাহিত হয়েছে—অথচ পেনিসিলিন একটি রোগীকেও বাঁচাতে পারেনি। পেনিসিলিনকে যদিও এখন অনেকটা বিশুদ্ধ করা গেছে—ফ্লেমিং-এর কাছ থেকে সংগৃহীত ছত্রাকের চাষ করতে গিয়ে যদিও এমন একটি উপজাতি পাওয়া গেছে - যার পেনিসিলিন উৎপাদন ক্ষমতা কিছু বেশী—তবু ৫০ গ্যালন কালচার মাধ্যম থেকে কয়েকদিনের নিদারুণ পরিশ্রমের পর যতটা পেনিসিলিন পাওয়া যায়—তা দিয়ে কেবলমাত্র একটি রোগীর একদিনের চিকিৎসা চলতে পারে। কাজেই পেনিসিলিন নিয়ে গবেষণা কী নিছক পণ্ডশ্রম নয়? এটি শুধু যে মানুষের শ্রমের অপচয় তাই নয় – অপচয় সময় এবং অর্থের!

অবশ্য তখনকার অবস্থা অনুসারে এরূপ অভিব্যক্তি অমূলক ছিল না। পেনিসিলিনের প্রস্তুতি ছিল অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ। এটি প্রস্তুত করতে যেমন বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয় তেমনি ছত্রাক থেকে এটি উৎপন্ন হতে বেশ কিছু সময় লেগে যায়। প্রথমে দু'টি রোগীর চিকিৎসায় প্রত্যেক রোগীর জন্য প্রতিদিন খরচ পড়েছে এক হাজার ডলার। কয় জন রোগী এই ব্যয় ভার বহন করতে পারে? এই হিসাব দেখিয়ে তাই একজন বিশেষজ্ঞ লিখেছিলেন—"এই মুহূর্তে পেনিসিলিনের সঙ্গে অন্যান্য বীজবারকের তুলনাটা দাঁড়ায় রেডিয়ামের সঙ্গে অন্যান্য ধাতুর মত।" একজন বিজ্ঞ অধ্যাপক ছাত্রদের কাছে টিপ্পনি কাটতেও ছাড়লেন না, বললেন—"তোমাদের পেনিসিলিন সম্পর্কে জানা অবশ্যই প্রয়োজন। অপূর্ব পদার্থ! তাঁরা একে তৈরি করছেন "বেড প্যান" (bed pan)-এর মধ্যে আর বিশুদ্ধ করছেন অক্সফোর্ডের "পুলিশ ফোর্স"-এর মাধ্যমে।"

যাহোক, এমনি বিরূপ মনোভাব বিরাজ করা সত্ত্বেও অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীরা কিন্তু দমলেন না। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ভাগ্য একদিন সুপ্রসন্ন হবেই—সহজ এবং সস্তায় প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত করা যাবেই। কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য ফ্লোরি আরো কিছু দক্ষ লোক নিযুক্ত করলেন, ব্রিটিশ রিসার্চ কাউন্সিল এবং রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে আবেদন

করে আরো কিছু অর্থ সংগ্রহ করলেন—এমনকি ইম্পেরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডকে পেনিসিলিন তৈরি করে তাঁদের কাজে সাহায্য করার জন্য রাজি করালেন।

১৯৪১ সালের মে মাসের দিকে যখন বেশ কিছু পেনিসিলিন তাঁদের হাতে আসলো তখন কোনো রোগীর ওপর তা প্রয়োগ করার জন্য তাঁরা প্রস্তুত হলেন। এবার যে রোগী জুটলো—সে হলো ৪৮ বছরের এক শ্রমিক। শরীরে তার এক বিরাট কার্বঙ্কল—যা থেকে মারাত্মক স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণু তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। নাকে ও ফুস-ফুসে পচন ধরছে বগলের গ্ল্যাণ্ড ফুলে গেছে—জ্বর ক্রমাগত বাড়ছে। সাতদিন পেনিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করে ফ্লেচার তাকে সারিয়ে তুললেন। এতদিনের সাধ্য সাধনায় পরিশেষে পেনিসিলিনের সাহায্যে একটি মৃত-প্রায় মানুষকে বাঁচানো সম্ভব হলো—এক অসাধ্য সাধন করলো পেনি-সিলিন—শুরু হলো তার বিজয় অভিযান।

এর পরের রোগী ৪ বছরের এক বালক। হাসপাতালে যখন তাকে আনা হলো—তখন সে অর্ধচেতন—ঘাড় শক্ত, চোখ ফোলা—মেরুদণ্ডের মজ্জা স্ট্যাফাইলোকক্কাসে ভর্তি। পেনিসিলিন দিয়ে ৩ দিন চিকিৎসার পর তার অবস্থা ভালোর দিকে চললো। ৯ দিনের মধ্যেই সে সকলের সঙ্গে কথা বলতে এবং খেলনা নিয়ে খেলতে শুরু করলো। কিন্তু কোন্ দিকে কী যে হলো—হঠাৎ করে ১৮ দিনের মাথায় সে মারা গেল! পরে "পোষ্ট মর্টম" করে দেখা গেল যে পেনিসিলিন ঠিকই তার দেহের রোগ দমন করেছিল—মৃত্যু হয়েছে কোনো কারণে রক্তবাহ (blood vessel) ফেটে যাওয়ার জন্য।

এরপর পেনিসিলিন দিয়ে যে সব রোগীর চিকিৎসা চললো তাতে কেউ আর মরলো না। এক মহিলার চোখে ঘা' হয়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হতে যাচ্ছিল। ঘণ্টাখানিক পর পর কয়েক ফোঁটা করে পেনিসিলিন দ্রবণ তাঁর চোখে দেয়াতে ঘা সেরে গেল। ফলে অন্ধত্বের হাত থেকে মহিলাটি রক্ষা পেলেন—হয়ত তাঁর রক্ষা পেল জীবনও। একটি ৬ মাসের শিশুর বাঁচার সম্ভাবনা ছিল না—সালফা ঔষধ তার কিডনির সংক্রমণ প্রতিরোধ

করতে পারেনি। গায়ে জ্বর—বার বার বমি করছে—ঘন ঘন কেঁপে উঠছে খিঁচুনি দিয়ে। শিশুটিকে সারানো হলো পেনিসিলিনের সাহায্যে। একটি বালক মরতে বসেছিল তার রক্ত এবং হাড়ে স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর তীব্র আক্রমণের কারণে—সেও সেরে উঠলো পেনিসিলিনের চিকিৎসায়।

এমনিভাবে ১২টি রোগীর ওপর পেনিসিলিন প্রয়োগ করে যে ফলাফল পাওয়া গেল—ফ্লোরি এবং তাঁর সহকর্মীরা ১৯৪১ সালের ১৬ই আগস্ট এক ডাক্তারী পত্রিকায়—"ফার্দার অবজারভেশন অন পেনিসিলিন" এই শিরোনামে প্রকাশ করলেন। অন্যদিকে ফ্লেমিংও ফ্লোরির কাছ থেকে কিছু পেনিসিলিন চেয়ে নিয়ে মেনিনজাইটিসে আক্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী তাঁর এক বন্ধুকে বাঁচিয়ে তুললেন। ফ্লেমিং এ ক্ষেত্রে পেনি-সিলিন ইঞ্জেকশন মাংস পেশীতে না দিয়ে মেরুদণ্ডে দিয়েছিলেন—যাতে করে তা সরাসরি মস্তিষ্কের সক্রমিত স্থানে কাজে করতে পারে। মেরু-দণ্ডে পেনিসিলিনের এমনি প্রয়োগ এই প্রথম এবং তা বেশ কার্যকরী হতে দেখা গেল—মস্তিষ্কের মারাত্মক সংক্রমাণকেও দমন করা সম্ভব হলো।

প্রকাশিত এ সকল তথ্য থেকে চিকিৎসকেরা জানলেন—বেশ কিছু কঠিন রোগ সারাতে পেনিসিলিন এক আশ্চর্য ও অব্যর্থ ঔষধ। প্রচলিত সালফা ঔষধ যেখানে নিষ্ফল সেখানেও পেনিসিলিন সবিশেষ সক্রিয়।

পেনিসিলিনের এমনি সাফল্য আনন্দদায়ক সন্দেহ নেই—ফ্লোরিও বলেছিলেন—"বিজ্ঞানে সবচেয়ে শুভ এবং মহৎ যত আবিষ্কার হয়েছে পেনিসিলিনের আবিষ্কার তাদের অন্যতম।" —তবু কথা থেকে গেল—পেনিসিলিন কী সত্যিকারভাবে কোনো কাজে আসবে? চিকিৎসা ক্ষেত্রে তা কী ব্যবহার করা যাবে কখনও? পেনিসিলিন এক দুর্লভ বস্তু। একটি মাত্র রোগীর একদিনের চিকিৎসায় খরচ পড়ে এক হাজার ডলার। কয়জন রোগী এই ব্যয় ভার বহন করতে পারবে? ১২টি রোগীর ওপর পরীক্ষা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় পেনিসিলিন সংগ্রহ করতে অক্সফোর্ডের বিজ্ঞানীদের দু'বছরেরও বেশী সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে—খরচ হয়েছে কয়েক কোটি ডলার। অথচ সালফা ওষুধ তৈরি

হচ্ছে অতি অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে—ছু'এক গ্রাম নয়—লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডে। কাজেই পেনিসিলিনকে ব্যবহারের উপযোগী করে তুলতে হলে এর উৎপাদন যেমন ত্বরান্বিত করতে হবে তেমনি তা প্রস্তুত করতে হবে প্রচুর পরিমাণে—অল্প খরচে।

ফ্লোরি ও চেইন এজন্য প্রথমে দেশীয় সরকার ও শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন—কিন্তু পেলেন না। ইংল্যাণ্ড তখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে—তার সব কিছু সম্পদ ও শক্তি তখন যুদ্ধের কাজে নিয়োজিত। উপায়ান্তর না দেখে ফ্লোরি আমেরিকায় চেষ্টা করার মনস্থ করলেন। আমেরিকা তখনও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েনি - তাছাড়া আমেরিকা তখন রাসায়নিক শিল্পে অনেক উন্নতি লাভ করেছে—গবে-ষণার কাজে দেদার অর্থ ব্যয় করার মত সামর্থ্য তার আছে। ফ্লোরি রকফেলার ফাউণ্ডেশনের কাছে চিঠি লিখলেন। আমন্ত্রণ আসলো একজন সহকারীসহ আমেরিকা সফরের।

১৯৪১ সালের জুন মাসে কিছু পেনিসিলিন, কিছু ছত্রাকের অণুবীজ এবং সহকারী হিটলিকে সঙ্গে নিয়ে ফ্লোরি আমেরিকা গেলেন। সেখানে অনেকের সঙ্গে তাঁরা সাক্ষাৎ করলেন। সকলেই পেনিসিলিনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলেন—সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিলেন। কারণ, আমেরিকায় তখন যুদ্ধের একটা আবহাওয়া বিরাজ করছিল—তাই তাঁরা যেমন চিন্তা করছিলেন—নতুন কোনো মারণাস্ত্রের—তেমনি নতুন কোনো ওষুধের—যা যুদ্ধে আহত লোকের সাহায্যে আসবে।

ওয়াশিংটনে ফ্লোরি এবং হিটলি পেনিসিলিন সম্পর্কে তাঁদের সমস্যার কথা কৃষি বিভাগের কর্মকর্তাদেরকে জানালেন - দেখা করলেন ছত্রাক বিশেষজ্ঞ চার্লস থম-এর সঙ্গে, যিনি ফ্লেমিং-এর ছত্রাকটিকে শনাক্ত করেছিলেন। থম তাঁদেরকে পিউরিতে অবস্থিত আমেরিকার বিরাট কৃষি গবেষণাগারের ছত্রাক বিভাগের প্রধান বব কগহিল-এর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কগহিল ছিলেন আমেরিকার শ্রেষ্ঠ ফার্মেন্টেশন (fermen-tation) বা খমিরণ বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। কগহিলের সঙ্গে দেখা করার আগে তাঁরা নিউইয়র্কের রকফেলার ইনষ্টিটিউশনে রেনে ছ্যবোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ছ্যবোস তাঁদেরকে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও মেয়ো

ক্লিনিকের বিজ্ঞানীদের সাথে দেখা করতে বললেন। আমেরিকায় এই দুই প্রতিষ্ঠানের কিছু বিজ্ঞানী পেনিসিলিন নিয়ে কাজ করছিলেন। ফ্লোরি এবং হিটলি কলম্বিয়া যাবার আগে ডঃ কগহিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। পেনিসিলিন নোটেটাম তথা পেনিসিলিনের উৎপাদন কি করে বাড়ানো যায়—কগহিল তা দেখতে রাজি হলেন এবং হিটলিকে তাঁর এ কাজে সাহায্যের জন্য থাকতে বললেন। ফ্লোরি আমেরিকায় আসার সময় ছত্রাকের যে অণুবীজ সঙ্গে এনেছিলেন তা কগহিলের হাতে দিয়ে এবং হিটলিকে তাঁর কাছে রেখে চলে আসলেন কলম্বিয়ায়। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় ও মেয়ো ক্লিনিকের বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরস্পরের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করলেন। আলোচনা শেষে অক্সফোর্ড থেকে যেটুকু পেনিসিলিন সঙ্গে এনেছিলেন তা বিজ্ঞানীদেরকে উপহার দিলেন। বিজ্ঞানীরা তাঁর এই উপহারে খুবই আনন্দ ও উৎসাহ বোধ করলেন।

বস্তুত ফ্লোরি যেখানেই গিয়েছিলেন, সেখানেই তিনি সকলের মনে পেনিসিলিনের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। সর্বোপরি পেনিসিলিন যে একটি আশ্চর্য কার্যকরী ঔষধ সে সম্পর্কে তিনি নবগঠিত "কমিটি ফর মেডিক্যাল রিসার্চ"-এর চেয়ারম্যান ডাঃ এ. এম. রিচার্ডের মনে এমন প্রত্যয় জন্মাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা যখন বিশ্ব যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে—তখন পেনিসিলিন যুদ্ধের এক অগ্রাধিকার দ্রব্য হিসাবে পরিগণিত হয় এবং কৃষি বিভাগ ও ওষুধ তৈরির কয়েকটি কারখানা প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুতির কাজে সর্বশক্তি নিয়োজিত করে।

যাহোক, পিউরিতে একটি কারখানা পেনিসিলিনের যে প্রথম ব্যাচ তৈরি করে তার পরিমাণ ছিল খুবই সামান্য—খরচও পড়ে অনেক। এর কারণ ছত্রাকটি কেবল মাত্র ছোট ছোট পাত্রে জন্মাতে পারে—আর যে পোষক মাধ্যমে তারা পুষ্ট হয় তা ছিল বেশী দামী। তাছাড়া ছত্রাকের পেনিসিলিন উৎপন্ন করার ব্যাপারটিও বেশ সময়সাপেক্ষ এবং তাদের পরিবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় বাতাস। কাজেই পুরোপুরি পোষক

মাধ্যমের মধ্যে তারা জন্মাতে পারে না—কেবলমাত্র পাত্রের উপরিতলেই জন্মায়। এজন্য প্রয়োজন অনেকগুলি পাত্রের—আর এমনিভাবে কয়েক শত ফ্লাস্ক বা দুধের বোতলে যে পরিমাণ ছত্রাক জন্মে, যতটুকু পেনি-সিলিন উৎপন্ন করে—তা একটি রোগীর একদিনের চিকিৎসার জন্যও যথেষ্ট নয়। কাজেই প্রয়োজন আরো কার্যকর পদ্ধতির উদ্ভাবন।

সৌভাগ্যক্রমে ১৯৪২ সালের শেষের দিকে গবেষণা-লব্ধ কয়েকটি ফলাফল প্রচুর পেনিসিলিন প্রস্তুতির পথ করে দিল। প্রথমত ছত্রাকটির জন্য একটি সহজলভ্য এবং সস্তা পুষ্টিকর খাদ্যের আবিষ্কার। ডঃ কগহিলের খমিরণ বিভাগের ল্যাবরেটরিতে ডঃ এন্‌ড্রু মোয়ের এ বিষয়ে কাজ করছিলেন। একদিন তিনি দেখলেন, কর্ন (corn) বা ভুট্টা থেকে শ্বেতসার (starch) প্রস্তুত কালে "কর্ন ষ্টিপ লিকার" (corn steap liquor) নামে যে উপজাত দ্রব্য (by product) পাওয়া যায় ছত্রাকটির চাষের জন্য তা ব্যবহার করলে সেটি যেমন ভাল গজায় তেমনি তা দশ গুণ বেশী পেনিসিলিন উৎপন্ন করে। এই কর্ন স্টিপ লিকার তখন কোনো কাজে ব্যবহৃত হত না—ফেলে দেয়া হতো। তাই এটিকে কোনো কাজে লাগানোর জন্য ডঃ কগহিলের খমিরণ বিভাগে গবেষণা চলছিল। আরো দেখা গেল—এই লিকারে যদি দুগ্ধজাত শর্করা "ল্যাক্‌টোজ" (lactose) মেশানো যায় তবে পেনিসিলিনের উৎপাদন বিশ গুণ বেড়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, অধিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা সাহায্য করলো তা হলো,—একটি নতুন উপ-প্রজাতির আবিষ্কার ও তার উন্নতি সাধন। এটি করলেন ডঃ কগহিলের খমিরণ বিভাগের ডঃ রাপার। ডঃ কগহিলের অনুরোধে বিমানবাহিনীর লোকেরা বিভিন্ন স্থানের মাটি সংগ্রহ করে তাঁর কাছে পাঠাতেন আর ডঃ রাপার সেই মাটিতে অধিক পেনিসিলিন উৎপাদক ছত্রাকের খোঁজ করতেন। ল্যাবরেটরির মেয়েদেরকেও বাজার থেকে নানা ছাতাপড়া ফলমুল সংগ্রহের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। মেয়েরা ছাতাপড়া ফলমূল সংগ্রহের কাজে এমন ব্যাপক অভিযান শুরু করলো যে—মেরী নামে একটি মেয়ে মোল্‌ডী মেরী (Moldy Mary) নামে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত মাটি থেকে নয়,

— মোল্‌ডী মেরী বাজার থেকে একদিন যে একটি ছাতাপড়া খরমুজা (cantaloupe) সংগ্রহ করে আনলো সেটিতেই খুঁজে পাওয়া গেল এমন
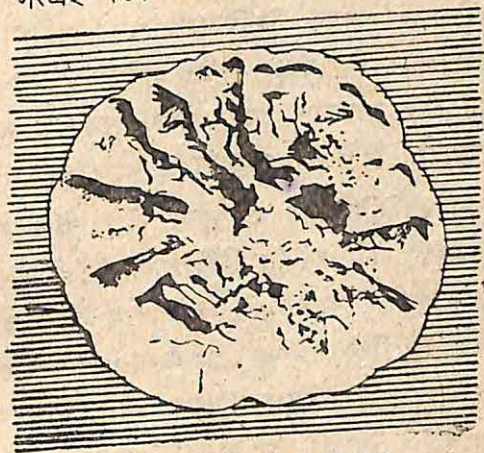
পেনিসিলিয়াম ক্রাইসোজেনাম

একটি ছত্রাক যা পেনিসিলিয়াম নোটেটামের চেয়ে ২০০ গুণ বেশী পেনিসিলিন উৎপন্ন করতে পারে। ছত্রাকটির নাম পেনিসিলিয়াম ক্রাই-সোজেনাম ( Penicillium chrysogenum )। আজকাল বেশীর ভাগ পেনিসিলিন মেরীর সংগৃহীত ঐ ছত্রাকটির বংশধর থেকে তৈরি হয়ে থাকে। পরে বিজ্ঞানীরা এই ছত্রাকটির একটি উন্নততর সংস্করণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ছত্রাকটি পোষক মাধ্যমের কেবল উপরি-তলেই জন্মায় না — মাধ্যমের মধ্যেও জন্মায়। কাজেই বড় বড় চৌবাচ্চার মধ্যে বাতাসের প্রবাহ চালিয়ে এর চাষ করে অনেক বেশী পরিমাণ ছত্রাক তথা পেনিসিলিন প্রস্তুত করার আরো সুযোগ ঘটলো। প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন প্রস্তুতির সমস্যা যখন এভাবে অল্প সময়ের মধ্যে সমাধান হয়ে গেল—তখন উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় তার ব্যাপক পরীক্ষা নিরীক্ষাও চলতে থাকলো।

ফ্লোরির সুযোগ্য সহধর্মিণী ডাঃ ইথেল ফ্লোরি স্বামীর সাহায্যে এগিয়ে এসে হাসপাতালের রোগীদের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে এক বছরের মধ্যে ১৮৭টি কঠিন কঠিন রোগ সারিয়ে এক বিরাট "কেস রিপোর্ট" তৈরি করলেন। অন্যান্য ব্রিটিশ ডাক্তাররাও বহু রোগীর চিকিৎসায় পেনিসিলিন

ব্যবহার করে তাঁদের সাফল্যের কথা প্রচার করলেন। মিলিটারী ডাক্তার-দের কাছ থেকেও ঘোষিত হলো পেনিসিলিনের নানা সাফল্য। ফ্লোরি নিজেও আলজেরিয়াতে আহত সৈনিকদের ওপর পরীক্ষা চালালেন। এ সমস্ত সৈনিকদের গায়ে ছিল জ্বর,—ধুলো—বালিতে উন্মুক্ত ছিল তাদের দেহের ক্ষত—আর সেই সব ক্ষতে এসে বসতো শত শত মাছি। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতেও পেনিসিলিনের পারদর্শিতা অক্ষুণ্ণ থাকলো।

১৯৪১ সালে পেনিসিলিনের উৎপাদন ছিল অতি সামান্য—এক চামচের মত—যা একটি মাত্র রোগীর চিকিৎসার জন্যও যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে এই পরিমাণ এতটা বেড়ে গেল যে, তা দিয়ে ৪০০টি রোগীর চিকিৎসা করা সম্ভব হলো। তারপর পেনিসিলিনের উৎপাদন ক্রমাগত এত দ্রুত বাড়তে থাকলো যে, ১৯৪৬ সালে কেবল মাত্র আমেরিকাতেই ৫ কোটি রোগীর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় পেনিসিলিন উৎপন্ন হলো। অধিক পরিমাণ পেনিসিলিন উৎপাদনের যে সমস্যা ছিল বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরে তা সমাধান হওয়ায় পেনিসিলিন সহজলভ্য ও স্বল্প মূল্যের সামগ্রী হয়ে দাঁড়ালো। ১৯৪৩ সালে এক ডোজ পেনিসিলিনের দাম ছিল যেখানে ২০ ডলার—সেখানে ১৯৫০ সালে তার দাম নেমে এলো মাত্র ৪ সেন্টে।

প্রথম দিকে পেনিসিলিনের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য তার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল। ডাঃ কেফারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল কোন্ রোগীকে পেনিসিলিন দেয়া হবে তা নির্বাচন করার জন্য। যে-সকল ক্ষেত্রে পেনিসিলিনের ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে আসবে—কেবলমাত্র সে-সকল ক্ষেত্রেই তিনি পেনিসিলিন প্রয়োগের অনুমতি দিতেন। অনেকের —এমন কি বন্ধু-বান্ধবদের অনেক অনুরোধ তিনি নির্মমভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু পরে যখন পেনিসিলিন সহজলভ্য হলো তখন এই নিয়ন্ত্রণ উঠে গেল।

যাহোক, উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে যে-সকল পরীক্ষা সাধিত হলো তাদের মধ্যে উল্লেখ্য আরো কয়েকটির কথায় আসা যাক্। ১৯৪৩ সালের আগস্ট মাসে বোস্টনের ডাঃ কেফার এক প্রতিবেদন

প্রকাশ করেন। এতে ছিল ২২টি আমেরিকান দলের ৫০০টি রোগীর ওপর পেনিসিলিনের পরীক্ষা এবং খুব কাছে থেকে সব কিছু পর্যবেক্ষণের ফলাফল। এ থেকে জানা গেল যে—৩৬৬টি রোগী ভাল হয়েছে বা তাদের অবস্থার উন্নতি হয়েছে; ৪০টি রোগীর ক্ষেত্রে কোনো উপকার পাওয়া যায়নি,—৯৪টি রোগীর ঘটেছে মৃত্যু। ঐ আগস্ট মাসেই ব্রুকলিনের "জুইস হসপিটাল"-এর ডাঃ লেইভ ও তাঁর সহকারীরা সর্বপ্রথম সব চেয়ে মারাত্মক রোগের মধ্যে অন্যতম হৃৎপিণ্ডের ভালভের সক্রমণ ( Subacute bacterial endocarditis ) জনিত রোগে পেনিসিলিন প্রয়োগ করে সফল হলেন। এই রোগে মৃত্যুর হার যেখানে শতকরা ৯৭ ভাগ, সেখানে তা শতকরা ২০ ভাগে তাঁরা নামিয়ে আনলেন। অন্যদিকে আবার এ সময়ে আমেরিকান ডাক্তাররা গণোরিয়া রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পেলেন। কোনো কোনো রোগী মাত্র ৪৫ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো। কুৎসিৎ আর একটি যৌন ব্যাধি সিফিলিসের বিরুদ্ধেও সাফল্যের সংবাদ দিলেন স্টাটন দ্বীপে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের "পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিজ"-এর ডাঃ জন ম্যাহোলী ও তাঁর সহকর্মি বৃন্দ।

এমনিভাবে পেনিসিলিনের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসায় তার ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে শুধু যে কোন্ কোন্ রোগের ক্ষেত্রে পেনিসিলিন ফলপ্রদ তা জানা গেল তাই নয়, কোন্ রোগের চিকিৎসায় কিভাবে, কতটা পরিমাণ এবং কতদিন পেনিসিলিন প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হলো। বস্তুত পেনিসিলিন নিয়ে যত বিজ্ঞানী গবেষণা করেছেন —যত ডাক্তার রোগীর ওপর পরীক্ষা চালিয়েছেন—প্রস্তুতি পর্বে যত টাকা খরচ হয়েছে, যতটা বিরাট আয়োজন করা হয়েছে,—ঝুঁকি নেয়া হয়েছে—ইতিপূর্বে কোনো ঔষধের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। বাজারে প্রথম ডোজ ছাড়ার আগে প্রাইভেট কোম্পানিগুলিকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার এবং আমেরিকান সরকারকে ৩০ লক্ষ ডলার খরচ করতে হয়েছিল।

অবশ্য এর ফল পরিণামে শুভই হয়েই দাঁড়িয়েছিল। পেনিসিলিনের দৌলতে যেমন বহু রোগ দমন করা সম্ভব হয়েছে তেমনি তা সূচিত করেছে কেমোথেরাপির এক নতুন দিগন্ত;—মাটির বুকে, অণুজীবের মাঝে আরো কার্যকরী, আরো বহু রোগ দমনের উপযোগী অ্যান্টিবায়োটিক সন্ধানের কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে বহু বিজ্ঞানীকে।

যে-সকল রোগে পেনিসিলিন আশ্চর্য ফলপ্রদ প্রমাণিত হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: নানা জাতের ফোঁড়া, পোড়া ঘা, রক্ত দুষ্টি, টনসিল ও মাষ্টায়েড গ্রন্থি প্রদাহ, নিউমোনিয়া, মেনিনজাইটিস, স্কার্লেট ও সূতিকা জ্বর, ডিপথেরিয়া, অ্যানথ্রাক্স, গ্যাস গ্যাংগ্রিন, সিফিলিস, গনোরিয়া, অস্টিওমায়েলাইটিস নামক কঠিন অস্থি বিকৃতি প্রভৃতি। কিন্তু ম্যালেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম জ্বর, পীত জ্বর, টাইফয়েড, অ্যামিবিক আমাশয়, কলেরা, প্লেগ, সর্দি-কাসি, শিশু পক্ষাঘাত, যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, স্লিপিং সিকনেস বা কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি রোগে পেনিসিলিন ফলদায়ক নয়।

পেনিসিলিনের পথ ধরে পরে অবশ্য আরো অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে—যেগুলি কয়েকটি রোগ, যাদেরকে পেনিসিলিন সারাতে পারে না—তাদেরকে সারাতে পারে, তবে বলা প্রয়োজন যে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অন্য সবকটি অ্যান্টিবায়োটিকের বিষক্রিয়া বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া পেনিসিলিনের চেয়ে বেশী। পেনিসিলিনের বিষক্রিয়া নেই বললেই চলে,—এমন কি অধিক পরিমাণে পেনিসিলিন প্রয়োগ করলেও (সামান্য সংখ্যক লোক যারা পেনিসিলিনের প্রতি অ্যালার্জিক তারা বাদে) কোনো কুফল ফলে না। অবশ্য বেশী পরিমাণে ব্যবহার করলে কোনো কোনো রোগজীবাণু পেনিসিলিনের প্রতি প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে পারে —যাদেরকে পরে পেনিসিলিন আর কাবু করতে পারে না। সে ক্ষেত্রে অন্য অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে দরকার হয়। পেনিসিলিনের সবচেয়ে বড় অবদান—পেনিসিলিন দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় যত লোক বাঁচিয়েছে তার তুলনা হয় না। এবং আজ আরো অনেক কার্যকরী অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হওয়া সত্ত্বেও পেনিসিলিন যে-সকল রোগ সারাতে পারে সে-সব ক্ষেত্রে পেনিসিলিনকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়—তার বিষক্রিয়া প্রায় না থাকার জন্য।

যাহোক, পেনিসিলিন বিংশ শতাব্দীর চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অমূল্য অবদান—এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। একদল বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টা কিভাবে একজন গবেষকের আবিষ্কারকে পূর্ণতা এনে দিয়েছিল—সার্থক করে তুলেছিল মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত করে, পেনিসিলিন তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর এ দৃষ্টান্তই অনুসৃত হয়ে চলেছে আজকাল, কোনো সফল আবিষ্কারের কাজে। আজ আর কোন বড় আবিষ্কার একক কোনো বিজ্ঞানীর ধারা সম্ভব নয়—বিভিন্ন শাখার বিজ্ঞানীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সূত্রেই শুধু তা সম্ভবপর হতে পারছে।

পেনিসিলিনকে যদিও কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লেষিত ( synthesize ) করা গেছে কিন্তু তার প্রস্তুতি খরচ প্রাকৃতিক উপায়ে ছত্রাক থেকে তৈরির চেয়ে অনেক বেশী পড়ে বলে আজও পেনিসিলিয়াম নোটেটান বা ক্রাইসোজাইম চাষ করে পেনিসিলিন প্রস্তুত করা হয়। অবশ্য আজকাল-পেনিসিলিনের নানা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আরো কার্যকরী, আরো উপযোগী করে তোলা হয়েছে। এগুলি বাজারে অ্যামপিসিলিন, মেথিসিলিন, ফ্লক্সালিন প্রভৃতি নামে পরিচিত। এদের মধ্যে কোনোটি আরো অধিক রোগ সারাতে সক্ষম। পেনিসিলিন পাকস্থলীর জারক রসে নষ্ট হয় বলে খেলে উপকার হয় না—কিন্তু এদের মধ্যে কোনটি যেমন, অ্যামপিসিলিন খেলেও উপকার হয়। কোনটি পেনিসিলিন প্রতিরোধী জীবাণুকেও ধ্বংস করতে পারে। আগে তিন ঘণ্টা পর পর পেনিসিলিনের ইন্‌জেকশন নিতে হতো কিন্তু এখন এমন পেনিসিলিন পাওয়া যায় যা ২৪ ঘণ্টা পর পর ইন্‌জেকশন দিলে কাজ চলে।

বর্তমানে পেনিসিলিন উৎপাদন এক বিরাট ব্যবসায়। কিন্তু ডাঃ ফ্লেমিং বৈষয়িক কোনো লাভের প্রত্যাশী ছিলেন না। তাই ডায়াবেটিক রোগের চিকিৎসায় ইনসুলিন ব্যবহারের আবিষ্কারক ব্যান্টিং-এর মত তিনিও তাঁর আবিষ্কারের জন্য কোনো পেটেন্ট বা অর্থ গ্রহণ করেন নি। অবশ্য প্রতিদানে যা পেয়েছিলেন তার মূল্য অর্থের চেয়ে অনেক বেশী। অজস্র রোগমুক্ত মানুষের আন্তরিক আশীর্বাদ—অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা তিনি লাভ করেছিলেন। দেশ ও বিদেশের বহু সম্মানে তিনি

ভূষিত হয়েছিলেন। প্রিন্সটন ও প্যানসেলভিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডি. এস-সি' ডিগ্রি প্রদান করেন। মার্কিন ভ্যারাইটি ক্লাব থেকে ১৯৪৪ সালে তাঁকে 'হিম্যানিটেরিয়ান অ্যাওয়ার্ড' দান করা হয়। ১৯৪৪ সালে তিনি ও ফ্লোরি 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন। ফ্লেমিং এ উপাধি পেয়েছিলেন পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য—আর ফ্লোরি পেনিসিলিনকে আশ্চর্য ঔষধ হিসাবে পরিচিত করার জন্য। পরের বছর ১৯৪৫ সালে, ফ্লেমিং, ফ্লোরি ও চেইনের সঙ্গে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এমনি প্রভূত সম্মানের অধিকারী হয়ে ১৯৫৫ সালে ৭৪ বছর বয়সে ফ্লেমিং হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। ফ্লেমিং-এর সৌভাগ্য যে পেনিসিলিন সম্পর্কে তিনি যে ধারণা বা আশা এক সময়ে পোষণ করতেন, তাঁর জীবনেই তিনি তা বাস্তবে পরিণত হতে দেখেছিলেন। বেঁচে থাকতেই দেখেছিলেন নিজের দেশে পেনিসিলিন তৈরির বিরাট কারখানা প্রতিষ্ঠিত হতে। তাই যিনি কোনদিন অতিশয়োক্তির আশ্রয় গ্রহণ করেননি—সেই ফ্লেমিং পেনিসিলিনের আশ্চর্য আরোগ্য ক্ষমতা দেখে অভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন—"লোকে একে এক অলৌকিক জিনিস বলে অভিহিত করছে। বিজ্ঞানী হিসেবে জীবনে এই প্রথম আমি তা স্বীকার করছি। এর দ্বারা হাজার হাজার জীবন রক্ষা পাবে।"

ফ্লেমিং-এর এ কথা যেমন অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে—তেমনি তাঁর আর একটি উক্তিও অচিরে বাস্তবে পরিণত হয়েছিল! তাঁকে নোবেল পুরস্কার দেয়ার সময় বলা হয়েছিল—"এই পুরস্কার দেয়া হলো এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য...।" ফ্লেমিং সে কথা মেনে নিতে পারেননি, বলেছিলেন—"যে কাজের কথা সম্পন্ন হয়েছে বলে বলা হয়েছে—সে কাজ সবে মাত্র শুরু হয়েছে। হাজার হাজার আণুবীক্ষণিক জীব রয়েছে যারা নিত্য তৈরি করছে নানা জটিল জিনিস। এটাই সত্যি আশ্চর্যের ব্যাপার হবে যদি প্রথমটিই সেরা থেকে যায়...।"

সত্যই পেনিসিলিনের পথ ধরে এমন সব অ্যান্টিবায়োটিক পরে আবিষ্কৃত হয়—যেগুলি পেনিসিলিন যেখানে পঙ্গু সেখানেও ফলপ্রদ—আশ্চর্য কার্যকরী।

সত্য বটে, পেনিসিলিন একটি আকস্মিক আবিষ্কার—কিন্তু এই আকস্মিক আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার মত একটি প্রস্তুত মানস ফ্লেমিং-এর ছিল বলেই পেনিসিলিন এক আশ্চর্য ও অব্যর্থ ঔষধ হিসাবে পরিগণিত হতে পেরেছে, —তা না হলে—পেনিসিলিন কোনদিন আবিষ্কৃত হতো কিনা সন্দেহ।

# স্ট্রেপ্টোমাইসিন ও তার আবিষ্কার
(ডঃ ডু্য বোস ও ডঃ ওয়াকস্ম্যান)

সকল প্রকার রোগ আরোগ্য করতে সক্ষম এমন একটি অব্যর্থ ঔষধ আবিষ্কার যা ছিল আধুনিক কেমোথেরাপির জনক,—আর্লিকের আজীবন স্বপ্ন—সেই 'ম্যাজিক বুলেট' আবিষ্কারে বিজ্ঞানীরা আজও ব্যর্থ হলেও—বহু কঠিন রোগের চিকিৎসায় পেনিসিলিনের আশ্চর্য সাফল্য সে স্বপ্নকে যেমন অনেকটাই বাস্তবায়িত করে তুললো—তেমনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা আনলো এক যুগান্তর। এক নতুন জগৎ—এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো।

নোবেল পুরস্কার গ্রহণ কালে ফ্লেমিং বলেছিলেন—মাটির বুকে বস-বাস করছে পেনিসিলিয়াম নোটেটামের মত আরো কত ছত্রাক, লক্ষ লক্ষ জীবাণু—আর তারা তৈরি করছে পেনিসিলিনের মত অসংখ্য জটিল পদার্থ—এদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত পেনিসিলিনের শ্রেষ্ঠত্ব যদি বজায় থাকে তবে তাই হবে সবচেয়ে বিস্ময়কর। ফ্লেমিং-এর এ ইঙ্গিত, বহু দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে পেনিসিলিনের বিস্ময়কর বিজয়—বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনলো মাটির দিকে—পৃথিবীর মাটিই হয়ে দাঁড়ালো বিজ্ঞানীদের এক বিস্তৃত গবেষণার ক্ষেত্র। মাটির বুকে জন্মানো কেবলমাত্র ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদই নয়—মাটিতে বসবাসকারী নানা জীবাণুর মধ্যে পেনিসিলিনের চেয়ে আরো সুষ্ঠু, আরো শক্তিশালী, আরো অধিক রোগে সক্রিয় অমোঘ ঔষধের সন্ধানে শুরু হলো এক ব্যাপক অভিযান! মাটির সন্তান মাটির বুকেই খুঁজে ফিরলো তাদের রোগমুক্তির উপাদান—ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য যতেক ব্রহ্মাস্ত্র! ফলে ফ্লেমিং-এর ভবিষ্যৎ বাণীই হলো ঠিক,—অচিরেই আবিষ্কৃত হলো আরো অনেক অনন্যসাধারণ অ্যান্টি-

বায়োটিক যাদের মধ্যে 'স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন' ( Streptomycin )-এর আবিষ্কার পেনিসিলিনের চেয়েও অধিক সাড়া জাগালো বিজ্ঞান মহলে, এমন কি জনসাধারণের মধ্যেও। কিন্তু কেন? সে কথা পরে বলছি।

পেনিসিলিন আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয় একথা আগে বলেছি—আরো বলেছি পেনিসিলিনের পথ ধরে আরো অনেক আশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু এ সকল ঔষধ কোনটাই আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয় নাই—আবিষ্কৃত হয় একান্ত সুচিন্তিত এবং পরিকল্পিত অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে—আর এই অনুসন্ধানের কাজে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন—স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনসহ আরো কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন—বহু বিজ্ঞানীকে উদ্বুদ্ধ করেন ব্যাপক অনুসন্ধানের কাজে, তিনি হলেন রুশ-আমেরিকান জীবাণু তত্ত্ববিদ সেলম্যান অ্যাব্রাহাম ওয়াক্সম্যান ( Selman Abraham Waksman )।

সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান

ওয়াক্সম্যান ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে ২রা জুলাই রাশিয়ার প্রিলুকি নামক গ্রামে এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জাকব-এর

তামার জাল তৈরি করার এক ছোট খাটো কারখানা ছিল। সারা সময় কাজে ব্যতিব্যস্ত থেকেও তাঁর রোজগারে সচ্ছলভাবে সংসার চলতো না। তাই ওয়াক্সম্যানের মা নিজেও কিছু রোজগার করে সংসার চালাতেন। তাছাড়া স্বামীর কর্মব্যস্ততার জন্য - ছেলেমেয়েদের সবদিক দেখাশোনার ভার পড়েছিল তাঁরই হাতে। কাজেই ওয়াক্সম্যান ছেলেবেলায় যেটুকু শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর যত্ন পেয়েছিলেন তা সবই তাঁর মায়ের কাছ থেকে। জারশাসিত রাশিয়ায় ইহুদী ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা লাভের ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওয়াক্সম্যান ওডেসিয়ার এক জিমনাসিয়াম থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেছিলেন। কিশোর বয়সে পারিবারিক এক অপমৃত্যু তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। চোখের সামনে আপন এক বোনকে ডিপথেরিয়ায় মরতে দেখে তিনি শপথ করেছিলেন ভবিষ্যতে ডাক্তার হয়ে ডিপথেরিয়া এবং তার মত মারাত্মক সব রোগের ঔষধ তিনি আবিষ্কার করবেন। তাই পারিবারিক অবস্থা একটু ভালোর দিকে গেলে— যখন তাঁর পিতা তাঁকে শিল্প-রসায়ন বিষয়ে পড়তে বললেন – তখন তিনি তা না শুনে—ডাক্তারী পড়তে চলে আসলেন আমেরিকায় – ১৯১০ সালে। দেশ ছাড়ার কারণ হলো, ঐ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যু। যে মা তাঁর ছিল সবচেয়ে প্রিয়,—সবচেয়ে বড় আকর্ষণ—সেই মায়ের যখন মৃত্যু হলো তখন দেশের মায়াও তাঁকে আর বেঁধে রাখতে পারলো না – বিদেশে পাড়ি দিলেন এবং আমেরিকাকেই নির্বাচন করলেন—কেননা তাঁর কিছু জ্ঞাতি ভাই আগেই সেখানে চলে এসেছিলেন।

আমেরিকায় প্রথমে ফিলাডেলফিয়া এবং পরে নিউজার্সিতে তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের এক বিরাট খামার বাড়ীতে আশ্রয় নিলেন। খামার থেকে কয়েক মাইল দূরেই ছিল নিউব্রান্সউইক ও রুজার্স কলেজ। কিন্তু সে বছরেই তিনি কলেজে ভর্তি হতে পারলেন না। কেননা, তিনি যখন সেখানে পৌছেন তখন ভর্তির সময় পেরিয়ে গেছে। সময় নষ্ট না করে তিনি তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের খামারে কাজ করতে লাগলেন। খামারের গাই দোহানো, শস্যক্ষেত নিড়ানো, হাঁস-মুরগীকে খাওয়ানো ইত্যাদি কাজ করেন—আর খামারের ছেলেমেয়েদের কাছে ইংরেজী শেখেন।

আরো যা শিখলেন—তা হলো নানা জাতের বীজের মধ্যে পার্থক্য কোথায়, কোন্‌টি কখন বুনতে হয়,—কিভাবে সার তৈরি করতে হয় এবং কখন তা প্রয়োগ করতে হয়,—যেগুলি তাঁর পরবর্তী জীবনে খুবই কাজে এসেছিল। কিন্তু তখনকার মত যা ঘটলো, তা হলো,—তাঁর মানসিকতার বিরাট পরিবর্তন। ঢেউ খেলানো শস্য ক্ষেতের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক সময় তিনি গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে যান। ভাবতে থাকেন,—একদিন যে মাটির বুক ছিল রিক্ত, শূন্য—কেমন করে তাই আবার এক দিন শস্য-শ্যামল, প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে—শস্য দানায় ভরপুর হয়ে ওঠে তাদের শীর্ষদেশ? কেমন করে মাটি থেকে জন্ম নেয় এই উদ্ভিদ—ঘটে তাদের উদ্ভব? ভাবতে ভাবতে এক সময়ে তিনি ভুলে যান তাঁর শৈশবের শপথের কথা। মাটির বুকে কোন্‌ রহস্য লুকিয়ে আছে যার জন্য জন্মে এই উদ্ভিদ—তাই জানার জন্য তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এতে আরো ইন্ধন যোগালেন রুজার্সের কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জ্যকব লিপম্যান। তাঁর সাথে ওয়াক্সম্যানের পরিচয় ঘটে—তাঁর জ্ঞাতি ভাইদের সূত্রে। ডঃ লিপম্যানও ছিলেন একজন দেশত্যাগী রাশিয়ান। মাটি ও গাছপালা নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা চলে। এদের প্রতি ওয়াক্সম্যানের বিশেষ আগ্রহ দেখে লিপম্যান তাঁকে কৃষি কলেজে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিয়ে বললেন—"ডাক্তারী স্কুলের চেয়ে মাইক্রোবায়োলজি সম্পর্কে সেখানে আরো বেশী জানতে পারবেন।" কাজেই যেটুকু দ্বিধা ছিল তাও দূর হলো—ওয়াক্সম্যান ডাক্তারী না পড়ে—১৯১১ সালে রুজার্স কলেজে কৃষি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভর্তি হয়ে গেলেন;—ভর্তি পরীক্ষায় ভাল করে একটি বৃত্তিও পেলেন। রাতে জ্ঞাতি ভাইদের খামারে চৌকি দেন আর দিনের বেলা পড়াশুনা করেন। দু'বছর পর কলেজের খামার বাড়ীতে ঘণ্টায় এক সেণ্ট বেতনের একটি চাকরি নিলেন। এতে তাঁর আর্থিক অসুবিধা কিছুটা ঘুচলো,—কলেজের ক্যাম্পাসে থাকার সুযোগও ঘটলো। দিনে গ্রীন হাউস দেখাশোনা করেন, হাঁস-মুরগীকে খাবার দেন, রাতে খামার পাহারা দেন। কলেজের যে পরিখা ছিল তা মাঝে মাঝে সংস্কার করা হতো। এখানে তিনি দেখতে পান যে—বিভিন্ন স্তরের মাটি

এক নয়, ভিন্ন। তাঁর জানতে ইচ্ছে হলো বিভিন্ন স্তরের মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুরা কেমন? তারাও কি বিভিন্ন? এক এক স্তরের মাটিতে বসবাসকারী জীবাণু পরীক্ষা করতে গিয়ে তিনি এমন এক অণুজীবের সন্ধান পেলেন যারা না ছত্রাক, না জীবাণু। এই অণুজীব সম্পর্কে কারো তেমন জানা-শোনা ছিল না। কাজেই ১৯১৫ গ্রাজুয়েট ডিগ্রি লাভ করার আগেই তিনি এক নতুন অণুজীব আবিষ্কার করলেন—নাম দিলেন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিস গ্রিসিয়াস ( Streptomyces gresius )। ১৯১৬ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভের জন্য তিনি যে 'থিসিস' বা গবেষণাপত্র পেশ করেছিলেন তাতে আলোচ্য বিষয় ছিল এই স্ট্রেপ্‌টোমাইসিস গ্রিসিয়াস। তখন তিনি ভাবতেও পারেন নি যে, পরবর্তী কালে এ থেকেই তিনিই আবিষ্কার করবেন এক অপূর্ব সাড়া জাগানো অ্যান্টিবায়োটিক,—স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন,—যক্ষ্মারোগের সর্বপ্রথম সুনিশ্চিত ঔষধ।

যাহোক, ১৯১৬ সালে তিনি মাস্টার্স ডিগ্রি এবং আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভ করলেন। মেধাবী ছাত্রকে সকলেই চায় তার সহকারী বা সহকর্মী করে নিতে। কাজেই কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অধ্যাপক হ্যালস্টেড ওয়াক্সম্যানকে তাঁর ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ওয়াক্সম্যানের তা মনঃপূত হলো না; কেননা তিনি তখন মাটি নিয়ে মেতে উঠেছেন। তাঁর মত ও পথ দুইই বদলে গিয়েছিল। চিকিৎসক হওয়ার শপথ ভুলে গিয়ে তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞান পড়তে শুরু করেন। এখানেও মাটি নিয়ে চলে তাঁর পড়াশোনা ও গবেষণা। কেবলমাত্র যুবক বয়সেই যে মাটির সাথে তাঁর গভীর সংযোগ ছিল তা নয়,—ছেলে বেলাতেও তিনি মাটিকে ভাল বাসতেন। এক সাংবাদিকের কাছে তার ছেলেবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন—"মাটির সোঁদা সোঁদা গন্ধ আমাকে উদাস করতো। সদ্য চাষ করা জমির মাটি আমি হাতে নিয়ে শুঁকে শুঁকে দেখতাম। মাটি, ফসল, মুরগীর ছানা, গরু প্রভৃতির গন্ধ আমার খুব ভাল লাগতো। আমি জানতে চাইতাম জীবন কি? কেমন করে তার শুরু? কী ভাবে তা ক্রিয়াশীল? কোন্ রাসায়নিক প্রক্রিয়া চলছে সেখানে? ছোট বেলায় মায়ের মুখে

ধর্মগ্রন্থের পাঠ শুনতাম। ধর্ম গ্রন্থের একটি উপদেশ আমার মনে খুবই দাগ কেটেছিল—"ঈশ্বর মাটি থেকে ঔষধ সৃষ্টি করেছেন এবং যে জ্ঞানী সে মাটিকে অবহেলা করবে না, ঘৃণা করবে না।"

ওয়াক্সম্যান তাই মাটিকে ঘৃণা করতেন না—বরঞ্চ মাটিকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। মাটি তাঁকে আত্যন্তিক আকৃষ্ট করে তুলেছিল—মাটিকে বিশদভাবে জানার জন্য তিনি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। তাই অধ্যাপক হ্যালস্টেডের আমন্ত্রণ বিনীতভাবে প্রত্যাখ্যান করে তিনি কাজ নিলেন "নিউ জার্সি এগ্রিকালচারাল স্টেশন"-এ। এরপর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ফেলোশিপ গ্রহণ করে সেখান থেকে ১৯১৮ সালে পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি লাভ করলেন। এখানে যে গবেষণা তিনি করে-ছিলেন তা ছিল একেবারে মৌলিক ধরনের। এই গবেষণা বিজ্ঞানে এক নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছিল—যা পরে "সয়েল মাইক্রো-বায়োলজি" ( Soil microbiology )—নামে পরিচিত হয়েছে। পি-এইচ, ডি. লাভের পর তিনি রুজার্সের কৃষি বিদ্যালয়ে বার্ষিক ১৫০০ ডলার বেতনে সয়েল মাইক্রোবায়োলজির প্রভাষক ও গবেষকের পদে যোগ দিলেন।

ইতিমধ্যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের জন্য আমেরিকায় মুদ্রা স্ফীতি দেখা দিয়েছে। ঐ স্বল্প বেতনে ওয়াক্সম্যানের চলে না। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বার্ষিক ৪০০০ ডলার বেতনে চাকরি নিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ ছিল তাঁর খুবই পছন্দ এজন্য নিয়মিতভাবে সপ্তাহে একদিন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতেন। স্বভাবের দিক থেকে তিনি ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও গবেষক। তাই শেষে যখন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে বছরে ৩০০০ ডলার দিতে সক্ষম হলো তখন তিনি ঐ বেশী বেতনের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষায়তনের পরিবেশে ফিরে আসলেন এবং এরপর আর কোথাও যাননি। ১৯২৪ সালে তিনি সহযোগী অধ্যাপক ও ১৯৩০ সালে পুরোপুরি অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি রুজার্স ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক এবং পরে ঐ প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নিযুক্ত হন।

১৯২০ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত ওয়াক্সম্যানের বেশীর ভাগ গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করা। এই দশ বছর তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লক্ষ্য করেছিলেন টেস্টটিউবের মধ্যে মাটিতে বসবাসকারী জীবাণুর আচরণ—তাদের সেই সনাতন সংগ্রাম—এক জীবাণর বিরুদ্ধে আর এক জীবাণুর মারণ অভিযান।

ভূমিবাসী জীবাণু নিয়ে তাঁর এই গবেষণা সারা বিশ্বে কৃষক সমাজের সমূহ উপকারে আসে, কেননা, মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির প্রায় সকল পন্থাই তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। "হিউমাস"—অর্থাৎ মাটির মধ্যকার জৈব উপাদান সম্পর্কে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯২৯ সালে নাইট্রোজেন সম্পর্কে এক বিশিষ্ট গবেষণার জন্য তিনি ১৬০০ ডলার পুরস্কারও লাভ করেন।

কিন্তু সবচেয়ে যে গবেষণা তাঁকে বিশ্ব বিখ্যাত করে তোলে তা হলো মাটিতে বসবাসকারী মিত্র জীবাণু নিঃসৃত দ্রব্যকে রোগ জীবাণু দমনের কাজে নিয়োজিত করা। এই ভূমিবাসী জীবাণু থেকে একটি নয় কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিক তিনি আবিষ্কার করেন—যেগুলি এমন কতকগুলি রোগ সারাতে পারে যা পেনিসিলিন পারে না। তদুপরি এদের মধ্যে একটি যার নাম স্ট্রেপটোমাইসিন,—যক্ষ্মা রোগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইতিপূর্বে যক্ষ্মা রোগ দমনের জন্য সত্যিকারের কোনো ঔষধ ছিল না। সম্পূর্ণ বিশ্রাম, সূর্যস্নান, অস্ত্রোপচার, এই ছিল এ রোগের চিকিৎসা। "গোল্ড" ইঞ্জেকশনের কার্যকারিতা ছিল অনিশ্চিত—রোগ প্রতিরোধের কাজে ককের "টিউবারকুলিন"-ও ছিল ব্যর্থ। তাই লোকে যখন জানলো যে—ওয়াক্সম্যানের আবিষ্কৃত স্ট্রেপটোমাইসিন কয়েক প্রকার যক্ষ্মা রোগ সারাতে পারে, তখন কেবলমাত্র চিকিৎসকই নয়—জনসাধারণের মধ্যেও অপূর্ব সাড়া পড়ে গিয়েছিল,—এমন কি পরীক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের সাফল্যের সংবাদেই চিকিৎসক এবং রোগীরা স্ট্রেপটোমাইসিন পাওয়ার জন্য খুবই উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলেন।

ওয়াক্সম্যান যদিও ছাত্রাবস্থা থেকেই ভূমিবাসী জীবাণু নিয়ে গবেষণা করে আসছিলেন কিন্তু চিকিৎসার ক্ষেত্রে জীবাণুকে কাজে লাগানোর

ব্যাপারে তিনি প্রথম দিকে ততটা মনোযোগী ছিলেন না। পাস্তুরের গবেষণার কথা তাঁর জানা ছিল। মাটি নিয়ে পাস্তুর অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং পরিশেষে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে,—মাটিতে এমন কিছু জীবাণু রয়েছে যারা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে এবং এ থেকে তিনি ধারণা করেন যে, এ সব জীবাণু থেকে রোগের ঔষধ পাওয়া যেতে পারে। পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি লাভের জন্য ওয়াক্সম্যান ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গবেষণা করেছিলেন তাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, জীবাণুদের দল বা গোষ্ঠী আছে। কখনও হয়ত একদল জীবাণু আর একদল জীবাণুকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে—আবার কখনও বা এক দল অন্য দলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে হয়ত তাদেরকে মেরে ফেলছে কিংবা নিজেরা মারা পড়ছে। মাটির বুকে সর্বদাই চলছে এক জীবন সংগ্রাম। ডারউইনের কথায়—যারা যোগ্যতম তারাই শুধু টিকে থাকছে। তিনি আরো প্রমাণ করেন যে—অনেক রোগ-জীবাণু মাটিতে বাড়তে পারে না—মাটির সংস্পর্শে তারা ধ্বংস হয়ে যায়। গ্যাস গ্যাংগ্রীন ও টিটেনাস বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ-জীবাণু অবশ্য এর ব্যতিক্রম। খানিকটা মাটি নিয়ে যদি পরীক্ষা করা যায় তবে প্রায়ই সেখানে কোনো রোগ জীবাণু দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর মলমূত্র, কফ, থুথু, মৃতদেহ প্রভৃতির সূত্রে মাটিতে সর্বদাই যে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে —তাদেরকে পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না কেন—কোথায় যায় তারা? এর একমাত্র সম্ভাব্য উত্তর হলো—মাটিতে মিত্র জীবাণুদের মধ্যে এমন কতকগুলি জীবাণু রয়েছে যারা রোগ-জীবাণুকে আক্রমণ করে ধ্বংস করে, খেয়ে ফেলে। ওয়াক্সম্যান ভাবলেন মাটির এই সব জীবাণু বা তাদের তৈরি কোনো রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে মানুষের ক্ষতি-কারক রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করা হয়ত সম্ভব। এ নিয়ে পরীক্ষা করার সুযোগ ঘটলো যখন জাতীয় গবেষণা ও আমেরিকার টি, বি. সংস্থা তাঁকে যক্ষ্মারোগ জীবাণু মাটির সংস্পর্শে আসলে কি হয় সে সম্পর্কে তাঁকে অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ জানালেন। দেখা গেল,—এই জীবাণু মাটিতে বেশী দিন বাঁচে না। কিন্তু কেন? ওয়াক্সম্যান ভাবলেন

নিশ্চয়ই মাটির কোনো ছত্রাক বা জীবাণু তাদেরকে মেরে ফেলে। এই ছত্রাক বা জীবাণুর সন্ধান করার ভার তিনি দিলেন তাঁর সুযোগ্য ছাত্র রেনে জুলিস ছ্যবোস ( Rene Jules Dubos )-কে।

রেনে জুলিস ছ্যবোস

রেনে ছ্যবোস ১৯০১ সালে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করেন। প্যারিসের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ অ্যাগ্রনমি থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে তিনি রোমের এক কৃষি পত্রিকার সহ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। অন্যের গবেষণা পত্র প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি নিজেই গবেষক হবেন —এই বাসনা তীব্র হয়ে উঠলো তাঁর মনে। তাই সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। ভাগ্যচক্রে ১৯২৪ সালে এক সুযোগ পেয়ে তিনি চলে আসলেন আমেরিকায় এবং রুজার্সে ডঃ ওয়াকস্‌ম্যানের অধীনে পি-এইচ, ডি. ডিগ্রির জন্য গবেষণা শুরু করলেন। মাটিতে যে-সমস্ত জীবাণু কাঠ, গাছের পাতা, ঘাস প্রভৃতি পচিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেয় তাদের সম্পর্কে গবেষণা করে ১৯২৭ সালে পি-এইচ, ডি. ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি 'রকফেলার ইনস্টিটিউট ফর মেডিক্যাল রিসার্চ'-এ যোগ দেন এবং ডঃ আভেরি ( **Dr. Avery** ) -এর সঙ্গে গবেষণা শুরু করেন। এতে ওয়াকস্‌-ম্যান এবং ছ্যবোসের এক সঙ্গে গবেষণার কাজে ছেদ পড়লেও তাঁরা পরস্পরের কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেন। ডঃ অ্যাভেরির গবেষণার

বিষয় ছিল এমন কোন রাসায়নিক দ্রব্য বা জীবাণুর সন্ধান করা যা নিউমোনিয়া জীবাণুর বাইরের আবরণ বা খোলাসকে বিগলিত বা বিনষ্ট করতে পারে। কেননা, তখনকার ধারণা ছিল যে—এই শক্ত খোলসের জন্যই নিউমোনিয়া জীবাণুকে ধ্বংস করা কঠিন। ওয়াক্সম্যানের মত ড্যুবোসও মনে করতেন—মাটির বুকেই এমন সব জীবাণু আছে যারা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করতে সক্ষম। এ ধারণা যে ঠিক—তা তিনি একদিন নিজের চোখেই দেখতে পেলেন। অবশ্য এ জন্য এক চমৎকার উপায় তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। নানা জায়গার মাটি সংগ্রহ করে সেগুলিকে তিনি এতটা গরম করলেন যে তাতে জীবাণুগুলিই বেঁচে থাকবে, নষ্ট হবে শুধু তাদের সমস্ত খাবার। এরপর তিনি সেই সব মাটিতে মাঝে মাঝে নিউমোনিয়া রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে দিতে থাকলেন – যাতে কেবলমাত্র সেইসব জীবাণুই বেঁচে থাকবে যারা নিউমোনিয়া রোগ-জীবাণু-কেই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারে। আর এভাবেই সম্ভব এ সকল জীবাণুকে অন্যান্য জীবাণু থেকে পৃথক করার কঠিন কাজটি সম্পন্ন করা। কিছু দিন পর তিনি সেই সব মাটি পরীক্ষা করে দেখলেন, সত্যিই তাই। সেই সব মাটিতে তখনও বেঁচে আছে এক ধরনের জীবাণু - দেখতে ছোট ছোট কাঠির মত – নাম ব্যাসিলাস ব্রেভিস (bacillus brevis)। অণু-বীক্ষণে তিনি দেখলেন সেই আশ্চর্য, অবাক কাণ্ড ;—ঐ কাঠির মত জীবাণু গোলাকার স্ট্যাফাইলোকক্কাস জীবাণুর গায়ে লেগে যাচ্ছে এবং এমনিভাবে লেগে থেকে এক সময় তাকে নিঃশ্চিহ্ন করছে। ড্যুবোস তখন এই জীবাণু থেকে নিঃসৃত সেই রাসায়নিক দ্রব্যটি উদ্ধারের কাজ শুরু করলেন - যা নিউমোনিয়া জীবাণুকে নির্মূল করতে সক্ষম।

এদিকে রুজার্সে ওয়াক্সম্যানও তখন অনুরূপ এক কাজে লিপ্ত ছিলেন। তিনিও খোঁজ করছিলেন জীবাণু নিঃসৃত এমন কোন রাসায়-নিক পদার্থ – যা যক্ষ্মারোগ জীবাণুর ততোধিক কঠিন খোলসকে গলাতে পারে। কিন্তু কাজ বেশী দূর এগোয়নি। কেননা, তাঁর মুখ্য গবেষণা ছিল সেই সব জীবাণু নিয়ে, যারা মাটির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করে। তবে তিনি তাঁর প্রাক্তন ছাত্রের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সব সময় খোঁজ খবর রাখতেন।

যাহোক, ডুবোস বহু কষ্ট ও পরিশ্রমের পর ভূমিবাসী জীবাণু ব্যাসিলাস ব্রেভিস থেকে উদ্ধার করলেন একটি মিশ্র পদার্থ যার নাম তিনি দিলেন গ্রামিসিডিন—কিন্তু পরে এটি পরিচিত হয় টাইরোথ্রিসিন (Tyrothricin) নামে। পরীক্ষায় দেখা গেল,—টাইরোথ্রিসিন অনেক রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করতে পারে কিন্তু প্রাণীদেহে এর প্রতিক্রিয়া ভীষণ। রোগজীবাণুর সাথে সাথে রক্তের লোহিত কণিকারও মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে। ফলে, প্রাণীরা আর বাঁচে না। ইঞ্জেকশনের বদলে খেলে কোনো উপকার হয় না—কেননা দেহে এটি মোটেই শোষিত হয় না—সবটাই বেরিয়ে যায়। কাজেই রোগের চিকিৎসায় টাইরোথ্রি-সিনকে ব্যবহার করা গেল না। এতে ডুবোস খুবই দমে গেলেন,—নিরাশ হলেন। অবশ্য কিছুটা সান্ত্বনা তাঁর জুটলো ডাক্তারদের কাছ থেকে। টাইরোথ্রিসিনকে তাঁরা ব্যবহার করলেন দেহের ভেতরে নয়, বাইরে। দূষিত ক্ষত, ফোড়া, কার্বাঙ্কল বা বহুমুখী ফোড়া প্রভৃতিতে মলম হিসাবে এটি ব্যবহার করে বেশ উপকার পাওয়া গেল।

যাহোক, টাইরোথ্রিসিনের এটুকু সাফল্য ডুবোসের কতটুকু সান্ত্বনার কারণ হয়েছিল জানা নেই—তবে একথা সত্যি যে, ডুবোসের এই আবি-ষ্কার অন্যদিকে সৃষ্টি করলো এক ইতিহাস। একের পর এক অ্যান্টি-বায়োটিক আবিষ্কৃত হয়ে চিকিৎস-জগতে আনলো এক যুগান্তর—পরাভূত হলো বহু ব্যাধির পরাক্রম। একের নৈরাশ্য হলো অন্যের উৎসাহের কারণ। ফ্লোরি ও চেইন পেনিসিলিন নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করলেন, আর তার ফল যে কত শুভ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা আমরা আগের অধ্যায়ে জেনেছি। কিন্তু সবচেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন ডুবোসের এক কালের শিক্ষক ওয়াক্সম্যান। এত দিন ধরে তিনি যে গবেষণার কাজে মেতে ছিলেন তা প্রায় মুলতবী রেখে—ছুটলেন ডুবোসের মত অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধানে—খুঁজতে লাগলেন সেইসব জীবাণু যারা নিঃসৃত করে নিরাপদ এবং পেনিসিলিনের চেয়েও কার্যকরী অ্যান্টি-বায়োটিক—এমন কি, পেনিসিলিন যেখানে অক্ষম সেখানেও দর্শাবে তারা তাদের অপূর্ব দক্ষতা।

এক কথায় ছ্যবোসের গবেষণা ওয়াক্সম্যানের গবেষণার মোড় ঘুরিয়ে দিল। অবশ্য এ পরিবর্তনের পিছনে ছ্যবোসের ব্যক্তিগত অনুরোধও কাজ করেছিল। কাজেই এরপর তিনি ছ্যবোসের পথ অনুসরণ করেই অগ্রসর হলেন। ছ্যবোসের অনুরোধ কিভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে এক মজার গল্প তিনি বলেছিলেন এক সাংবাদিকের কাছে। গল্পটি হলো ঃ "এক ইহুদী শাস্ত্রের পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করা হলো— 'আপনি একার জীবনে কি করে এত জ্ঞান অর্জন করলেন?' উত্তরে তিনি বললেন—'আমি শিক্ষকদের কাছে এ ব্যাপারে অনেক ঋণী—তাঁরা আমাকে ভালভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার চেয়ে আমি অধিক ঋণী আমার বন্ধুদের কাছে- তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে, অনুপ্রাণিত করেছে—কিন্তু সবচেয়ে বেশী ঋণী আমি আমার ছাত্রদের কাছে,— কেননা, তারা আমাকে প্রশ্ন করেছে-তারা আমাকে বুঝতে শিখিয়েছে যে আমি ভাল করে কিছুই জানি না।' ছ্যবোসের অনুরোধ বা উপদেশ আমার জীবনে বলতে গেলে ছিল এমনই।"

আমাদের ভাগ্য ভাল যে—ওয়াক্সম্যানের পরবর্তী গবেষণা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল যদিও প্রথম দিকে তা ছিল বেশ নৈরাশ্যজনক। কিন্তু পরের দিকে একে একে এমন সব অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হলো যা পেনিসিলিনকেও সরিয়ে দিয়েছিল পিছনের সারিতে। শুধু তাই নয়, ওয়াক্সম্যানের আবিষ্কার উদ্বুদ্ধ করেছে এবং আজও করে চলেছে বহু বিজ্ঞানীকে—মাটির বুকের জীবাণুর মধ্যে নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের সন্ধান তাই আজও শেষ হয়নি।

যাহোক, ১৯৩৯ সালের দিকে ওয়াক্সম্যান নতুনভাবে কাজ শুরু করলেন। ল্যাবরেটরিকে ভিন্নভাবে সাজালেন—নিযুক্ত করলেন আরো ৮জন সহকারী। মাঠ, ঘাট, বন, জঙ্গল, সারগাদা, নদী, নালা, ডোবা প্রভৃতি যাবতীয় জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করে পরীক্ষা চললো। ক্ষ্যাপার মত তাঁরা খুঁজতে লাগলেন সেই পরশপাথর-যার ছোঁয়ায় মানুষের সকল রোগ প্রশমিত হবে। এ এক অমানুষিক পরিশ্রম—

কঠিন সাধনা। কিন্তু প্রথম দিকের প্রচেষ্টা হ্যুবোসের মত পণ্ডশ্রমে দাঁড়ালো। ১৯৪০ সালে তাঁরা প্রথম যে অ্যান্টিবায়োটিক—অ্যাকটি-নোমাইসিন (Actinomycin) অ্যাকটিনোমাইটিস জাতীয় অণুজীব থেকে পেলেন—সেটি দেখা গেল রোগ জীবাণু দমনে খুবই দক্ষ। পেনিসিলিনের চেয়েও এটি শক্তিশালী এবং প্রায় সব ধরনের রোগ জীবাণুকেই ধ্বংস করতে সক্ষম—১০ কোটি গুণ লঘু করলেও তার ক্ষমতা হ্রাস পায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটি এমনই বিষাক্ত যে রোগ জীবাণুর সাথে সাথে প্রাণীও প্রাণ হারায়। সায়ানাইড বিষের চেয়েও এটি ৬ গুণ বেশী বিষাক্ত। ওয়াক্সম্যান সব রকম কৌশল প্রয়োগ করলেন—একে প্রাণীর পক্ষে সহনীয় করে তুলতে, কিন্তু সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলো। এ সম্পর্কে পরে একদিন এক সাংবাদিককে তিনি বলেছিলেন—"একে বাদ দেয়া ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় ছিল না—এ ব্যর্থতা আমাদের পক্ষে ছিল এক নিদারুণ আঘাত।"

আঘাত শুধু এদিক থেকে নয়—আসলো অন্য দিক থেকেও। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থা তখন ভাল যাচ্ছিল না। কর্তৃপক্ষ খরচ কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এই ব্যবস্থায় ওয়াক্সম্যানের গবেষণার জন্য ব্যয় বরাদ্দ করাতো দূরের কথা তাঁর চাকরি যাওয়ারই উপক্রম হলো। একজন বাজেট বিশেষজ্ঞ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের কাছে বলেই বসলেন—"এই যে একজন অখ্যাত বিজ্ঞানী বছরে ৪ হাজার ৬ শো বিশ ডলার উপার্জন করছেন—তিনি কী করছেন? না, খেলা করছেন মাটিতে বাস করা সব জীবাণু নিয়ে! এই ধরনের গবেষণার সার্থকতা কোথায়? এর পেছনে যে টাকা খরচ হচ্ছে—সেকি কখনো পরিশোধ হবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ব্যয় তাই কোনক্রমেই বরদাস্ত করা যায় না।"

ভাগ্য ভাল যে ডঃ লিপম্যান এর প্রতিবাদ করেছিলেন, তাই রক্ষা—তা না হলে ওয়াক্সম্যানের চাকরিটি গিয়েছিল আর কি! আরো ভাগ্য ভাল যে আমেরিকার বিখ্যাত ঔষধ কোম্পানি মার্ক শার্প অ্যাণ্ড ডোম—এর কাছে ওয়াক্সম্যান তাঁর গবেষণা চালানোর সাহায্য চাইলে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ এক কথায় রাজি হয়েছিলেন। কেননা, তাঁরা ওয়াক্সম্যানের গবেষণা

সম্পর্কে কিছু সংবাদ রাখতেন—তাই ভেবেছিলেন এ গবেষণা সফল হলে তাঁদের ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হবে। ব্যবসায়ীর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞানীর এই সংযোগ সত্যই ফলপ্রসূ হয়েছিল—এবং আজকাল বেশীর ভাগ বড় বড় গবেষণা এভাবেই সম্পাদিত হয়ে থাকে।

মার্ক কোম্পানীর সহায়তায় চললো গবেষণা—কয়েকটি অ্যান্টিবায়োটিকও আবিষ্কৃত হলো—কিন্তু কোনটাই ব্যবহারযোগ্য নয়। কোনটা হয়ত খুবই বিষাক্ত—আবার কোনটা টেস্ট টিউবে রোগজীবাণু ধ্বংস করে ঠিকই কিন্তু প্রাণিদেহে তা আর পারে না। প্রায় দশ হাজার রকম মাটির নমুনা থেকে পাওয়া গেল অসংখ্য জাতের জীবাণু, আর সেই জীবাণু দিয়ে রোগ জীবাণুর ওপর পরীক্ষা চললো কিন্তু কোনো সাফল্য আসলো না, কেবল ব্যর্থতা আর হতাশা। তবু এ, হতাশার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললো গবেষণা—দমবার পাত্র নন ওয়াক্সম্যান। ব্যর্থতার মধ্য দিয়েই আসে সাফল্য এ বিশ্বাসটাই তাঁকে পরিচালিত করলো আরো পরিশ্রম, আরো গবেষণার কাজে।

ইতিমধ্যে প্রচুর পরিমাণে পেনিসিলিন তৈরি শুরু হয়ে গেছে। আশ্চর্য এবং অব্যর্থ ঔষধ হিসাবে পেনিসিলিনের নাম ছড়ালেও কতকগুলি রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেল পেনিসিলিন একেবারেই ব্যর্থ। ওয়াক্সম্যান তাই খুঁজতে লাগলেন এমন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক যা পেনিসিলিনের চেয়ে আরো পারদর্শী—সারাতে পারে সেই সমস্ত রোগ পেনিসিলিন যা পারে না, বিশেষ করে যক্ষ্মা। অ্যান্টিবায়োটিক কথাটা যদিও আমরা এর আগেও ব্যবহার করেছি কিন্তু কথাটা ওয়াক্সম্যানই প্রথম চালু করেন অনেকটা এই সময়ে (১৯৪১)। অণুজীব থেকে পাওয়া যে সমস্ত পদার্থ যেমন, টাইরোথ্রিসিন, অ্যাকটিনোমাইসিন, পেনিসিলিন প্রভৃতি যারা রোগ জীবাণুকে নির্মূল বা তাদের বৃদ্ধিকে প্রতিহত করতে পারে,—ওয়াক্সম্যান তাদের নাম দেন "অ্যান্টিবায়োটিকস্।"

অবশেষে সাফল্য আসলো ১৯৪৪ সালে। একদিন এক চাষী একটা মরা মোরগ নিয়ে হাজির হলো তাঁর গবেষণাগারে। মোরগটির রোগের কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁর পাকস্থলীতে পাওয়া গেল কিছু মাটি। এই মাটি পরীক্ষা করে ওয়াক্সম্যান সন্ধান পেলেন সেই না-ছত্রাক না-জীবাণু স্ট্রেপটো-

মাইসিন গ্রিসিয়াস-এর, —যা তিনি ছাত্র বয়সে একদিন আবিষ্কার করে-ছিলেন। আর সবচেয়ে যা আশ্চর্যের তা হলো এই যে,—এককালের এই অতি পরিচিত অণুজীবকে যখন তিনি বিভিন্ন রোগ জীবাণুর কালচার প্লেটে বপন করলেন,- তখন দেখা গেল এমন সব কাণ্ড - যা তিনি কখনও কল্পনা করতে পারেন নি। দেখলেন, ঐ স্ট্রেপটোমাইসিস গ্রিসিয়াসের সংস্পর্শে প্রায় সব রোগ জীবাণুই পরাজয় বরণ করছে—এমন কি যক্ষ্মা রোগের জীবাণু পর্যন্ত। মোট কথা, পেনিসিলিন যা পারে না—সেই অসাধ্য সাধন করছে এই অণুজীব। তাই মজার ব্যাপার যা দাঁড়ালো তা হলো, —তিনি যে অ্যান্টিবায়োটিক এতদিন ধরে খুঁজে মরছিলেন—তাই যে নিহিত রয়েছে—প্রায় ৩০ বছর আগে তারই আবিষ্কৃত সেই অণুজীবের মধ্যে তা তিনি ঘুণাক্ষরেও একবার টের পান নি! ভাগ্যের লীলা খেলা একেই বলে!

যা হোক, এই আবিষ্কারে দারুণ সাড়া জাগলো সারা ল্যাবরেটরি জুড়ে। তবে কী সত্যি সত্যি সেই পরশপাথর খুঁজে পাওয়া গেছে। —যার সংস্পর্শে সেরে উঠবে মানুষের যক্ষ্মা, সিদ্ধি লাভ ঘটবে তাঁদের সাধনার? ওয়াক্সম্যান তাঁর দলবল নিয়ে ছুটে গেলেন সেই চাষীর খামারে। সবটুকু সার মাটি তুলে আনলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে। সমস্ত ল্যাবরেটরিতে ছড়িয়ে পড়লো চাঞ্চল্য—কর্মব্যস্ততা। কাজ আর কাজ। কেননা, এখন প্রাণীর ওপর পরীক্ষার জন্য চাই স্ট্রেপ্‌টোমাইসিস গ্রিসিয়াস নিঃসৃত সেই পদার্থ প্রচুর পরিমাণে, যা কালচার প্লেটে রোগ-জীবাণু নিধনের কাজে পেনিসিলিনের চেয়েও অধিক দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিস গ্রিসিয়াস থেকে এই অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া যায় বলে ওয়াক্সম্যান তার নাম দিলেন—স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন।

অচিরে স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা ল্যাবরেটরির বাইরেও ছড়িয়ে পড়লো। আগে হলে লোকে বিশ্বাস করতে চাইতো না। কিন্তু কিছুকাল আগেই পেনিসিলিনের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা লোকে জেনেছে। তাই তারা আরো নতুন অ্যান্টিবায়োটিক পাওয়ার আশায় ছিল উৎসুক। মেয়ো ক্লিনিকের দু'জন ডাক্তার ডব্‌লু. এইচ. ফেল্ডম্যান ও এইচ. সি-

হিনস্ যক্ষ্মা রোগগ্রস্ত গিনিপিগের ওপর ফলাফল লক্ষ্য করার জন্য ওয়াকস্ম্যানের কাছে কিছু স্ট্রেপ্টোমাইসিন চাইলেন। এমনি আরো অনেক জায়গা থেকে অনুরোধ আসতে লাগলো। মার্ক কোম্পানী তাঁদের সকলকে স্ট্রেপ্টোমাইসিন সরবরাহ করলেন—তবে এই শর্তে যে, তাঁরা যেন অনুগ্রহ করে পরীক্ষার ফলাফল যথা সময়ে কোম্পানীকে অবহিত করেন—বিশেষ করে সেই সব রোগের ক্ষেত্রে যেখানে পেনি-সিলিন বিফল।

শীঘ্রই নানা জায়গা থেকে সুসংবাদ আসতে লাগলো। কেউ জানালো - স্ট্রেপ্টোমাইসিন—অ্যাকটিনোমাইসিনের মত বিষাক্ত নয়—প্রয়োজনের চেয়ে বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলেও বিপদ ঘটে না—এতে কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি মারাত্মক রোগ সেরে যায়। আনগুলাণ্ট ফিভার নামক কঠিন জ্বরের ওষুধ আগে জানা ছিল না—খবর আসলো—এ রোগেও নতুন অ্যাণ্টিবায়োটিকটি খুবই কার্যকরী। আরো নানা জায়গা থেকে কঠিন কঠিন রোগ দমনে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের দক্ষতার খবর আসতে লাগলো—যেমন, - টুলারেমিয়া, মারাত্মক জাতের নিউমোনিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি। মোট কথা, পেনিসিলিন যে-সকল রোগ সারাতে পারে না—তার অনেকগুলিকেই স্ট্রেপ্টোমাইসিন সারাতে সক্ষম। কিন্তু সবচেয়ে সুখবর আসলো মোয়ো ক্লিনিকের ডাঃ ফেল্ডম্যান ও ডাঃ হিনস্-এর কাছ থেকে। তাঁরা গিনিপিগের শরীরে যক্ষ্মা সংক্রামিত করে দেখেছেন যে—স্ট্রেপ্টোমাইসিনে তারা সেরে ওঠে। অবিশ্বাস্য আনন্দদায়ক সংবাদ। তবে কী মানুষও মুক্তি পাবে এই রোগের কবল থেকে? কিন্তু তার আগে প্রাণীর ওপর আরো কয়েকবার পরীক্ষা প্রয়োজন। পরীক্ষাটি পুনরায় গিনিপিগের ওপর করা হলো—ফল একই। নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরূপ আরো প্রাণীর ওপর পরীক্ষা করা প্রয়োজন—কিন্তু অবস্থা বিপাকে তা আর করার সুযোগ ঘটলো না—একেবারে সরাসরি মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাতে হলো।

মেয়ো ক্লিনিকের এক অল্প বয়সী মহিলার অবস্থা খুবই খারাপ। প্রায় দেড় বছর ধরে সেখানে তাঁর ফুসফুসের যক্ষ্মার চিকিৎসা চলছিল।

ডানদিকের ফুসফুসে কঠিন অস্ত্রোপচার করেও সুফল পাওয়া যায়নি— এখন বাঁ দিকের ফুসফুসও ভীষণভাবে আক্রান্ত। মহিলার মৃত্যু অবধারিত এবং তা অতি শীঘ্রই। শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে তাই প্রয়োগ করা হলো স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন। মাত্রা জানা নেই প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে তাও অজানা। তাই ভয়ে ভয়ে প্রতিদিন ১ গ্রামের ১০ ভাগের এক ভাগ করে দেয়া হলো (এখন সাধারণভাবে দেয়া হয় প্রতিদিন ১ গ্রাম)। চিকিৎসা শুরু হওয়ার দিনটি ছিল ১৯৪৪ সালের ২০ই নভেম্বর, —যে দিন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন প্রবেশ করলো মানুষের শরীরে; ফল দাঁড়ালো শুভ। কিছুদিন পর এক্সরে করে দেখা হলো—বাঁ দিকের ফুসফুসে রোগ আর বাড়েনি। ডাক্তাররা পরামর্শ করে ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন। মহিলা ক্রমশ: সুস্থ হয়ে একদিন বাড়ী ফিরলেন। এ, মহিলার পরে বিয়ে হয়—তিন সন্তানের জননীও হয়েছিলেন তিনি। পৃথিবীর সর্ব প্রথম যক্ষ্মারোগী, যাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল ওয়াক্সম্যানের স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের কল্যাণে—অকালে চলে পড়েননি মৃত্যুর কোলে।

১৯৪৬ সালে ওয়াক্সম্যান যখন স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্ববরেণ্য—তখন তিনি তাঁর জন্মভূমি রাশিয়ায় বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রিত হন। স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন তখনও দুষ্প্রাপ্য, তবু তিনি কিছু স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁর সম্মানে প্রদত্ত এক ভোজ সভায় এক বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান ভূ-পদার্থবিদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। যক্ষ্মারোগে ঐ বিজ্ঞানীর অবস্থা তখন এতটাই খারাপ ছিল যে—কয়েক মিনিট পর পরই তিনি টেবিল ছেড়ে থুথু ফেলতে যাচ্ছিলেন —কিন্তু তা থুথু নয়—রক্ত। ডাক্তারেরা তাঁর পরমায়ু—আর মাত্র ছয় মাস নির্ধারণ করেছিলেন। ওয়াক্সম্যান তাঁর চিকিৎসার জন্য কিছু স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন দিয়েছিলেন—আর কী আশ্চর্য—সেই বিজ্ঞানী বেঁচে ছিলেন আরো কয়েক যুগ।

রোগীদের ভাগ্য ভাল যে—স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন আবিষ্কারের কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই মানুষের ওপর তা পরীক্ষা করার সুযোগ ঘটেছিল। কিন্তু ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন আবিষ্কার আর রোগীর দেহে তার প্রয়োগের

ব্যবধান ছিল প্রায় ১৩ বছর। ইতিমধ্যে কত লক্ষ মানুষই না মারা গিয়েছিল—যারা পেনিসিলিন চিকিৎসার সুযোগ পেলে হয়ত বেঁচে যেত! কিন্তু তা হয় নি। এই দেরির কারণ সম্পর্কে ওয়াক্সম্যান মন্তব্য করে-ছিলেন—"ফ্লেমিং সময়ের আগে জন্মেছিলেন এবং তাঁর আবিষ্কার হয়েছিল সময়ের আগে। এত বড় আবিষ্কারের জন্য কেউ তখন তৈরি ছিল না —চিন্তাও করেনি কখনও।" পেনিসিলিন আবিষ্কারের (১৯২৮) পূর্ব পর্যন্ত অনেক বিজ্ঞানী ভাবতেও পারেন নি যে ছত্রাক জীবাণু নিঃসৃত কোনো রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে রোগ-জীবাণু নিধন করা যেতে পারে। তা ছাড়া, পেনিসিলিন আবিষ্কৃত হয়েছিল আকস্মিকভাবে। সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা তাই এত বড় আবিষ্কারকে সহসা বিশ্বাস করতে পারেননি—সর্বোপরি রোগের চিকিৎসায় অণুজীব ব্যবহারের প্রতি প্রগতিশীল চিকিৎসকদের ছিল বিরূপ মনোভাব। কিন্তু পেনিসিলিনের সাফল্য বিজ্ঞানীদের চোখ খুলে দিয়েছিল,—ফলে বিজ্ঞানীরা তখন ঝুকে পড়ে-ছিলেন পেনিসিলিনের মত আরো অন্যান্য, আরো আশ্চর্য অ্যান্টিবায়ো-টিক আবিষ্কারের দিকে। তাই, পূর্বেই বলেছি—স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কার ছিল একটি সুপরিকল্পিত গবেষণার ফলশ্রুতি। কাজেই বিজ্ঞানী, জনসাধারণ, ওষুধ কোম্পানি সকলেই উৎসুক ও উৎসাহী হয়ে উঠে-ছিলেন এই আবিষ্কারের ব্যাপারে,—আর এজন্যই স্ট্রেপ্টোমাইসিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও প্রস্তুতির কাজ যথাশীঘ্র সম্পন্ন হতে পেরেছিল।

অবশ্য এই আবিষ্কারের কাজ সহজ ছিল না। ওয়াক্সম্যান ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দকে এজন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। ওয়াক্সম্যান হিসাব করেছিলেন তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা বিভিন্ন স্থানের মাটি থেকে ১০ হাজার অণুজীব উদ্ধার করেছিলেন এবং এদের প্রত্যেকটিই রোগ-জীবাণু নিধন করতে পারে কিনা তা তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এদের মধ্যে শতকরা প্রায় এক ভাগের মধ্যে এই ক্ষমতা থাকতে দেখা গিয়েছিল। এদেরকে আরো বাছাই করে তাদের মধ্য থেকে পাওয়া গিয়েছিল ১০টি কার্যকরী রাসায়নিক পদার্থ। এই দশটির মধ্যে একটি হলো স্ট্রেপ্টোমাইসিন।

স্ট্রেপ্টোমাইসিন আবিষ্কারের অল্প কিছুদিনের মধ্যেই চিকিৎসা ক্ষেত্রে এটি একটি প্রথম সারির ওষুধ হিসাবে স্বীকৃত হলো। মূলত এটি যক্ষ্মা রোগ দমনে সর্বপ্রথম ফলপ্রদ ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও বুবনিক প্লেগ, টাইফয়েড, মূত্রনালীর সংক্রমণ, টুলারেমিয়া বা র‍্যাবিট ফিভার, অ্যাণ্ডুল্যালাণ্ট ফিভার, হুপিং কাশি, কলেরা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসাতেও ব্যবহৃত হয়। দেখা গেছে, পেনিসিলিন যে-সকল রোগ সারাতে পারে সে সকল রোগ ছাড়াও আরও অনেক রোগ স্ট্রেপ্টো-মাইসিন সারাতে পারে এবং তা ভাল ভাবেই পারে। তবে কথা আছে। চাঁদেও যেমন কলঙ্ক আছে—তেমনি বহু রোগের চিকিৎসায় স্ট্রেপ্টোমাইসিন আশ্চর্য ফলপ্রদ হলেও—ত্রুটি মুক্ত নয়। আর এজন্য বাস্তবে স্ট্রেপ্টোমাইসিনের প্রয়োগ অনেকটা সীমিত। স্ট্রেপ্টোমাই-সিন পেনিসিলিনের চেয়ে বেশী দামী এবং বেশী বিষাক্ত। তাই স্ট্রেপটোমাইসিন পেনিসিলিনের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হলেও—যে সকল রোগ পেনিসিলিন সারাতে পারে সেখানে স্ট্রেপটোমাইসিনের পরিবর্তে পেনিসিলিনই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য স্ট্রেপটোমাইসিন থেকে তৈরি ডাই-হাইড্রো স্ট্রেপটোমাইসিন স্ট্রেপটোমাইসিনের চেয়ে কম বিষাক্ত বলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটি ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া যক্ষ্মা রোগ সারাতে পারে বলে স্ট্রেপটোমাইসিনের যে সুখ্যাতি প্রথমে ছড়িয়েছিল—সেটিও পুরোপুরি সত্য নয়। কেননা, সব রকমের যক্ষ্মা স্ট্রেপটোমাইসিনে সারে না। সর্বোপরি, স্ট্রেপটোমাইসিনের যে মারাত্মক ত্রুটি,—তা হলো —অনেক রোগ-জীবাণু সহজেই স্ট্রেপটোমাইসিনের প্রতি প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে পারে। যক্ষ্মারোগে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসার প্রয়োজন হয়—কাজেই প্রথম দিকে স্ট্রেপটোমাইসিনে যতটা ফল পাওয়া যায়—পরে তা পাওয়া যায় না—এমন কি জীবাণুরা রাতারাতি প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে পারে। এজন্য যক্ষ্মারোগের চিকিৎসায় আজকাল স্ট্রেপটোমাইসিনের সঙ্গে **P. A. S** ( **Para amino Salicylic acid** ); **I. N. H** ( **Iso nicotinic acid hydrazide** ) ; **Tibione** ( **Acitamino benzal dehyde thio semicarbazone** ) প্রভৃতি সংশ্লেষিত (synthetic) ঔষধ ব্যবহৃত হয়।

ওয়াক্সম্যান তাঁর আবিষ্কারের জন্য জীবনে বহু সম্মান লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে রাশিয়া তাঁকে ১৫০০ রুবল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করে এবং রেড একাডেমী অফ সাইন্সের সভ্য মনোনীত করে। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি অন্তত ১০টি সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বহু পুরস্কার ও স্বর্ণ পদক লাভ করেন। যক্ষ্মারোগের সর্বপ্রথম কার্যকরী ঔষধ স্ট্রেপটোমাইসিন আবিষ্কারের জন্য ১৯৫২ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করে ছিলেন। কিন্তু সবচেয়ে যে বড় সম্মান তিনি লাভ করেছিলেন—তা বোধ করি বিশ্বের অগণিত রোগ ক্লিষ্ট মানুষের অন্তরের শ্রদ্ধা ও আশীর্বাদ। ১৯৭৩ সালের ১৬ই আগস্ট, ৮৫ বছর বয়সে অগণিত মানুষের আন্তরিক আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে এই মহাবিজ্ঞানী মৃত্যু বরণ করেন এবং আশ্রয় নেন সেই মাটির বুকে যে মাটিকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভাল বাসতেন।

ওয়াক্সম্যান কেবল একজন মহান বিজ্ঞানী ছিলেন না—তিনি ছিলেন এক মহৎ প্রাণের অধিকারী। ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে—ভূমিবাসী জীবাণু থেকে অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কারের জন্য মার্ক কোম্পানি আর্থিক সাহায্য করে আসছিলেন। শর্ত ছিল—যদি তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয় তবে তা তৈরি করার একমাত্র অধিকার থাকবে ঐ কোম্পানির। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল—স্ট্রেপটোমাইসিনের চাহিদা এত বেশী যে একটি মাত্র কোম্পানির পক্ষে প্রয়োজন মেটানো কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তিনি কোম্পানিকে স্ট্রেপটোমাইসিন তৈরির একচেটিয়া অধিকার তুলে নিতে অনুরোধ করলেন—যাতে তাঁর আবিষ্কারের ফল সকলেই পেতে পারে।

এতদিনের গবেষণায় যে ৫ লক্ষ ডলার খরচ হয়েছিল রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয় তা মার্ক কোম্পানিকে ফিরিয়ে দিলে কোম্পানি তার শর্ত তুলে নিল। কোম্পানি স্বত্ব ত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াক্সম্যান তাঁর এই আবিষ্কারের পেটেন্ট ও রয়ালটির সকল স্বত্ব দান করলেন রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়কে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের আন্তরিক ইচ্ছা এই মহান বিজ্ঞানী তাঁর আবিষ্কারের অন্তত কিছু আর্থিক সুবিধা লাভ করেন,—

তাই তাঁরা অনেক অনুরোধ করে তাঁকে লভ্যাংশের শতকরা ২০ ভাগ গ্রহণ করতে রাজি করালেন। কিন্তু তিনি সে অর্থের প্রায় সবটাই দান করলেন মাইক্রোবায়োলজি সংক্রান্ত গবেষণার কাজে এবং তাঁর সহকর্মী-দের মধ্যে।

১৯৪৯ সালের মে মাসে রুজার্স বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ওয়াক্সম্যানের অনুরোধে এবং ওয়াক্সম্যানের আবিষ্কৃত স্ট্রেপ্‌টোমাইসিন ও অন্যান্য অ্যান্টিবায়োটিক থেকে প্রাপ্ত রয়ালটির টাকায় ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবায়োলজি নামে একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং পরে ১৯৫৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যা-লয় কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ওয়াক্সম্যান-এর প্রথম পরিচালক হন। বৃদ্ধ বয়সেও গবেষণার কাজে তাঁর যেমন উৎসাহের কমতি ছিল না তেমনি সহকারীদেরকে তিনি উৎসাহিত করতেন তাঁদের কাজে। তাঁর বিস্ময়কর আবিষ্কারের পিছনে ডঃ অ্যালবার্ট সাজ, ডঃ রবার্ট এলস্টাকি, ডঃ ফেডকক, বুদো, বেটিবুগি এবং আরো বহু সহকর্মীদের যে নীরব সাধনা রয়েছে একথা বিনীতভাবে বারবার তিনি স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলতেন, "একটি বড় আবিষ্কার সুন্দর একটি "মোজেইক"-এর মত অনেক পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি কিংবা অপূর্ব একটি ঐকতানের মত। মোজেইক যেমন একটি মাত্র পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি নয়—তেমনি একটি ঐকতানও একক কোন শিল্পীর সৃষ্টি নয়।"

স্ট্রেপ্‌টোমাইসিনের আবিষ্কার ওয়াক্সম্যানকে বিরাট সম্পদশালী করতে পারতো কিন্তু তিনি কখনও বিত্তবান হতে চাননি। আমেরিকার অনেক বড় বড় কোম্পানি থেকে লোক এসে তাঁকে বলেছিল—"আপনি আমাদের কোম্পানিতে আসুন,—এই নিন ব্লাঙ্ক চেক্—কত টাকা আপনি চান লিখে দিন।" এক কোম্পানি থেকে টেলিফোনে তাঁকে বলা হয়েছিল—"আমরা আপনাকে আমাদের গবেষণা বিভাগের পরিচালক হিসাবে পেতে ইচ্ছুক—এজন্য আমরা আপনার প্রাইভেট অ্যাকাউন্টে ১ কোটি ডলার জমা দিতে প্রস্তুত—দয়া করে আসবেন কি?" এসবের উত্তরে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলেন—"না, আমি মোটেই আগ্রহী নই।"

সত্তর বছর বয়সে তিনি যখন ইনস্টিটিউট অফ মাইক্রোবায়েলজি থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তখনও তিনি কর্মময় জীবন যাপন করতেন। বাড়ীর পিছনে বাগান করতেন—আত্মজীবনী ও যে বিজ্ঞান শাখার তিনি ছিলেন পথিকৃৎ সেই মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ে বই লিখতেন। মাঝে মাঝে ল্যাবরেটরিতে যেতেন—কর্মরত বিজ্ঞানীদেরকে উপদেশ ও উৎসাহ দিতেন। কখনও বা দেশে বিদেশে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। অবসর জীবনেও তাঁর এতটা কর্মব্যস্ততা ছিল যে তাঁর এক অতি প্রিয় "হবি"—"ক্যারিকেচার"-এর দিকে তেমন নজর দিতে পারতেন না। এত বড় বিজ্ঞানীর যে এমন একটা কৌতুককর হবি ছিল তা সত্যই ভাবা যায় না। এ ব্যাপারে তিনি এতটাই আন্তরিক ও উৎসাহী ছিলেন যে এ সম্পর্কে হাজারের ওপরে বই পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন এবং এ বিষয়ে তিনি নিজেও একটি বই লিখবেন বলে ইচ্ছা পোষণ করতেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় হবি ছিল গবেষণা—আর সেই গবেষণা হলো অণুজীব নিয়ে! তিনি বলতেন—মানুষের মত "মাইক্রোব" (অতি ক্ষুদ্র জীব)-ও তুচ্ছ নয়—গাছপালা, মানুষের মতই তার চর্চা করা উপযুক্ত কাজ। এবং এই উপযুক্ত কাজ করতে গিয়েই তিনি স্ট্রেপ্টোমাইসিনের মত আরো প্রায় ডজন খানিক অ্যান্টিবায়োটিক—যাদের মধ্যে নিওমাইসিন উল্লেখযোগ্য, আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে এসকল আবিষ্কারের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ডুবোসের গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি যেমন এক বিশিষ্ট ও বিস্ময়কর অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কার করেন—তেমনি তাঁর আবিষ্কার অনুপ্রাণিত করে বহু বিজ্ঞানীকে—যার ফলে অচিরে আবিষ্কৃত হয়—ক্লোরোমাইসিন, টেরামাইসিন, ওরিওমাইসিনের মত অ্যান্টিবায়োটিক, যাদের ক্ষমতা আরো বহু রোগের বিরুদ্ধে অলৌকিক!

আবিষ্কারের শেষ অবশ্য এখানেই নয়—আরো নতুন, আরো ব্যাপক শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক অনুসন্ধানের কাজে আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে বহু বিজ্ঞানীর সাধনা,—আর এই সাধনা, এই প্রচেষ্টার ফলে মানুষ হয়ত একদিন এই মাটির বুকেই খুঁজে পাবে এমন কোনো

বিস্ময়কর ঔষধ যা ছিল আরলিকের আজীবন স্বপ্ন—সেই "ম্যাজিক বুলেট"—যার সংস্পর্শে পরাভূত হবে সকল প্রকার ব্যাধি—রোগ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে পৃথিবীর সকল মানুষ। সেদিন হয়ত সুদূর নয়,—যেদিন মানুষ এমনিভাবে তার চিরশত্রু ব্যাধিকে দমন করে—যাপন করবে সুখ দীপ্ত এক সুদীর্ঘ জীবন।

—

গ্রন্থপঞ্জি :


১। Microbe Hunters—Paul De Kruif.

২। Men Against Death—Paul De Kruif

৩। The Miracle of Life—The Home Library Club—The Statesman—The Times of India.

৪। One Hundred Great Lives—The Home Library Club—The Statesman—The Times of India

৫। The Major Achievements of Science—Vol. I—A. E. E. Mckenzie

৬। Medical Milestones—Henry J. L. Marriott

৭। Milestones of Medicine—Ruth Fox

৮। Great Aventures in Medicine—Samuel Rapport and Helen wright

৯। The Story of Medicine—Victor Robinson

১০। The Story Behind Great Medical Discoveries—Elezabeth Rider Montogomery

১১। Magic in a Bottle—Milton Silverman

১২। The Science Book of Wonder Drugs—Donald G. Cooly

১৩। Modern Medical Discoveries—Irmengar de Eberle

১৪। Medicine and Man—Ritchie Calder

১৫। Profile of Science—Rifchie Calder.

১৬। The Miracle Finders—Donald Robinson

১৭। The Wonderful World of Medicine—Ritchie Calder.

১৮। The Romance of Medical Science—Patrick Pingle.

১৯। All About Great Medical Discoveries—David Dietz.

২০। Medicine on the March—Marguerite Clerk.

২১। Miracle Drugs—Boris Sokoloff.

২২। Science Milestones—"Life" Publication.

২৩। Modern Medical Discoveries—J. G. Thwaites.

২৪। Miracle From Microbes—Samuel Epstein and Beryl Williams.

২৫। Shots without Guns—Sarah Riedman.

২৬। ভেলকি থেকে ভেষজ—আনন্দ কিশোর মুন্সী

২৭। বিজ্ঞানের ইতিহাস—১ম ও ২য় খণ্ড—শ্রীসমরেন্দ্র নাথ সেন

২৮। চিকিৎসা শাস্ত্রের কাহিনী—অনুবাদক, মোহাম্মদ মোর্তজা

২৯। জীবাণু থেকে ঔষধ—অনুবাদক, আখতারুজ্জামান

৩০। আবিষ্কারের পিছনে—ডাঃ মনীশ প্রধান

৩১। পেনিসিলিন ও স্ট্রেপ্টোমাইসিন—শ্রীসর্বানী সহায় গুহ সরকার

---